প্রথম প্রকাশ
পৌষ, ১৩৬৬
প্রকাশক
সমীরণ চৌধুরী
কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
মুদ্রক
অবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

সুধীন্দ্রনাথ দুরূহ কবি ; এলিঅটও অবোধ্য এবং তাকে আয়ত্ত করা আমাদের সাধ্যাতীত, ওদেশেও মুষ্টিমেয় কয়জন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে বিষ্ণু দে এলিয়টভক্ত ও বোদ্ধা ব'লে খ্যাত। আর একজন ভারতীয় এলিঅট-পণ্ডিত ও মর্মজ্ঞকে জানতাম, বি. রাজন—দিল্লী ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ছিলেন, এখন শুনি কানাডায়। জানি না তাঁর মিল্টন ও ইয়েটস্ সম্বন্ধে লেখা বই দুখানি পড়েছ কি না। তিনি ওদেশে প্রকাশিত এলিঅট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখকদের রচনা-সংগ্রহ এডিট করার জন্য নির্বাচিত হন। তাঁর নিজেরও একটা এলিঅট সম্বন্ধে রচনা সেই বইএ ছিল। বইটা আমি পড়েছিলাম বহু বৎসর আগে। টাইটেলটা ভুলে গেছি—বইটাও পরে আর খুঁজে পাই নি। পাউণ্ড এবং এলিঅট-এর পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি অবিশ্বাস্য। তাঁদের রচনায় এত দেশের এত কাব্য-সাহিত্যের এ্যালিউশান আছে যা খুঁজে বার করা প্রায় অসাধ্য। ছাত্রজীবনে 'ব্রা উ নিং এ ন সা ই-ক্লো পি ডি য়া' দেখেছিলাম, 'এ লি অ ট এ ন সা ই ক্লো পি ডি য়া ও' আছে ব'লে জানি।

এত কথা লিখলাম শুধু এইজন্য যে তোমার গবেষণার বিষয়টি সামলাতে অত্যধিক মনন ও অনুধ্যানের দরকার। মামুলি গবেষণার বাঁধাধরা পথে কোথাও পৌঁছান যাবে না।

ধর এলিঅট-এর 'পোর্ট্রেট অফ এ লেডি' এবং 'অর্কেস্ট্রা' থেকে যে চারটি লাইন তুমি উদ্ধৃত করেছ। প্রথমটি একটি রূপবিশিষ্টা বিগত যৌবনার পুরুষ-বুভুক্ষার বাস্তব করুণ ছবি। ছাত্রজীবনে কেম্ব্রিজ-এ আমি এদের দেখেছি। এলিঅট এ কবিতাটি লেখেন যখন তিনি ফ্রেঞ্চ কবি লাফর্গকে নিয়ে মসগুল—লেখোক্তের ছায়া নজরে পড়ে যদিও কোন অর্থেই তো অনুকরণ নয়। সুধীন্দ্রর 'অর্কেস্ট্রা'-র দীর্ঘ নাম কবিতাটি ইউরোপীয় সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার স্বরূপকে শব্দে প্রকাশ করবার চেষ্টা—ইংরাজীতে যাকে বলা যায় an adventurous piece of virtuosity। প্রথম প্রকাশের সময় কোন সমালোচকই ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি, তাই পরে সুধীন্দ্রকে এর বিষয়বস্তুটি বোঝাতে হয়েছিল লিখে (সংশোধিত 'অ র্কে স্ট্রা'-র ভূমিকা দ্র.)। সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা তুমি শুনেছ

কি না জানি না—তা আমাদের বিগত যুগের থিয়েটারের ঐকতান নয়। পার ত সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার (Bethoven, Schubert, Schuman প্রভৃতির) লং প্লেয়িং রেকর্ড বাজিয়ে শুনো। সেখানে একসঙ্গে সব যন্ত্র বাজে না। বাদী-প্রতিবাদী, অনুবাদী-অস্বাদী সুরের আদান-প্রতিদানে বিচিত্র নানাত্বে বিকশিত হয় জটিল ভাবনা-বেদনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে চিন্তাশীলদের সংবেদনায় এক গভীর বিষাদ-নৈরাশ্য আসে তা তুমি অবশ্যই জান। সেই বিরাট বৈকল্য ও ব্যর্থতাবোধ-'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-প্রসূতি এবং তার পরম প্রকাশ। ঐ একটি দীর্ঘ কবিতা যে-অনুষঙ্গ পরিবেশ রচনা করে তার পরিব্যাপ্ত (pervasive) প্রভাব সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্তী কোন কবি এড়াতে পারেন নি—যদিও প্রত্যেকের অনুভূতি ও বিন্যাস বা অভিব্যক্তি নিজস্ব ঃ না হলে সে-সব রচনা নিরর্থক হত।

সুধীন্দ্রনাথের রচনায় এই বিষাদ-নৈরাশ্য অবশ্যই বর্তমান। উদাহরণ-স্বরূপ 'দ শ মী'-র প্রথম কবিতাটি মন দিয়ে পড়ো। স্মৃতির উপর নির্ভর ক'রে আবৃত্তি করছি ঃ

বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধু ধু করে ;
নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে ;
যা ছিল বলার কবে হয়ে গেছে বলা সে।

চিত্রকল্প দেখ—যা উর্বরা মাটি ছিল ক্ষয়ে সে কাঁকর এখন, আকাশ খাঁ খাঁ করছে কোথাও সরসতা নেই (দুটোতে চোখের কোন আরামই নেই, চোখ জ্বালা করে শুধু)—এবং সব চেয়ে মর্মান্তিক—এই বিষয় কথা কইলেও মনের উপর যে-ভার চেপেছে তার একটুও লাঘব হয় না, কারণ ব'লে ব'লে সেই চর্বিতচর্বণে কোন অভ্যাঘাতই আর জাগে না।

'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এ এ ছবি অনুপম কলাকৌশলে অনেক বড় ক্যানভাসে আঁকা হয়েছে এবং তার অভ্যাঘাত ফলে এলিঅট প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগের মহাকবি রূপে সঙ্গে-সঙ্গে স্বীকৃতি পান। তাঁর কলাকৌশলের এক আনাও সুধীন পান নি (এর কারণ রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও বাংলায় ইউরোপের বিচিত্র সাহিত্য সম্ভারের অভাব)। বাংলা গদ্য শ্রীরামপুর মিশনারীদের বাইবেল-তর্জমা থেকে সুরু। পদ্যে বৈষ্ণব কবিতার পর একেবারে পশ্চিম-ভাবধারা পুষ্ট মাইকেল—ভাগ্যিস মাইকেলের সংস্কৃত ও ইউরোপীয় সাহিত্যে বিস্তৃত অধিকার ছিল। সুধীনও সংস্কৃত এবং ইংরাজী (ও কিছুটা ফরাসী)

সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছিলেন, কিন্তু এলিঅটের মত বিশ্বব্যাপী পরিক্রমা তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় নি। (এ বিষয়ে অনেক কিছু লিখতে হয় যা এখন ভগ্নস্বাস্থ্যে আমার শক্তির অতীত।)

তবু সামান্য মূলধন সুধীন কিভাবে খাটিয়েছিলেন লক্ষ্য কর। ঐ একটি কবিতাই আবৃত্তি ক'রে চলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর

অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী ;
নাস্তিতে নেতি স্বয়ংসিদ্ধ প্রমা,
সোহহংবাদীর আর্তি আত্মোপমা,
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই।

মানুষ ইতিহাস-নিষ্ক্রান্ত, অতীত তার কাছে যেমন নিরর্থক ভবিষ্যৎ তেমনই নিরাশ্বাস, বর্তমানও একটানা ধূসর। 'নেতি নেতি' মন্ত্রে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) যে এক শাশ্বত (Perennial and universal) সত্যের অনুসন্ধান 'নাস্তি'-তে —বৈনাশিকতায় (anarchy) তার পর্যবসান। মনোরথের লাগাম (কঠোপনিষদের উপমা) আর কাজ করে না। কোথায় যাচ্ছে মানুষ জানে না। গন্তব্যস্থলের ঠিকানাও তার হারিয়ে গেছে, প্রেতপারা সে নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় আকাশে ছায়ামূর্তির মত উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ ত্রাতার বদলে :
বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থাণু,
পৃথিবী অনাথ ; যথেচ্ছ পরমাণু ;
প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে।

জগতের কোন সেভিয়ার কোন ঋষিই মানুষের ত্রাণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেন নি, কিন্তু সামগ্রিক বিনাশের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সদল কালভৈরব (The Arch-Destroyer with his minions) গাফিলতি করেন না—ধ্বংসলীলা অব্যাহত চলেছে।

এতদিনে এলিঅট রোমান ক্যাথলিক ধর্মে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছেন 'লিটল গিডিং'-এ তা পরিষ্কার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উল্লেখ বিদ্যুতের মত তাঁর কাব্যে ক্ষণপ্রকাশ। সুধীন্দ্র কিন্তু কোন ধর্মেই আশ্রয় খুঁজে পান নি। 'পৃথিবী অনাথ' 'অপমৃত ভগবান' কত আর্তনাদ তাঁর শুনি, ভগবান না থাকলে জীবন দুর্বহ তাই এত যন্ত্রণা, কিন্তু সস্তা সমাধানে সুধীন্দ্রের তৃপ্তি নেই, তিনি প্রশ্নই করে চলেন,

তথাপি পাব না আমি আপনার দেখা কি ?

কিন্তু অপর পক্ষ নিরুত্তর।…

…দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এলিঅট রোমান ক্যাথলিক ধর্মে তাঁর সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। সুধীনের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। 'স ং ব র্তে'-র প্রায় সবগুলি কবিতাই সেই বীভৎস মরণযজ্ঞের উপর কবির আত্মোৎসর্গ, আর্ত ক্রন্দনের অঞ্জলি যদি তাতে আত্মশুদ্ধি সম্ভব হয়। প্রথম ('নান্দীমুখ') কবিতার শেষ স্তবকে

অশক্য পিতা, বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন ;
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তাণ্ডবে!

ভগবান (পিতা) অক্ষম (impotent), মাতা বলী অসুরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে কৃতার্থ। কোন অবতার (পরশুরাম) এই দুষ্কৃতদের দমনের জন্য ধরায় নামবেন না। ('গী তা'-র 'যদা যদাহি ধর্মস্য· ' বাণীর প্রতি দীপ্ত কটাক্ষ)। আত্মশুদ্ধির জন্য তাণ্ডবে আমাদের প্রত্যেককে যোগ দিতে হবে—আমরা প্রত্যেকে এই 'মহতী বিনষ্টির' জন্য দায়ী। এই যুদ্ধের মাঝখানে সুধীন লেখা বন্ধ ক'রে যুদ্ধে যোগ দেবার চেষ্টা করলেন—বয়স বেশী হওয়ায় তাতে সফল হন নি। পরে এয়ার রেড প্রিকশানস সংস্থার কমিউনিকেশানস শাখার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলেন সুচারু ভাবে রাত-রাত জেগে।

দ্বিতীয় ('উপসংহার') কবিতায়

প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা ঃ
প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত কল্কি ; কিংবদন্তী শিবের ত্রিশূল
শূন্যকুম্ভ পুরাণ সংহিতা।

মনুষ্যত্বের খোলস খসে পড়েছে। মানুষ যেন আর বংশবৃদ্ধি বা সভ্যতা-সৃষ্টি থেকে বিরত থাকে। 'প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে-এস নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাকি'।

সভ্যতার অভিশাপে প্রস্তরিত অর্ধনারীশ্বর

'উজ্জীবন' কবিতায় :

আখণ্ডল
নিরর্থক নাম মাত্র ঃ জরাগ্রস্ত সহস্রাক্ষে আর
পড়ে না নারকী কীট। কুলিশ প্রহার

কম্পিত হাতের দোষে নির্দোষের মুণ্ডপাত করে।...
যে পশুবলের কাছে হার মেনে তুমি মৃত্যুঞ্জয়
(Christ's crucifixion)

এবারে কি তার উজ্জীবন ?
তুমি নও, আসে কি সে-অর্ধপশু অর্ধেক মানব
সঙ্গে করে দিগ্বিজয়ী মরু ?
পুরাণ পুরুষ হত। বাজে বক্ষে আর্তির ডমরু।

ক্রাইস্ট-এর রেজারেকশান এবং এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় কোন আশ্বাস নেই। 'সংবর্তে'-র প্রায় সব কবিতাতেই এই আর্তির ডমরু শুনবে। প্রত্যেকটার অভিযোজন অবশ্য পৃথক এবং ব্যঞ্জনায় বৈচিত্র্য আছে।

কবি সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত কথা জমা আছে আমার বুকে যে কোনদিনই শেষ করতে পারব না। তাঁর কয়েকটি সিম্বল-এর ব্যবহার, একই সময় 'অর্কেস্ট্রা'-র প্রেমের কবিতা তথা 'উত্তর ফাল্গুনী' ও 'ক্রন্দসী'-র কবিতায় বৌদ্ধ নির্বাণের আরাধনা ঃ রিলকে, হেলডারলেন, ভালেরি, মালার্মে প্রভৃতি কবির নির্যাস সমৃদ্ধ তার কবিমানস। এফ. এইচ. ব্র্যাডলে, হাইডেগার প্রমুখ দার্শনিক এবং য়ুং-এর মনস্তত্ত্বের তিনি উত্তরসাধক। আধুনিক পদার্থ, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল দার্শনিকের।

কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিব্যক্ত হ্রাসে

Law of Entropy—এর মূল কথা। সত্যেন বসু বলতেন, সুধীন যদি চর্চা করত মস্ত বড় গাণিতিক হতে পারত।

'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' যুগকাব্য হিসাবে দীর্ঘজীবী। তবে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে আত্মসমালোচনা আরও অনেক বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক করেছেন—কোন চিন্তাশীল সংবেদনশীল সাহিত্যিকই এড়াতে পারেন নি, এড়ান সম্ভব ছিল না বলেই। ডারউইনের যে অভিব্যক্তিবাদের উপর ভিকটোরিয়ান যুগের যে আশাবাদী প্রাগ্রসরবাদ (perennial progress) দাঁড়িয়েছিল তা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। 'যযাতি'-তে সুধীনের আত্মপরিচয় (credentials) শোন ঃ

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিরূপ অতীতে।

ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যানুপ্রাস সত্ত্বেও যেন প্রাঞ্জল গদ্য। সুধীনের অসাধ্য সাধনের আর এক প্রয়াস—গদ্য-পদ্যের ভেদ মুছে দেওয়া। কিন্তু সে-আদর্শ নিয়ে আলোচনা সময়সাপেক্ষ।

'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' যুগকাব্য। তার সার্বজন্য প্রভাব প্রদোষের ছায়ার মত। সেইটুকু ছাড়া সুধীন্দ্রের উপর এলিঅট-এর কোন বিশেষ প্রভাব আমার নজরে পড়ে নি।

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এক

'উত্তররৈবিক বাংলা কবিতা'র পশ্চাৎপট

কবিজীবনের বানপ্রস্থে উপনীত হওয়ার প্রাক্কালে অবিতথ সৌকর্যে এলিঅট আর্ষবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর 'ঈস্ট কোকর' কবিতায়—কাব্য-আন্দোলনের মূল সত্যটিই অকপটে ধরা পড়েছিল তাতে :

And so each venture
Is a new beginning, a raid on the inarticulate
With shabby equipment always deteriorating
In the general mess of imprecision of feeling,
Undisciplined squads of emotion.[১]

অবক্ষয়িত ভাষা শব্দ ভাব বিষয়বস্তু দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির হাত থেকে সাহিত্য কিংবা কাব্যকে উদ্ধার করতেই সাহিত্য-আন্দোলন দানা বাঁধে নূতন কালের প্রতিভাকে আশ্রয় ক'রে।

জীবনানন্দ দাশেরও 'কোনো এক নতুন-কিছুর আছে প্রয়োজন'[২]-এ অনুভূতির পশ্চাতে অনুরূপ এক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় :

> ...সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক ভূমি উচ্ছিষ্ট হয়েছে, এদেশের মধ্যযুগের সাহিত্যেও ; উচ্ছিষ্ট করবার মতো বিশেষ কিছু অবশেষ থাকত না আর আধুনিকদের জন্যে, পরিসর ভূমি বেড়ে না গিয়ে এরকম নিঃশেষিত হতে থাকলে সাহিত্যে গভীরস্পর্শিতাও নষ্ট হতে থাকে।[৩]

তাছাড়া, 'একদিন শুনেছ যে-সুর—ফুরায়েছে,—পুরানো তা—' এই বোধই তাঁকে 'নতুন-কিছুর' সন্ধানে প্রবর্তনা দিয়েছিল।

অবক্ষয়মুক্তির নিদান নির্দেশ করতে গিয়ে এলিঅট দুর্বোধ্যতার (difficult) পক্ষ সমর্থনেও দ্বিধা করেন নি। আরো বলেছেন,

> The poet must become more and more comprehensive, more indirect, in order to force, to dislocate if necessary language into his meaning.[৪].

অনুরূপ নিদানই যথেষ্ট নয় বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে, তাই জীবনানন্দের অপরিহার্য মনে হয়েছে,

> বাংলাসাহিত্যে যা নেই অথবা শীর্ণভাবে রয়েছে সেই সব প্রাণ ও পরিসরের থেকে রশ্মি পেতে হলে ইউরোপীয় সাহিত্য ছাড়া আমাদের অন্য কোনো আলো-ভূমি নেই।

বুঝতে অসুবিধে হয় না ভিক্টোরীয় তথা জর্জীয় রোমাণ্টিক কাব্যধারার বিরুদ্ধে গড়ে তোলা এলিঅট প্রমুখের কাব্য-আন্দোলনের অনুরূপ আন্দোলন ও বিদ্রোহ বাংলা কাব্যধারায়ও গড়ে উঠেছিল জীবনানন্দ প্রমুখকে আশ্রয় করে। সে-বিদ্রোহ স্পষ্টতঃই পূর্ববর্তী রোমাণ্টিক রবীন্দ্র সাহিত্যস্বভাব ও সময় স্বভাবের বিরুদ্ধে;[৫] আর আন্দোলন আধুনিকতার আন্দোলন, যা বাংলা কাব্যে নতুন ধারা সংযোজন করেছে, যা পূর্ববর্তী রবীন্দ্র কাব্যধারা থেকে প্রকৃতই স্বতন্ত্র।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের এক ঐতিহ্যবিরোধী গোষ্ঠীর রচনায় তৎকালীন বাংলাসাহিত্যের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে একটা সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়ার সুর ফুটে ওঠে, প্রতিশ্রুত (determined) ও ঘোষিত বিদ্রোহ যেন। এঁদের প্রবণতা ছিল রোমাণ্টিক ঐতিহ্যবিরোধী, রীতি গদ্যধর্মী, লক্ষ্য কাব্যভাষা ও কথ্যভাষার সমন্বয় এবং বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নৈরাশ্যবাদী রূঢ় বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার অপরাহ্নবেলার অবদান স্মরণে রেখেও বলা চলে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' রবীন্দ্র-বিরোধী কবিগোষ্ঠীরই সনিষ্ঠ সাধনা ও পরিশ্রমের ফসল। (রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-অতিক্রমণের দুঃসাহসিক প্রেরণা হয়তো বা আহৃত হয়েছিল রবীন্দ্র-কাব্যকায়া বদলের দৃষ্টান্ত থেকেই।) রবীন্দ্রধারায় নিঃসন্দিগ্ধ ছেদ টেনে বাংলা কবিতায় নূতন ধারা এনেছিলেন এতেই এঁদের স্বীকৃতি। এই নূতন ধারার কবিতারই আদি পরিচয় 'কল্লোল যুগের কবিতা' এবং 'অতি আধুনিক কবিতা' রূপে, কবিদের প্রতিষ্ঠা 'কল্লোল যুগের কবি' তথা 'অতি আধুনিক কবি' রূপেই; একটি বিশেষ সাময়িক পত্রের নামে 'কল্লোল যুগ' বা 'কল্লোল যুগের কবি' রূপে চিহ্নিত করলে অন্য সমস্ত তথ্যের (যাদের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়) প্রতি অবিচার করা হয়। 'কল্লোল গোষ্ঠীর যুগ' কিংবা 'কল্লোল গোষ্ঠীর কবি' অভিধা অনেকাংশে যথার্থ ও সঙ্গত। তা সত্ত্বেও 'কল্লোলের' উচ্চনাদী আন্দোলন তথা সাড়া-জাগানো আয়োজনের প্রতি গুরুত্ব দিতেই অতি আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিমান শরিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জনপ্রিয় 'কল্লোল যুগ' অভিধা নির্দ্ধিধায় গ্রহণ করেছি।

আধুনিক কাব্য-আন্দোলনে পুরোধার ভূমিকা নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ। কিন্তু একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-বিরোধী হলেও আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন চলেছে উত্তর পর্বের রবীন্দ্র কাব্যধারার পাশাপাশিই এবং সে-কারণেই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রভাবশালী রূপকার হিসেবে বিশ্ব-কবিরও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। 'পু ন শ্চ' পরবর্তী যুগের মুক্তবন্ধ গদ্য-কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যেরই নয়, আধুনিক বাংলা কবিতারও অবশ্যই বিশিষ্ট সমৃদ্ধ অংশ। আধুনিক কাব্য-আন্দোলন ও বিবর্তনের অনিবার্য দিক নির্দেশে সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলেই তার ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক বাংলা কবিতার পুরোধারা রবীন্দ্রনাথকে প্রতিপক্ষরূপে খাড়া করেছিলেন। আন্দোলনের একটা প্রধান অংশই ছিল রবীন্দ্র-ঐতিহ্য ও কাব্যধারার বিরুদ্ধাচরণ। অবশ্যই কবিমানসিকতায় একটা দুস্তর ব্যবধান ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিকতাবাদী কবি-গোষ্ঠীর। প্রতিভাবলে ও দীর্ঘ সাধনার ফলশ্রুতিতে কবি রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যদৃষ্টি ও সিদ্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন তা পাওয়া সম্ভব ছিল না আধুনিকতাবাদীদের পক্ষে। লক্ষ্য অভিন্ন হলেও কাব্যরীতি ও আদর্শগত ব্যবধানের কারণে প্রতিষ্ঠিত রবি-কবি প্রতিষ্ঠাকামী আধুনিকতাবাদীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়েছিলেন। স্বভাবতঃই আত্মপক্ষ সমর্থনে বিশ্বকবিকেও প্রায়শঃই সাহিত্য-বিতণ্ডায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কখনো বা প্রবৃত্ত হতে হয়েছে প্রতি-আক্রমণে। এই সাহিত্যিক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের প্রায় দশকাধিক কালের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক 'প্র গ তি', 'ক ল্লো ল', 'কা লি-ক ল ম', 'প্র বা সী', 'প রি চ য়', 'বি চি ত্রা', 'ব ঙ্গ শ্রী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের পাতায়।

আধুনিকতাবাদীদের আক্রমণ প্রতিহতকরণের ভরসাতেই নিজেকে আধুনিক প্রতিপন্ন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরূপ অপবাদের আরোপ অমূলক। বিশ্বকবির কাব্যসাধনা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি সুস্পষ্ট ক্রমবিবর্তনের ধারা বজায় রেখে এগিয়েছে। কাব্যসাধনার বিভিন্ন পর্যায়ের সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে অনায়াসে ক্রমবিবর্তনের ধর্মেই যেন কবি পূর্ববর্তী ধারার নির্মোক ছাড়িয়ে পরবর্তী ধারায় পৌঁছেছেন। ধারা থেকে ধারান্তরে বিচরণ এমনই অবলীলাক্রমে ঘটেছে যে কখনোই অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়ার অবকাশ ঘটে নি, উপরন্তু সর্বদাই মনে হয়েছে যেন কবির এই কাব্য-সাধনার ব্যাপারটাও প্রকৃতির মতো নিখুঁত এবং অনিবার্য নিয়মের অমোঘ বিধানে বাঁধা। স্বাভাবিক নিয়মেই যেন 'স ন্ধ্যা স ঙ্গী ত' থেকে 'সো না র

ত রী'-'চি ত্রা'-র পর্যায়ে, 'চি ত্রা' থেকে 'ক্ষ ণি কা য়,' ক্ষ ণি কা' থেকে 'গী তা ঞ্জ লি'-র যুগে, সেখান থেকে 'ব লা কা'-'পূ র বী' পর্যায়ে, 'পূ র বী' থেকে 'ম হু য়া'র এবং 'ম হু য়া' থেকে সর্বশেষ অর্থাৎ 'পু ন শ্চ'-'শে ষ স প্ত ক'-এর পর্যায়ে সাবলীল উত্তরণ। স্বতঃই মনে হয়, উপনিষদিক 'চরৈবেতি' মন্ত্রই তাঁর মূলমন্ত্র; 'শেষ হয়ে হইল না শেষ' সৃষ্টির এই আদি অতৃপ্তি আর 'হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে' লক্ষ্যের এই তাড়নাই কবিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে শুরু ক'রে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র বাঙালী জাতির ভাষা ও সাহিত্য, অনেকাংশে কৃষ্টিও, এই একটিমাত্র মানুষকে কেন্দ্র ক'রে বিবর্তিত হয়েছে। জীবনের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে অমৃতলোকে যাত্রার শেষতম মুহূর্তটিতেও তিনিই বাঙালীর কাব্য, সাহিত্য তথা মননের পুরোধা।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উপর্যুক্ত কথাগুলি স্মরণে রাখলে রবীন্দ্রকাব্যের আধুনিকত্ব সম্পর্কে সংশয়ে আন্দোলিত হওয়ার অবকাশ থাকে না। 'পূ র বী' পরবর্তী যুগই রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিকতার যুগ। বিশেষভাবে বলতে হলে 'পু ন শ্চ' থেকে 'শে ষ লে খা' পর্যন্ত।[৬] এই দীর্ঘ এক দশক ধ'রে বিশ্বকবি গদ্য-ছন্দ ও গদ্য-কবিতার (কবির ভাষায় গদ্য-কাব্য) গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন।

রবীন্দ্রকাব্যের আন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে দেহরূপও সমানে রূপান্তর লাভ করেছে—ভাবের সঙ্গে ভাষা এবং বক্তব্যের সঙ্গে ছন্দ বিবর্তিত হতে-হতে এগিয়েছে আধুনিক যুগের দিকে। কবিতার ছন্দকে গদ্যের এবং ভাষাকে কথ্যভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসাই ছিল আধুনিকতাবাদীদের প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা ও প্রয়াসকে এবংবিধ উভয় লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়োজিত করেছিলেন আধুনিকতাবাদের উন্মেষের পূর্বে। প্রথম সূত্রপাতের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন ঠিক প্রথম মহাযুদ্ধের মুখেই 'স বু জ প ত্র' অবলম্বন ক'রে।[৭] পত্রিকাটির পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতই প্রগতিশীল এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৮] সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী প্রথম সংখ্যাতেই সে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন:

১. (ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে, ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে) ইউরোপের স্পর্শে আমরা···গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব সাহিত্যের সৃষ্টি।···

ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে।…এই ফুল ফোটা বন্ধ করা উচিত নয়,…আমরা ফুলের চাষ করবার জন্যে উৎসাহ দেব।

২. ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আনো না কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে।…ইংরেজি শিক্ষার গুণেই আমরা দেশের লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধার কল্পে ব্রতী হয়েছি।… আমাদের নবজীবনের নবশিক্ষা, দেশের দিক ও বিদেশের দিক, দুই দিক থেকেই আমাদের সহায়। এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহিত্য…

৩. বাঙালির জীবনে যে নতুনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য।

৪. বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্য দর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমাদের স্বল্প-পরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে।

৫. দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।… বাংলার পতিত জমি…আবাদ করলেই…সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে,…তার জন্য আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য।…এই ক্ষুদ্র পত্রিকা আশা করি, এ বিষয়ে লেখকদের সহায়তা করবে।[৯]

'স বু জ প ত্রে'-র উদ্দেশ্যাবলীর (বাহুল্যবোধে চলিত ভাষা প্রসঙ্গ উহ্য) বিশদ উল্লেখের কারণ এই যে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের হাওয়া সঞ্চার, ভাবের বিস্তার নয় সংহতকরণ, বাংলাসাহিত্যের মোড় ফেরানো প্রভৃতি তিরিশের দশকের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনেরও মূল লক্ষ্য। তাছাড়া 'স বু জ প ত্রে'-র উদ্দেশ্য যথাযথ রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চিত অগ্রণী ভূমিকা ছিল।[১০] প্রমথ চৌধুরীকে শিখণ্ডী খাড়া ক'রে সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষার জড়ত্ব তথা বাঙালীর রক্ষণশীল সংস্কারের অচলায়তন দুর্গে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন।[১১]

এলিঅট বলেছেন, Every revolution in poetry is apt to be, and sometimes to announce itself as a return to common speech.[১২] 'স বু জ প ত্রে'-র আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল চলিত ভাষাকে (অর্থাৎ কথ্যভাষা) বাংলাসাহিত্যের বাহন রূপে প্রতিষ্ঠিত করা।[১৩] প্রকৃতই It was a revolt against dead form and a preparation for new form or for the renewal of the old।[১৪] কয়েক দশকের ব্যবহারে বাংলা গদ্য এবং কাব্যের

উভয় ভাষাই স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল, নিষ্প্রাণ ভাষারীতিতে প্রাণসঞ্চার করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ কথ্যরীতিকে আশ্রয় ক'রে। 'স বু জ প ত্রে'-র যুগ থেকেই তাঁর কাব্য, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতির ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তবে কবি বোধহয় তখনো সম্পূর্ণ সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি, তাই চলিত ভাষার রচনাগুলি সে সময় লিখিত হয়েছিল উত্তম পুরুষের জবানীতে। [এই রীতি তাঁর পত্রসাহিত্যে 'ছি ন্ন প ত্রে'-র যুগ থেকেই অনুসৃত।] ভাষা নিয়ে নানা সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কবি এই যুগে। মৃতপ্রায় রুদ্ধগতি ভাষারীতিতে প্রাণসঞ্চারের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত 'চ তু র ঙ্গ'। এই উপন্যাস নূতন আঙ্গিকে লেখা এবং 'স বু জ প ত্রে' প্রকাশিত হলেও এর ভাষা সাধুরীতির। কিন্তু এ ভাষা অভিনব, সাধুভাষার খোলসে এর চাল চলিত ভাষার। এর প্রকৃতি মুগ্ধ করেছিল তিরিশের দশকের আধুনিকতাবাদীদের।[১৫]

বাংলাসাহিত্যে 'স বু জ প ত্রে'-র মতোই রবীন্দ্রসাহিত্যে 'ব লা কা' নূতন যুগের সূচনা করেছিল। 'গী তা ঞ্জ লি'-'গী তা লি'-র যুগে এসে স্বাভাবিক বিবর্তনে একটা সুস্পষ্ট ছেদ টেনে কবি-আত্মা মোড় ফিরে নূতন ক'রে চলা সুরু করল 'ব লা কা'-র ছন্দে। কবি-আত্মাতেই নয়, কাব্য-দেহেও রূপান্তর দেখা দিল। 'সো না র ত রী'-'চি ত্রা' পর্যায়ের ছন্দের বজ্রআঁটুনি 'গী তা ঞ্জ লি'-র যুগে এসে শিথিল হয়ে গেছল, 'ব লা কা য়' এসে কবিতার ভাষা এবং ছন্দ এমন একটা পর্যারে পৌঁছল যাকে নিঃসংশয়ে গদ্যকবিতার[১৬] অব্যবহিত প্রাক্‌রূপ বলা যেতে পারে এবং ক্ষীণ চরণান্তিক অনুপ্রাসের শ্লথবন্ধন ঘুচিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে গদ্য-কবিতার ছন্দে, রবীন্দ্র কাব্যধারার অবশ্যই শেষ পরিণতি, উত্তরণ অনিবার্য হয়ে উঠল।

'পু ন শ্চ' পর্যায়ের গদ্য-কবিতায়[১৭] উত্তরণ রবীন্দ্র কাব্যধারায় কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, হয়তো বা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যবিরোধী আধুনিকতাবাদী কবি গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিও নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে এ-বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

> গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম।[১৮] এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।… আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লি পি কা'-র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধকরি ভীরুতাই তার কারণ।[১৯]

কবির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী 'গী তা ঞ্জ লি' অনুবাদ থেকে গদ্য-কবিতার

আকস্মিক উপলব্ধি ঘটলেও প্রথম সচেতন পরীক্ষা 'লি পি কা'-র কয়েকটি কথিকায়। প্রকাশকাল ১৯২২, রচনাকাল অবশ্যই তারও কিছু পূর্বে। এই প্রয়াস শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যেই নয়, বাংলাসাহিত্যেও প্রথম। এমনকি ইংরেজি সাহিত্যেরও গদ্য-কবিতা সৃষ্টির প্রায় কাছাকাছি। এর থেকে এমন অনুসিদ্ধান্ত কি অযৌক্তিক যে অনুজ কবিদের নয়, সমসাময়িক ইংরেজী গদ্য-কবিতা আন্দোলন থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় গদ্য-কবিতা সৃষ্টির প্রেরণা আহরণ করেছিলেন?

'লি পি কা'-র সম্ভাবনা পূর্ণতা পেয়েছিল 'পু ন শ্চ' কাব্যগ্রন্থে। সেই কারণেই কি উভয় গ্রন্থে কিছু কিছু আপাত সাদৃশ্য? দু-একটি রচনার ভাবগত কিংবা প্রসঙ্গ-সাদৃশ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে: 'লি পি কা'-র 'প্রথম চিঠির' সঙ্গে 'পু ন শ্চ'-র 'পত্রলেখা'-র ভাবগত ঐক্য আছে; প্রসঙ্গ-সাদৃশ্য আছে 'লি পি কা'-র 'মেঘদূত' ও 'পু ন শ্চ'-র 'বিচ্ছেদ'-এর; 'লি পি কা'-র 'গলির' সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে 'পু ন শ্চ'-র 'বাঁশি' কবিতার 'কিনু গোয়ালার গলি'। 'লি পি কা'-র কয়েকটি কবিতায় কবি গদ্য-কবিতার খুবই কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন, বাক্যবিন্যাস হয়েছিল গদ্য-কবিতার অনুরূপ। গদ্য-কবিতার সদৃশ একটি রচনা 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' সম্ভবতঃ নাড়া দিয়েছিল তিরিশের দশকের কবিদের। তাই বিষ্ণু দে তাঁর 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতায় এবং সমর সেন 'মৃত্যু' কবিতায় অন্যপূর্বা চিত্রকল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটির কয়েকটি পংক্তি ব্যবহার করেছেন। এই রচনাটি দিয়েই বুদ্ধদেব বসুর 'আ ধু নি ক বা ং লা ক বি তা' সংকলনও সুরু।

'পু ন শ্চ' কাব্যগ্রন্থ[২০] থেকেই রবীন্দ্র কাব্যধারায় আধুনিকতার সূত্রপাত।[২১] সম্ভবতঃ এই সীমারেখা নির্দেশে কবিরও সমর্থন ছিল। তাই তিনি অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'প রি শে ষ'-এর প্রথম সংস্করণের 'খেলার মুক্তি' প্রভৃতি ছ'টি গদ্য-কবিতা জীবদ্দশাতেই 'পু ন শ্চ'-র দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজন করেছিলেন। কারণ তারা ছিল রীতিতে 'পু ন শ্চ'-র গদ্য-কবিতার সমগোত্রীয়, 'প রি শে ষ'-এর ছন্দোবন্ধ কবিতার পাশে তারা প্রকৃতই অপাংক্তেয়। 'গী তা ঞ্জ লি' অনুবাদের মতো অসতর্ক মুহূর্তের প্রয়াস নয়, 'লি পি কা'-র মতো ভীরুতার দ্বিধায় অবদমিতও নয়, তিরিশের দশকের আধুনিকতাবাদীদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথেরও গদ্য-পদ্যের ব্যবধান ঘোচানোর প্রথম সচেতন প্রয়াস দেখা গেল 'পু ন শ্চ' কাব্যগ্রন্থে। পদ্যকাব্যের অতিনিরূপিত ছন্দের বেড়া-দেওয়া অবরোধ আর অবগুণ্ঠনধর্মী আয়োজনে পদচারণা দ্বিধাদীর্ণ না হলে

কাব্যের বিচরণসীমা হয় আরো ব্যাপক, কাব্যমুক্তির এই উপলব্ধি নিয়েই কবি গদ্য-কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন : 'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূরে বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস'।...[২২] প্রকৃতিতেও গদ্য ও পদ্যের ব্যবধান-বিলোপের পক্ষপাতী কবি, '.. যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদান-প্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি নে।'[২৩]

পদ্যের নিরূপিত চরণ-বিন্যাস বজায় রেখেও গদ্যের আমেজ ফুটিয়ে তুলেছেন ছন্দের বেষ্টনী অতিক্রম ক'রে, 'পুনশ্চ' কাব্যে এরকম উদাহরণ যথেষ্ট :

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়। ('বাসা')

শুধু মেজাজেই নয়, বাচনভঙ্গি তথা বর্ণনায় আরো বেশি গদ্যাত্মক চরণও অসুলভ নয় :

শান-বাঁধানো মেজে, খড়খড়ে-দেওয়া জানলা।
নীচে ঘাট-বাঁধানো পুকুর, পাঁচিল ঘেঁষে নারকেল গাছ। ('বালক')

কিংবা,

পথের দুই ধারে ব্যাপারিদের পশরা—
তামার পাত্র, রুপোর অলংকার, দেবমূর্তির পট, রেশমের কাপড় ;
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি ;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল, মালা, ধূপ, বাতি, ঘড়া-ঘড়া তীর্থবারি।
('প্রথম পূজা')

রবীন্দ্রনাথের কারয়িত্রী প্রতিভা গদ্য-কবিতার সাহায্যে বাংলা কাব্যধারায় আনতে চেয়েছিল বৈচিত্র্য, সৃষ্টি করতে চেয়েছিল একটা চারিত্র্য-স্বাতন্ত্র্য ; সর্বোপরি, রোমান্টিকতার মায়াব্যূহে আটকে পড়া বাংলা কবিতার রুদ্ধস্রোতোবেগে করতে চেয়েছিল জোয়ারের সঞ্চার :

কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহলে সাহিত্য সংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবে ও মানসগঠনে রোমান্টিকতাই প্রশ্রয় পেয়েছে।

রোমাণ্টিক সৌন্দর্যবোধ তাঁকে বাস্তবের দৈনন্দিন গ্লানি, তুচ্ছতা ও ক্ষণিকতার ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে ঃ

সৌন্দর্যের যে-পাহারা জাগিয়া রয়েছে অন্তঃপুরে
সে আমারে নিত্য রাখে দূরে। ('জ্যোতির্বাষ্প')

তাঁর কবিসত্তা ঔপনিষদিক অমৃত-রসধারায় পুষ্ট, প্রজ্ঞার আলোকে দীপ্ত, উপলব্ধির গভীরতায় ভাস্বর। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' যুগে লব্ধ ঋষিকল্প প্রজ্ঞাদৃষ্টি তাঁর আমরণ অক্ষুন্ন ছিল। সে-প্রজ্ঞার আলোকে বাস্তব জগৎকেও তিনি দেখেছেন বিশ্বচক্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ; দেখেছেন পার্থিব আলোক, সুর ও ধ্বনির পরপারের 'দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি।'

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে···
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ। ('২১', রো গ শ য্যা য়)

স্বভাবতঃই চৈতন্য-সাগর-তীর্থপথের যাত্রী কবির অন্তঃকরণ আনন্দলোকের মঙ্গলালোকে সঞ্জীবিত ; আনন্দের পথেই তিনি 'আমার আমিকে' যুক্ত করতে পারেন 'পরম আমির' সঙ্গে ; আর পারেন 'অমৃতের আমি অধিকারী' এ-অটল বিশ্বাসে উপনীত হতে। এ হেন ঋষিপ্রতিম নির্বিকল্প প্রজ্ঞাদৃষ্টির যিনি অধীশ্বর, বিশ্বের অন্তঃসলিলা আনন্দস্রোতের চিরন্তন উৎসমূলে যাঁর অবাধ সঞ্চরণ, জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে বিরাজিত শতদল পদ্মের মধু আস্বাদনে যাঁর অবাধ অধিকার, তাঁকে জাগতিক দুঃখ শোক গ্লানি বিচলিত করবে কি করে! বরং,

জীবনের দুঃখ শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃত- রূপে বিশ্বের প্রকাশ। ('২৫', রো গ শ য্যা য়)

এখানেই রবীন্দ্র-বিরোধিতার সূত্রপাত। ঋষিকল্প কবির গগনচারী দৃষ্টি বাস্তবের গ্লানিকর দিনচর্যার আনাচে-কানাচে পৌঁছোয় নি, এ রকম অভিযোগ সুরু হয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের যুগ থেকেই। মারী-মড়ক-দুর্ভিক্ষ-কবলিত শ্মশানের বৈরাগ্যের মধ্যে, বাঙালীজীবনের দারিদ্র্যের উগ্র দর্পের মধ্যে বিশ্বকবির আবির্ভাব স্বর্গের চক্রান্ত ব'লে ভ্রম হয়, মহেন্দ্রের এই তপোভঙ্গ-দূত কাব্য-সংগীতের যে ইন্দ্রজাল নিয়ে এসেছিলেন তা ক্ষুধার জগতের গদ্যময় পৃথিবীর আধুনিকতাবাদীদের নির্মম পরিহাসের মতো মনে হয়। কবি নিজেও অবহিত ছিলেন সে-বিষয়ে ঃ

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
('১০', জ ন্ম দি নে)

তথাকথিত বাস্তব জগৎও তাঁর অচেনা নয়, তার আহ্বানও অননুভূত নয়:

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি। ('রোমান্টিক', ন ব জা ত ক)

কিন্তু আস্তিক্যবোধের প্রবক্তা এই কবি জগৎকে শ্রেয়োবোধের প্রকাশ রূপে দেখেছেন বলেই 'অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ' চারদিকে দেখেও চিরন্তন মানব-মহিমায় সংশয়ান্বিত হন নি। বরং এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়েছে তাঁর মনে, পুঞ্জীভূত কলুষের শেষে নেমে আসে 'সব কলুষনাশন রুদ্রতা', নেমে আসে 'মহাশান্তি মহাক্ষেম', ভীষণা নিবৃত্তির নূতন প্রাণ নূতন সৃষ্টি অখণ্ড পূর্ণতারই প্রকাশ ঘটে:

দারুণ ভাঙন এযে পূর্ণেরি আদেশে—
কী অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর দেখা দিবে শেষে—
গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি, বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর। ('১১', রো গ শ য্যা য়)

সে-কারণেই বাস্তব জীবনের কদর্যতাকেই আধুনিকতা ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। আধুনিকতার নামে জগতের কুৎসা নিয়ে সাময়িক প্রাবল্যকেও তাঁর মেকি মনে হয়েছে। তাঁর চোখে 'বিশুদ্ধ আধুনিকতা':

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা।[২৫]

এই 'বিষয়ের আত্মতা' তথা 'বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা' রবীন্দ্র-কাব্য দৃষ্টিতে অভাবনীয় মোড় ফেরাল 'পু ন শ্চ'-'শে ষ লে খা' পর্বে। তিনিও মুখের ভাষার নৈকট্যে উপনীত হতে চাইলেন, কাব্যকেও করতে চাইলেন রূঢ় বাস্তবের অভিমুখী। ভাষা এবং বিষয়বস্তুতে বাছবিচারের সীমারেখা মুছে গেল, দেখা দিল এলিঅট-সুলভ আধুনিকতাবাদী juxtaposition (? রসাভাস)।

প্রাক্-'পুনশ্চ' পর্বের সত্য-শিব-সুন্দরের কবির কাব্যে সুন্দরের পাশাপাশি অসুন্দর তথা কুশ্রীতাও এল, ছবি ও রেখায় বীভৎস রসের অনুপ্রবেশ ঘটল গদ্য-কবিতার ঋজু বর্ম্ম ধ'রে। যে ধরনের চরিত্র, বক্তব্য, ঘটনা, কাহিনী, বিষয়, ভাবানুষঙ্গ, রসাবেশ, কীটপতঙ্গ পূর্বে ছিল অপাংক্তেয়, এবার তারাই ভিড় ক'রে এল বিশ্ব-কবির কাব্য-দিগঙ্গনে। এল মধ্যবিত্ত জীবনের নরক 'কিনু গোয়ালার গলি', নৈরাশ্যভরা জীবনের প্রতিভূ হরিপদ কেরানী, লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা, সঙ্গী গুবরে পোকা ব্যাঙ[২৬] আর নেড়ি কুকুর, সাম্যবাদের বাহন মেহনতী মানুষের দল এবং আরো অনেকে। দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরে বিষয়ে ও প্রকাশভঙ্গিতে কতখানি আধুনিকম্মন্য হয়েছেন তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

১. সর্দারপোড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে,
হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে,
হাজির করে পাঠশালায়। ('বালক', পুনশ্চ)

২. ছোটো ছোটো চোখে নেই রোঁওয়া,...
যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা,...
কপালটা মস্ত—
অনাবৃত হয়েছে বিধাতার শিল্পরচনার অবহেলা। ('সহযাত্রী')

৩. দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা।
একটু চলা, একটু থেমে থাকা,
টেবিলটাতে হেলান দিয়ে বসা
সিঁড়ির দিকে চেয়ে।[২৭] ('বাসাবদল')

৪. বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে
উন্নতির ভিত্তি ফাঁদা গেল।...
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল...
এমন সময়ে—রিডাক্শান। ('উন্নতি')

পরমায়ুর জোরেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালে উপনীত হন নি, রীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিতেও কাব্যকে আধুনিকের দোরগোড়ায় এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন :

> কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে।...আজ ..দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্য-পদ্যে রফা-নিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি।[২৮]

এবংবিধ আধুনিকম্মন্যতা সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা কবিতা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-পরিমণ্ডলের বাইরেই তার ভিত্তিভূমি খুঁজে পেয়েছে কি না ; আর সে-ভূমিতে রীতি দৃষ্টিভঙ্গি তথা প্রকরণে যুগান্তর আনয়নে এলিঅটীয় কাব্যাদর্শের ভূমিকা কতখানি, এই আলোচনায় তারই অনুসন্ধান প্রয়াস।

ত্রিশ দশকের গোড়াতেই ইংরেজি আধুনিকতাবাদীদের কাব্যসংস্পর্শে এলেও এবং 'জার্নি অব্ দি মেজাই' অনুবাদ কালে এলিঅটীয় কাব্যরীতি অনুধাবনের সুযোগ ঘটলেও তথাকথিত আধুনিকতার কাব্যসিদ্ধি রবীন্দ্রনাথে অর্শায় নি। তিরিশ দশকেই রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-বিরোধী আধুনিকতাবাদী কাব্যধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতাবাদীদের ব্যবধানটা স্পষ্ট অনুভূত হয়েছে এবং এও নিঃসংশয়িত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে কবিস্বভাবে বিশ্বকবি ছিলেন মূলত আধুনিকতাপূর্ব যুগেরই উত্তুঙ্গ মহৎ প্রতিভা ; কাব্যে কলায় নান্দনিক দৃষ্টিতে মননে, এমনকি ভাষাভঙ্গি শব্দচেতনা তথা প্রকরণেও, তিনি প্রকৃতই রোমান্টিক কাব্যধারার প্রতিভূ। সে-কারণেই আধুনিক কালে স্বীয় পদপাত সম্পর্কে জীবন-সায়াহ্নেও কুণ্ঠাবোধ তাঁর মনে, 'আর. একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে।' পিছিয়ে পড়ছেন এ আশঙ্কা তাঁকে ক্রমেই অধিকার করছে, তাঁর মানসিকতা তাঁর কালে সমাদৃত হলেও নূতন কালের দাবী নূতন মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম এমন আস্থার ভিত্তি ক্রমেই হয়েছে শিথিল। এ সংশয় ধরা পড়েছে সুধীন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত 'আ কা শ প্র দী প' কাব্য-গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে :

> বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয় বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি। তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

ভিন্নতর কাব্যাদর্শে পুষ্ট হয়ে তিরিশের দশকে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-বিরোধী যে কাব্যধারাটি প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ধারাটিকে অস্বীকার করতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ, স্বাগত জানাতেও সম্ভবতঃ দ্বিধা করেন নি :[২৯]

নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। ('লেখা', প রি শে ষ)

তিরিশের দশকে আধুনিক বাংলা কবিতারূপে স্বপ্রতিষ্ঠ এই কাব্যধারাটি রবীন্দ্রোত্তর ঐতিহ্য-স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা খুঁজে পেলেও আদপেই কিন্তু স্বয়ম্ভূ নয়. গোকুলেও বাড়েনি। রবীন্দ্র বিরোধিতায়, কাব্যে এবং ঐতিহ্যে উভয়তঃ তার আবির্ভাব এবং প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে প্রায় দু'দশক ধ'রে তার পুষ্টি। তার অন্বিষ্ট রবীন্দ্র-অনুসৃত রোমাণ্টিক ধারার অপূর্ণতা, প্রধান উপজীব্য রবীন্দ্র-কাব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি এমন ভাব ভাষারীতি প্রকরণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি এবং রবিপ্রতিভা-অকর্ষিত ঐতিহ্য ভূমিই ছিল প্রধান কর্ষণভূমি।

উত্তররৈবিক কবিগোষ্ঠীর[৩০] পুরোধা জীবনানন্দ দাশের মতে, 'উত্তররৈবিক যুগ' 'কল্লোলে'-র সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল।[৩১] ১৩৫২ সালে রচিত ঐ প্রবন্ধেরই ('উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য') অন্যত্র লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতন ভাবে মুক্তির জন্যে যে বিপ্লব চলেছিল কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে বাংলা কবিতায়, তা এখন একদল জ্যেষ্ঠ কবিদের ভিতরে অবচেতন লোকে বিদ্রোহের মূর্তি ধরেছে, রবি-কাব্যলোকের বিপক্ষে ঠিক নয়, কিন্তু রবীন্দ্র-সৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে।[৩২]

১৩৬০ সালে রচিত অন্য এক প্রবন্ধেও বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগেই একটা নতুন প্রস্তুতির ইশারা পাওয়া যাচ্ছিল বাংলা কাব্যে ; সেটা 'কল্লোলে'-র সময়।[৩৩]

আধুনিকতাবাদী কবিগোষ্ঠীর আর এক শরিক, ভূমিকা যাই হোক তাঁরই আয়োজন ছিল সর্বাধিক ব্যাপক, বুদ্ধদেব বসুও লিখেছেন :

> ...আর এইসব পরীক্ষার পরেই দেখা দিল 'কল্লোল' গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলাসাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।[৩৪]

দেখা যাচ্ছে 'কল্লোলে'-র সময় থেকে বাংলা কবিতার মোড় ফেরা সুরু এ-বিষয়ে উভয় কবিই একমত। জীবনানন্দ আরো সঠিকভাবে কালনির্দেশ করতে গিয়ে স্পষ্টতঃই বলেছেন ১৩৫২ থেকে 'কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে' এবং 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগেই।' সময়ের চুলচেরা হিসেবে না গিয়েও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই শতকের বিশের দশকের গোড়ার দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন কবি। 'কল্লোলে'-র প্রকাশও এই সময়েই—১৩৩০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। বাংলা কাব্যের ধারা বদলে ঐ সাময়িক পত্রটির ভূমিকার কথা অস্বীকার না ক'রেও বলা চলে, অনুরূপ কালনির্দেশ বোধহয় সর্বাংশে সমীচীন নয়। 'কল্লোল' প্রকাশের প্রায় একদশক পূর্বেই বাংলা কবিতায় মোড় ফেরার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। নিতান্তই কাল-সীমা নির্দেশ

করতে হলে 'স বু জ প ত্র' প্রকাশের সমসাময়িক কাল ব'লে নির্দেশ করাই নিরাপদ। প্রকৃতই 'স বু জ প ত্র' বাংলা কবিতায় মোড় ফেরার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তার সে-ভূমিকা গুরুত্ব পায় নি মুখ্যতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ, পত্রিকাটির উদ্ভব এবং বিকাশ রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায়; দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রবিরোধী যে-কাব্যধারা পরবর্তী কালে আধুনিক কাব্যধারা রূপে প্রতিষ্ঠিত, তার সঙ্গে এই পত্রিকার কোনো যোগ ছিল না। তথাপি 'স বু জ প ত্রে'-র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না ব'লেই 'স বু জ প ত্র' প্রকাশের সমসাময়িক কাল বাংলা কাব্যে মোড় ফেরার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল এরকম তথ্যের প্রতি মর্যাদা দিতেই হয়। সেই সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার তথা স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের ভূমিকার কথা স্মরণে রাখলে সময়টার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।[৩৫]

সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন জীবনানন্দও:

> বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার উদয়ের আগে রবীন্দ্রকাব্যের আওতার থেকে বেরিয়ে পড়বার দু-একটা প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। সে ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।[৩৬]

কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই যে, সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র আওতা থেকে শেষ পর্যন্ত বেরোতে পারেন নি, তিনিও রবীন্দ্র-ঐতিহ্যেরই কবি এই হয়েছে তাঁর শেষ পরিচয়। তার কারণ তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যের আওতার থেকে বেরিয়ে পড়বার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল' মুখ্যতঃ আঙ্গিকের দিকে। ছন্দের যে-ক্ষেত্রে বিশ্বকবির পদপাত ঘটেনি সেদিকেই বাংলা কাব্যের পরিধিকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, ছড়ার ছন্দের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে তিনি বাংলা কবিতাকে বাংলা ভাষার অপেক্ষাকৃত জীবন্ত তথা প্রবহমান দিকটির সঙ্গে জড়িত করতে চেয়েছিলেন কি না সে-কথাও বিবেচ্য। তবে তৎসম ছন্দের পুনঃপ্রবর্তন প্রয়াস তাঁর কবিতার প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যুগচেতনাও ধরা পড়েছিল তাঁর কবিতায়। এতসব সত্ত্বেও সত্যেন্দ্র-প্রতিভার আত্মাহুতি ঘটেছিল রবীন্দ্র-ঐতিহ্যেরই মধ্যে এ কথাই ঐতিহাসিক সত্য।[৩৭]

প্রমথ চৌধুরী কিন্তু প্রকৃত অর্থেই রবীন্দ্র-ঐতিহ্যবিরোধী, রোমান্টিক আবেগ এবং ভাবোচ্ছ্বাস সংবরণই তাঁর কবিধর্ম। 'রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে' যে-বিদ্রোহ দানা বেঁধেছিল পরবর্তীকালে প্রমথবাবু তারই পূর্বসূরী। সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে পুরোপুরি না হলেও রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাবের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা গদ্যের সাধুরূপ রবীন্দ্রনাথের হাতে সমৃদ্ধির চরম শিখরে উন্নীত হয়

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই। রোমাণ্টিক যুগের ভাববিলাসী বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে বিশ শতকের গোড়ায় তার এমন এক সালঙ্কারা রূপ প্রতিভাত হল যার পর স্থবিরত্বই তার একমাত্র পরিণতি। সাধু বাংলা গদ্যের এই সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ যখন সে গতিরুদ্ধতার মুখোমুখি ঠিক সে সময়েই প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব। তাঁর চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়েছিল এই গতিহীনত্ব, তাই বাংলা গদ্যে কথ্যরীতি প্রবর্তন ক'রে তাকে প্রবহমান ক'রে তুলতে চাইলেন। তাঁর প্রয়াস আরো সার্থক হল রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে। বাংলা গদ্যকে ভাবাবেগ থেকে মুক্ত ক'রে যুক্তি ও মননে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন প্রমথ চৌধুরী।[৩৮] কাব্যকেও। এবং এই রীতিতে তাঁর প্রতিভার পক্ষে প্রশস্ত বাহন মনে হয়েছিল সনেটকে :

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।

('সনেট', সনেট পঞ্চাশৎ)

যে সমস্ত গুণপনার জন্য সনেটের প্রতি দুর্বলতা তার বর্ণনা দিয়েছেন কবি একটি সনেট রচনা করেই :

বিগাঢ় যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁটসাট ক্ষুদ্র
শিশির-ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত ক'রে গড়া স্বর্ণ পাঞ্চালিকা।
দৃঢ়বন্ধে সুসংযত করে কঞ্চুলিকা
পরিপূর্ণ হৃদয়ের অশান্ত সমুদ্র,
কলার শাসনে দান্ত মন তার রুদ্র,
মন্ত্রদেহ ষোড়শীর ধরেছে কালিকা—

'সনেট-সুন্দরী', পদ-চারণ ('আমার সনেট'-ও দ্রঃ)

রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের ছত্রছায়ায় থেকেও প্রমথ চৌধুরীর গদ্য এবং পদ্যে এই রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সম্ভবতঃ তাঁর ফরাসী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিই সর্বাংশে দায়ী। তাঁর বিদগ্ধ মানসিকতার ওপর ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল।[৩৯] ভাবলে অবাক হতে হয়, কেবল রোমাণ্টিক আবেগ-মুক্তিই নয়, তিরিশের দশকে বিষ্ণু দে প্রমুখেরা এলিঅটীয় আদর্শে আঙ্গিক ও কাব্যরীতির যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অবতারণা ক'রে বাংলা কাব্যের ধারা বদল ঘটিয়েছিলেন, দ্বিতীয় দশকেই তার অনেকগুলিরই উন্মেষ ঘটেছিল প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে। কবিতায় গদ্যধর্মিতা আনয়নে তাঁর প্রাথমিক উদ্যম নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে পথিকৃৎ-

সুলভ। 'প দ-চা র ণ'-এর উৎসর্গ পত্রে এর সাক্ষ্য মেলে, এতদ্বিষয়ে তাঁর যুক্তিও প্রণিধানযোগ্য ঃ

> গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি তার কারণ, আমার বিশ্বাস এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ—reason. এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ, এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই ; সুতরাং আশা করি আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।

সম্ভবতঃ প্রথম পদক্ষেপ ব'লেই (নামকরণেও তারই ইঙ্গিত) গদ্যের কলমে লেখা 'প দ-চা র ণ'-এর 'পদ্য'গুলি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতই সমাদৃত হবে কি না সে-বিষয়ে কবি নিঃসংশয় নন। অনুরূপ সংশয় রবীন্দ্রনাথেরও ছিল 'গী তা ঞ্জ লি'-র ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে। উৎসর্গ পত্রে দুটি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ঃ এক, গদ্যের কলমে পদ্য লিখে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সর্বগ্রাসী আবেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত করার সচেতন প্রয়াস ; এবং দুই, rhyme-এর সঙ্গে reason-এর অবতারণায় আবেগ ও রোমাণ্টিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

rhyme এবং reason-এর উদাহরণ পাওয়া যাবে 'ওঁ' কবিতাটিতে ঃ

তোমার নামেতে সবে মিছে কথা বলে,
সকলে জানিত যদি তোমার স্বরূপ,
কিছুই থাকিত নাকো এখন যেরূপ,—
তোমার নামেতে শুধু মিছে কথা চলে।

গদ্যধর্মিতা সম্পর্কে সচেতনতা আভাসিত 'স নে ট-চ তু ষ্ট য়ে র' 'কবিতা' নামক সনেটটিতে।

মিলিয়ে খিলিয়ে কথা আমি লিখি পদ্য,
লোকে বলে 'ওত শুধু মিলনান্ত গদ্য'

শুধু গদ্যধর্মিতাই নয়, কথ্যধর্মিতাও আছে তাঁর কবিতায়।

কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেট ফুলো,
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
    জুড়িয়া আকাশ। ('বর্ষা', প দ-চা র ণ)

অথবা,

দেখে ভয়ে কাঁপে বুক,
আকাশ ভেংচায় মুখ
বিদ্যুতের সবটুক
    জিভ্ বার করে। (ঐ)

রোমাণ্টিকতামুক্ত আধুনিক নগরসভ্যতার প্রতি সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে 'বিলাতে রবীন্দ্র' কবিতায়।[৪০]

বিলাতের গেছে সে একদিন,
সুরে বাঁধা ছিল কবির বীণ,
দিগন্ত-প্রসারী ঝঙ্কার যার
আজিও কাঁপায় মনের তার।
সে সুর ভেঙে নূতন তন্ত্র,
এখন ক্যাঁকায় মানুষ-যন্ত্র,
দ্যুলোক পড়েছে ধোঁয়ায় চাপা
প্রকৃতির বাণী কালিতে ছাপা।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যে রবিচক্রের বহির্ভূত সাহিত্যিক, একথা কেউ কেউ অকপটে স্বীকার করলেও এবং সাহিত্যস্বভাবে তিনি প্রকৃতই রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-বিরোধী হলেও রবীন্দ্র-বিরোধী কবি বা সাহিত্যিকের অপখ্যাতি তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি। কারণ তাঁর সাহিত্যসাধনা রবীন্দ্র-গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় এবং রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে তথাকথিত বিদ্রোহ ঘোষণা তিনি কোনো কালেই করেন নি। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কালেই রবীন্দ্র-বিরোধিতার সূত্রপাত হয়েছিল এবং সে-বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। তাঁদের বিদ্রোহ কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে। মোহিতলালের বিরুদ্ধাচরণ মাঝে-মাঝে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে এলেও যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ সার্থক হয়েছিল তাঁর কাব্য-সাধনায়। রবীন্দ্র-সৃষ্ট কাব্যস্বভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন নি ব'লেই কবি যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রবিরোধী। গোড়ায় রোমাণ্টিক নয়, জড়বাদী চেতনায় আচ্ছন্ন ছিল তাঁর কবিমানস।

কারণও স্পষ্ট। আমি ইঞ্জিনীয়র। বুঝি বস্তু। ইঁট-কাঠ, লোহা-লক্কড়, ঘর-বাড়ী, ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তা-ঘাট। অর্থাৎ এককথায় বস্তুতান্ত্রিকতা—Materialism।[৪১]

পল্লী-বাংলার তথা পল্লীজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাও কবি যতীন্দ্রনাথকে রোমাণ্টিক বিরোধিতার দিকেই ঠেলে দিয়েছিল। রবীন্দ্র-রোমাণ্টিকতার ছবি তিনি দেখতে পান নি।

আমি তো দেখলাম ঠিক বিপরীত। নদীমাতৃক দেশের নদী আজ মজে গেছে। খানা ডোবা যেদিকে তাকাই পানায় ভর্তি। শস্যক্ষেত্র খাঁ-খাঁ করছে। চাষীরা সর্বহারা, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, শীর্ণকায়। আর বাংলার

বধূ—তাদের দেখলাম·· এক কলসী জলের জন্য পরস্পর বাক্য-গরল বর্ষণ করতে।[৪২]

রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' ('ক ল্প না') কবিতার প্যারডি রচনা ক'রে যতীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি থেকে তাঁর কাব্যস্বভাবের বৈপরীত্যটুকু স্পষ্টতঃই নির্দেশ করেছেন।

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি গেছে খানা-ডোবাতে।
পারে না বহিতে লোক জ্বরভার,
পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর,
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে।
একপাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎকালের প্রভাতে॥ ('শরতে বঙ্গভূমি', ম রু শি খা)

সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব অঙ্গীকার ক'রে নিয়ে কবি মোহিতলালের কাব্যসাধনা সুরু হলেও[৪৩] এবং গোড়ার দিকে তিনি রবীন্দ্রানুরাগী কবিকুলে বিরাজ করলেও[৪৪] অনতিকাল পরেই রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-বিরোধী কবিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভাবে, ভাষায়, রীতিতে, বক্তব্যে তিনি ঔপনিষদিক ঐতিহ্য-বিমুখ; ইহলৌকিক দেহবাদী জীবনদর্শনের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছিল তাঁর কবিতায়।[৪৫] বাংলা কবিতার প্রচলিত রোমান্টিক চেতনা বাংলা কবিতাকে বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন একটা উপলব্ধিতেও উপনীত হয়েছিলেন :

কবির বাঁশিতে (? রবীন্দ্রনাথের কবিতায়) অর্ধশতাব্দী ধরিয়া যে রাগিণী উৎসারিত হইয়াছে, সে সঙ্গীত একটি অপ্রাকৃত সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাতে কাব্যের দিক দিয়া ভারতীয় রসবাদের হয়ত হানি হইবে না, কিন্তু জীবনের দিক দিয়া এমন একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যাহাতে বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ একটি পরম সত্যের ভাবস্বর্গে নিশ্চিন্ত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে।[৪৬]

সন্দেহ নেই অনুরূপ উপলব্ধিই মোহিতলালকে রবীন্দ্র-বিরোধী কাব্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং দেহবাদী জীবনচেতনাশ্রয়ী কাব্যরচনায় প্ররোচিত করেছিল। এই দেহবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ছ বি ও গা ন', 'ক ড়ি ও কো ম ল' যুগের দেহবাদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাহলেও মোহিতলাল

দেহবাদকে আশ্রয় ক'রে বাংলা কাব্যে নতুন সুর এনেছিলেন। কৈশোরিক চিত্তচাঞ্চল্যের লক্ষণাক্রান্ত ব'লে 'কড়ি ও কোমল' যুগের দেহবাদ গুরুত্ব পায় নি, রবীন্দ্রনাথেরও প্রশ্রয় পায় নি। পরবর্তী কালে রবীন্দ্র কাব্যধারা আশ্রয় ক'রে যে রোমান্টিক ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠেছিল তার মধ্যে দেহবাদের কোনো স্থান ছিল না। মোহিতলালের কাব্যে দেহবাদ প্রশ্রয় পাওয়ায় নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে গেল। জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির কথা তিনি অকপটে ঘোষণা করলেন:

দেহে তোর প্রাণ আছে? তবে কেন ওরে ভীরু নিত্য-উপবাসী—
চিরমৃত্যু-মোক্ষ-অভিলাষী? ('মোহমুদ্গর, শ্রেষ্ঠ কবিতা)

বললেন:

ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা। ('বুদ্ধ', ঐ)

মোহিতলালের দেহবাদ কতকাংশে স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মধ্যে প্রশ্রয় পেয়েছিল। পরবর্তী কালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়ও (প্রথম যুগে) সোচ্চার হয়েছিল। দেহবাদী সুর সমসাময়িক কবিতার ইতিহাসে অবশ্যই নূতন সুর এবং রক্ষণশীল সংস্কারবিরোধী ব'লে তার বিশেষ আবেদনও স্বীকার্য, কিন্তু তাহলেও বাংলা কাব্যের ধারাবদলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নি। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে এলিঅটীয় আদর্শে যান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশের ফলে তিরিশের দশকের প্রতিনিধি কবিদের মধ্যে দেহবাদী ভাবনা আবেদনহীন হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম যুগের কবিতায় দেহবাদের প্রাধান্য দেখা গেছে তাঁর রোমান্টিক প্রবণতার জন্যই, নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক রীতিতে উপনীত হওয়ার পর তিনি দেহবাদ থেকেও দূরে সরে গেছেন।

সনিষ্ঠ আন্তরিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রবিরোধী বিষয়াশ্রয় গ্রহণ করলেও যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল যা পারেন নি, নজরুল তাই পেরেছিলেন—রবীন্দ্র-আবেষ্টনীর বাইরে এক প্রবল কাব্যশক্তিরূপে তিনি নিজেকে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। 'ধূমকেতু'-র কবি-সম্পাদক হাবিলদার নজরুল ইসলামের বাংলা কাব্যজগতে আবির্ভাবও হয়েছিল ধূমকেতুসদৃশ। অসীম প্রাণপ্রাচুর্য এবং দুর্বার গতিবেগ নিয়েই তিনি এসেছিলেন। রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বাইরে একটা স্বতন্ত্র ও স্বকীয় সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাব গড়ে তুলতে হলে যে অপ্রমেয় প্রাণোন্মাদনা ও দুর্মর গতিবেগের প্রয়োজন তা তাঁর ছিল। এইদিক দিয়ে তাঁর আবির্ভাব উল্কার সঙ্গে তুলনীয়। উল্কা দারুণ দীপ্তি ও প্রচণ্ড গতিবেগ সম্বল ক'রে বায়ুমণ্ডলের ব্যাপক আবেষ্টনী ভেদ ক'রে পৃথিবীতে পৌঁছোলে তার শক্তি ও ঔজ্জ্বল্য মানুষকে হতচকিত

করে। নজরুলও বাংলা কাব্যজগতে যখন আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর প্রাণশক্তি ও গতিবেগ চকিত করেছিল সকলকে। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অবেষ্টনী ভেদ ক'রেই তাঁকে আবির্ভূত হতে হয়েছিল। অনুমিত হয় তিনি মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর গতিবেগ আর প্রাণশক্তি আহরণ করেছিলেন বিধর্মী সংস্কৃতি ও উদ্দাম গ্রাম্যজীবনচর্যা থেকে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ হয়ে ওঠা তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি। যে অস্বাভাবিক পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন এবং মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর পরিচিত জগৎ ও জীবনযাত্রাকে ব্যবধান থেকে দেখার যে দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছিল, তাই শক্তি যুগিয়েছিল পরিচিত ঐতিহ্যের বাইরে একটা স্বতন্ত্র ও স্বকীয় কাব্য-ঐতিহ্য গ'ড়ে তুলতে।[৪৭]

'বিদ্রোহী কবি'রূপে নজরুলের সাধারণ্যে প্রচলিত খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি ; প্রকৃত অর্থে তিনি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। তবে, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বাইরে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর ভাষাভঙ্গি ও বক্তব্যের ঋজুতায়। বক্তব্য যতীন্দ্রনাথ কিংবা মোহিতলালেরও ছিল, কিন্তু তা প্রাণপ্রাচুর্যের বলে বলীয়ান ছিল না। আর তাই নজরুলের মধ্যেই রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বাইরে নূতন সুর স্পষ্ট অনুভূত হল বাংলা কাব্যে।

আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস—আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস।
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী।
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল্-দোল্!

('বিদ্রোহী', সঞ্চিতা)

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক পেলব লালিত্যের পর নজরুলের এই পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠতা বাংলা কাব্যে নূতন ধারার ইঙ্গিত দিয়েছিল। তাঁর কাব্যের অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য বাংলা কাব্যে নূতন উন্মাদনাও এনে দিয়েছিল।

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে···
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।

('আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে', ঐ)

সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে যে প্রয়াসের সূত্রপাত তাই রীতিমতো একটা আন্দোলন রূপে দানা বাঁধল যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুলের মধ্যে। রবীন্দ্র-আবেষ্টনী থেকে পুরোপুরি নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সামগ্রিক মানসিকতা এঁদের মধ্যে দেখা না গেলেও রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বাইরে কাব্য-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস দেখা গেল এঁদের মধ্যে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে-পরে কালসীমা প্রসারিত হলেও এঁদের কাব্য-প্রয়াসের মধ্যেই আধুনিকতার প্রথম উন্মেষ অনুভূত হল, এঁদের যুগটাকেই বলা যেতে পারে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাক্-পর্যায়।[৪৮] এঁদের প্রয়াস বাংলা কবিতাকে জীবনমুখী ক'রে তোলা, এঁদের বিদ্রোহ মুখ্যতঃ রক্ষণশীল সামাজিক সংস্কার ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্র-রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এঁরা দূরে সরে যেতে সুরু করেছিলেন। নজরুলের 'সিন্ধু' কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করলেই দৃষ্টি-ভঙ্গির ব্যবধানটা সহজেই অনুভূত হবে।

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী।
রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লীলায়।
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন ?
নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড়ো আছাড়িয়া।
সর্বগ্রাসী ! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরে তিলে-তিলে
হে অস্থির ! স্থির নাহি হ'তে দিলে
পৃথিবীরে।

ঢেউ-এর অবিরত তটে আছড়ে পড়ার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়ও আছে, কিন্তু সেখানে মাতা ও সন্তানের উপমায় বাৎসল্য রসের অবতারণা করা হয়েছে। নজরুলের কবিতায় ভিন্নতর উপমায় এবং 'বিদ্রোহী', 'উদ্দাম লীলা', 'উন্মত্ত', 'নিষ্ফল অক্রোশ', 'আস্ফালন', 'সর্বগ্রাসী', মৃত্যু-ক্ষুধা', 'অস্থির' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ভাবে ও ভাষায় রবীন্দ্র-আবেষ্টনী অতিক্রমণের প্রয়াস স্পষ্ট। এঁদের লক্ষ্যও ছিল ভাষার সর্বত্রগামিতা ঃ

যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুনঃ রসাতলে—মানুষের মর্ম-নিবাসিনী। [৪৯]

রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-অতিক্রমণের সচেতন প্রয়াস করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল, কিন্তু তাঁদের সে-প্রয়াস শেষ পর্যন্ত অটল থাকে নি, তিনজন কবিই তাঁদের কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে রাবীন্দ্রিক-রোমান্টিকতার মায়ায় ধরা দিয়েছিলেন। এঁরা শেষ পর্বে রোমান্টিক কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের 'ত্রি যা মা', 'সা য় ম্'; মোহিতলালের 'হে ম ন্ত-গো ধূ লি' এবং নজরুলের 'সি ন্ধু-হি ন্দো ল', 'চ ক্র বা ক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এই সমস্ত কবিতা সংকলিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত যে কল্লোল যুগের কবি ও লেখকদের তথাকথিত অতি আধুনিক কবিতা যে ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে জীবনদর্শনের মূলে ছিল জীবনের কুৎসিত ও বীভৎস দিক, নগরজীবনের গ্লানি অবসাদ যন্ত্র-নির্ভর আধুনিক সভ্যতার নৈরাশ্য ও বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি, বাংলা কাব্যকে সেই অভিমুখেই এগিয়ে দিয়েছিলেন প্রাক্-আধুনিক পর্যায়ের কবিরা। জনৈক সমালোচক এই প্রসঙ্গে মোহিতলাল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল সকলের সম্পর্কেই সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য :

> এক নতুন দ্বার খুলে গেল, দেখা গেল ওপারে পড়ে রয়েছে এক বিস্তৃত রুক্ষ ভূমি। সেই কোমলতাহীন, মাধুর্যহীন জীবনের স্বাদে মত্ত নতুনতর কবির দল মোহিতলালকে বরণ করলেন অগ্রণীরূপে। [৫০]

যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং নজরুল বিশের দশকের এই তিন কবি বাংলা কাব্যে ভিন্ন সুর সংযোজনে সক্ষম হলেও মুখ্যতঃ কবি যতীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাব্যবিশ্বাসের ওপর ভর ক'রেই 'কল্লোল যুগ' তার পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছিল রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-বিরোধী সাহিত্যস্বভাব এবং সময়স্বভাব গ'ড়ে তোলার আন্দোলনে। [৫১] 'ক ল্লো লে'-র পক্ষ সমর্থনে 'নতুন লেখকদের পক্ষে থেকে' জবানবন্দীতে প্রেমেন্দ্র মিত্র (কৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্মনামে) তির্যক ভঙ্গিতে হলেও স্পষ্টতঃই ঐতিহ্য-বিরোধী প্রবণতার কথা ঘোষণা করেছিলেন :

> সব চেয়ে তাদের বড় অপরাধ, তারা নাকি সাহিত্যে আভিজাত্য মানে না। মুটে মজুর কুলি খালাসী দারিদ্র বাস্ত ইত্যাদি যে সব অস্বস্তিকর সত্যকে সর্দি, বাত, স্থূলতা ইত্যাদির মতন অনাবশ্যক অথচ আপাতত অপরিহার্য ব'লে জীবনেই কোনো রকমে ক্ষমা করা যায় এবং বড় জোর কবিতায় একবার 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্তবায়ু' ইত্যাদি ব'লে আলগোছে হা-হুতাশ

ক'রে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তারা সাহিত্যের স্বপ্নবিলাসের মধ্যে সে সবও নাকি টেনে আনতে চায়।[৫২]

রূঢ় বাস্তবজগতে বিচরণ ঘটে নি রবীন্দ্রনাথের, তিনি অভিজাত কবি। তাঁর কাব্যে মুটে মজুর কুলি প্রভৃতি নীচুতলার মানুষদের তথাকথিত বাস্তব জীবন-চর্যার কোনো ছবি নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর 'মনে হল তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হল তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন।'[৫৩] মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা না ক'রে, বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা, সংরাগের তীব্রতা তথা জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে 'কল্লোলে'-র পাতায় উল্লেখযোগ্য রচনাদি প্রকাশ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যুবনাশ্ব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। তাঁরা লিখেছিলেন পতিতা ভিখিরি বেদে প্রভৃতি নীচু তলার বস্তিবাসী, কয়লাখনির কুলি-মজুর, চাষা প্রভৃতি নিয়ে গল্প, কবিতা, উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের পরিধি প্রসারিত করতে চাইলেন তাঁরা সমাজের নীচু তলা পর্যন্ত, এতদিনকার অপ্রবেশ্য বাস্তব জগতের নারকীয় অলিগলি পর্যন্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের সোচ্চার ঘোষণা ঃ

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের,
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই!
('আমি কবি যত কামারের', প্রথমা)

অথবা,

আজ এই রাস্তার গান গাইব,—এই নগরের শিরা-উপশিরায়।
এই রাস্তার ধূলির গান!
—তার কাঁকর, তার খোয়া, তার পাথরের—
আজ কিছু তুচ্ছ নয়।
ভাঙা পেরেক ; ঘোড়াব খুরের নাল,
ছেঁড়া কাগজ, কাঠি, পাতা, কিছু তুচ্ছ নয়!

এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই আরো স্বাভাবিক প্রতিপন্ন হয় 'সময়স্বভাবের' নিরিখে

'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' সম্পর্কিত আলোচনায় অমলেন্দু বসুর বিদগ্ধ পক্ষ সমর্থন :

…কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন কলকারখানাবহুল অনেক সহরে সমাজজীবনে যে সকল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীচীর অর্থনৈতিক ও শ্রমজীবি-সমস্যার অনুরূপ। কোনো লেখক যদি এই সব বিষয় লইয়া গল্প লেখেন তাহাতে অন্যায় কি? কুলি, ধাওড়া, দুর্গন্ধময় নর্দমা, অস্বাস্থ্য, কলহ লইয়াই যদি গল্পের আরম্ভ ও শেষ হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?[৫৪]

'ক ল্লো ল' গোষ্ঠীর সমস্যা ছিল উভয়তঃ। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব অগ্রগতি রুদ্ধ করেছিল, রবীন্দ্র রোমান্টিক-ঐতিহ্যের বেষ্টনী অতিক্রম না করলে গতিরুদ্ধতা থেকে মুক্তি নেই। নতুন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করার সমস্যাও কিছু কম ছিল না। রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে নতুন ঐতিহ্য খুঁজতে গিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নব সৃষ্টিপ্রত্যয়ে গভীর আত্মোপলব্ধিতে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের 'আবিষ্কার' কবিতায় 'ক ল্লো ল' যুগের সমস্যা এবং আত্মবিশ্বাসই ধ্বনিত হয়েছিল :

পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর—
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে—মোর পথ আরো দূর।

গভীর আত্মোপলব্ধি—এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব নব জন্ম-সম্ভাবনা,
অক্ষরতুলিকা মোর হস্তে যেন রহে নিরলস
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি—নবীন প্রেরণা।

'নব নব জন্ম-সম্ভাবনার' আত্মোপলব্ধি ঘটেছিল কবি জীবনানন্দেরও। প্রাচীন ধারার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ব'লেই তার পরিবর্তে নূতন কালের উপযোগী নূতন ধারা নিয়ে আসতে হবে :

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন। ('কয়েকটি লাইন')

কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে হলেও রবীন্দ্র-রোমাণ্টিকতা-বিরোধী রূঢ় বাস্তবতার সন্ধান বিষ্ণু দে-ও পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে ঃ

গ্রাম তো হাপর
হাঁফ ধরে সেই মরা ঝ'রে পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপে ঝাড়ে
ঘ্ঁটের ধোঁয়ায় শ্যাওলায় আগাছায় নোংরায় ভাঙা পথে
মড়াখেকো কুকুরের বিবর্ণ রোঁয়ায়
জীর্ণ মঠ বিদীর্ণ মন্দিরে
ঝির্‌ঝিরে মরা নদী, মজা খাল, কচুরি পুকুরে
দুই হাটে মারামারি, মেলা নিয়ে জেলা বোর্ডের ব্যবসায়
টিউব্‌ওয়েল্‌ কেই বা বসায় !
প্রকৃতির কোলে আর শান্তি নেই, পাটকলে যায় !
দূরে থেকে নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !

('বৈকালী', পূর্বলেখ)

রবীন্দ্র-রোমাণ্টিক ঐতিহ্য অতিক্রমণ এবং নগরচেতনাভিত্তিক রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে নূতন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় 'কল্লোলে'। কথ্যধর্মিতা অর্থাৎ কবিতাকে মুখের ভাষার সাযুজ্যদান তথা স্বপ্ন-বিলাসচারিতা বর্জনেরও প্রয়াস অননুভূত নয়। তথাপি 'কল্লোলে'-র সমসাময়িক কালে অর্থাৎ বিশের দশকে 'কল্লোল যুগের' প্রতিষ্ঠা হয় নি; এই যুগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রিশের দশকে 'কল্লোল' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী কালেই। এর আপাত কারণ, 'কল্লোলে'-র আশ্রয়ে যা ঘটেছিল তা আন্দোলন এবং আলোড়ন সৃষ্টির প্রয়াস মাত্র, নূতন কোনো কাব্যধারা গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। তা সম্ভব হয়েছিল তিরিশের দশকেই বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সামগ্রিক প্রচেষ্টায়। এঁদের প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল 'কল্লোলে'-র পাতায় ('কল্লোলে' সুধীন্দ্রনাথের প্রকাশ ঘটেনি); কিন্তু এঁরা স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পেয়েছিলেন ত্রিশের দশকে, ফলে সে-সময়েই নূতন কাব্যধারা প্রতিষ্ঠাও সে-কারণেই সম্ভবপর হয়েছিল।[৫৫] আরো একটা কারণ ছিল এবং মনে হয় এই কারণটিই গভীরতর। নূতন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নূতন কাব্যাদর্শেরও বিশেষ প্রয়োজন, সে কাব্যাদর্শ এসেছিল 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর কবি টি. এস. এলিঅটের কাছ থেকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের চরম আঘাত ইয়োরোপে যুগান্তর এনেছিল। শুধু রাজনৈতিক জীবনেই নয়, জীবনচর্যায় এবং মানসিকতায়ও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রত্যক্ষ না হলেও অপ্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল বাংলাদেশেও, জীবনচর্যা

এবং মানসিকতায় এখানেও ওলট-পালট ঘটে গেল।[৫৬] শিল্পবিপ্লব তথা যন্ত্র-সভ্যতার ঢেউ ইয়োরোপের কূল ছাপিয়ে অনেক আগে থেকেই ভারতীয় তথা বঙ্গীয় কৃষিসভ্যতার নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢুকতে সুরু করেছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নবাবিষ্কৃত যে-সমস্ত তথ্য ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার জগতে বিপ্লব এনেছিল সে-সমস্ত প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী অত্যল্প কাল মধ্যে একযোগে হুড়মুড় ক'রে এসে বঙ্গের নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের চিন্তাধারায়ও ঢুকে পড়ল।[৫৭] ফলে তিরিশের দশকের কবি ও সাহিত্যিকদের এলিঅটীয় মানসিকতার নৈকট্যে পেঁছোতে আর বিলম্ব ঘটে নি। কলকাতা-কেন্দ্রিক নগরসভ্যতার নারকীয় দিনচর্যার মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করলেন এলিঅটীয় কাব্যজগতেরই পৃষ্ঠভূমি। জীবনের রূঢ় বাস্তবের কাব্য-রূপায়ণে অনিবার্য হয়ে দেখা দিল এলিঅটের কাব্যরীতি, আঙ্গিক, প্রকরণ, এমনকি কাব্যস্বভাবও। বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখের তিরিশের দশকের কাব্য-মানসিকতায় নৈকট্য এসেছিল সাগরপারের এলিঅটের সঙ্গে (সেই সুবাদে বোদলেয়ারেরও সঙ্গে); পক্ষান্তরে উত্তরাধিকার পেয়েও ব্যবধান রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সে-ব্যবধান ঐতিহ্য-বিরোধিতার আর কাব্যবিদ্রোহের।[৫৮]

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (এমনকি বুদ্ধদেব বসুর দেহবাদেও) প্রভৃতির কবিতায় সে-সময় চড়া সুর বেজে উঠলেও কাব্যাদর্শের অভাবে ধারা-স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয় নি; অথচ বিষ্ণু দে প্রমুখ অনায়াসে যুগোপযোগী এলিঅটীয় কাব্যাদর্শের অনন্যাশ্রয়ে বাংলা কাব্যে নূতন ধারা সংযোজন করতে পেরেছিলেন। বাংলা কাব্যের মোড় ফেরাতেই তিরিশের দশকে সনিষ্ঠ ব্যাপক এলিঅট চারণার সূত্রপাত ঘটেছিল। একদিকে অনুবাদের মাধ্যমে এলিঅটীয় কাব্য-বৈশিষ্ট্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা তথা বাংলা কাব্যধারায় এলিঅটীয় আবহাওয়া গড়ে তোলার প্রয়াস; আবার অন্যদিকে বাংলা কাব্যে এলিঅটীয় প্রকরণাদির সুষ্ঠু রূপায়ণ তথা ঐতিহ্য-সঞ্চার এবং এলিঅটীয় কাব্যতত্ত্বের আলোকে বাংলা কাব্য ও কবির পুনর্মূল্যায়ন প্রয়াস। বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন এবং আরো অনেকেই এলিঅটের কাব্যস্বভাব, আঙ্গিক, দৃষ্টিভঙ্গি তথা চেতনাদির অঙ্গীকরণ করেছিলেন। কাব্যনাট্য রচনায় বুদ্ধদেব বসু এলিঅটীয় কাব্যনাট্যাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদ-সমূহে বাংলায় এলিঅট চারণার উপর্যুক্ত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে; সেই সঙ্গে বিষ্ণু দে প্রমুখের কবিকৃতি সমূহও পর্যালোচনা করা হবে এলিঅট প্রভাবের প্রগাঢ়তা নির্ণয়ের জন্য। প্রথমে এলিঅট অনুবাদ বিষয়ক আলোচনা এবং তার পরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এলিঅটীয় কাব্যাদর্শ পরিগ্রহণ পর্যালোচনায় যথাবিহিত প্রয়াস।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১। *Four Quartets*, p. 22

২। 'কয়েকটি লাইন' ধূসর পাণ্ডুলিপি, পৃঃ ২২

৩। কবিতার কথা, পৃঃ ৬৬-৬৭

৪। 'The Metaphysical Poets', *Selected Essays*, p.289

৫। 'যাকে 'কল্লোল' যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।'—'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' (বুদ্ধদেব বসু), নতুন সাহিত্য, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ৮

৬। 'পুনশ্চ'-র অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল ১৯৩২; ১৯৩১-এ রচিত 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন'

৭। 'সবুজ পত্রে'-র প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩২১ (১৯১৪)। সময়টা প্রথম মহাযুদ্ধের আশ্চর্য রকম কাছাকাছি। মহাযুদ্ধ সুরু ২৮ জুলাই ১৯১৪; অস্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত ২৮ জুন

৮। '…নদীর স্রোত তীব্র বাঁক নিলো এখানে, 'সবুজ পত্রে'-র আগে এবং পরে, যেন দুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই।' —প্রবন্ধ, সংকলন, পৃঃ ৪৬

৯। 'সবুজ পত্রের মুখপত্র', প্রবন্ধ সংগ্রহ-১-এ সঙ্কলিত। উদ্দেশ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-৪-এ, পৃঃ ২৩১

১০। '…সাহিত্যের সচল পথটির নির্দেশ দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথই প্রমথ চৌধুরীকে দিয়া 'সবুজ পত্র' নিশান মেলিয়া ধরিলেন…'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-৪, পৃঃ ২৩০

১১। ভিন্নতর উপমার জন্য ঐ, পৃঃ ২৩০ দ্রষ্টব্য

১২। *Selected Prose*, p. 58

১৩। 'সবুজ পত্রে'-র পূর্বে 'ভারতী'-তে চলিত ভাষার পক্ষে ওকালতি করেন প্রমথ চৌধুরী

১৪। *Selected Prose*, p. 65

১৫। রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য, পৃঃ ১১৮ ; কালের পুতুল, পৃঃ ১৪। 'চতুরঙ্গ'-র শেষ স্তবকের (পৃঃ ১১৮) সঙ্গে বিষ্ণু দে'-র 'দামিনী' কবিতার প্রথম স্তবক তুলনীয়

১৬। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, পৃঃ ১৮১

১৭। এই আলোচনায় free verse (vers libre) এবং prose poetry উভয়েরই অভিধা 'গদ্যকবিতা'

১৮। ১৯১২। রবীন্দ্রজীবনকথা, পৃঃ ১২৫-২৬

১৯। 'পুনশ্চ'-র ভূমিকা ; সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৩৭

২০। ১৯৩১-৩২

২১। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য, পৃঃ ১২৭ ; রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়, পৃঃ ৮৫-৮৭

২২। পুনশ্চ (ভূমিকা)

২৩। সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৩৮

২৪। ঐ, পৃঃ ২৬

২৫। সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১১৫

২৬। ব্যাঙ বিষয়ে কবির বিরূপতার জন্য, ঐ পৃঃ ১০৮ দ্রষ্টব্য

২৭। The echo of Eliot is obvious.—*The Later Poems of Tagore*, p. 141

২৮। রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪, পৃঃ ২৭৮-৭৯

২৯। কল্লোল যুগ, পৃঃ ১৬৬

৩০। 'এ যুগ অনেক লেখকের—একজনের নয়, কয়েকজন কবির যুগ।' —কবিতার কথা, পৃঃ ৩৮

৩১। ঐ, পৃঃ ৩৮

৩২। ঐ, পৃঃ ৩৪

৩৩। ঐ, পৃঃ ১১২

৩৪। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', নতুন সাহিত্য র. শ. সং, পৃঃ ৭

৩৫। 'প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই' আধুনিক বাংলা কবিতা সুরু এমন সিদ্ধান্তও আছে।—বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃঃ ১১৩

৩৬। কবিতার কথা, পৃঃ ২০

৩৭। 'রবীন্দ্রনাথের 'মতো' হতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন তাঁরা (সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়)।'—'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', নতুন সাহিত্য র. শ. সং, পৃঃ ৪।

৩৮। প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ৯৯-১০০।

৩৯। '…চৌধুরী মহাশয় সম্ভবতঃ ফরাসী গদ্য লেখকদের নিকট হইতেই তাঁহার অভিনব গদ্য-ভঙ্গীটি লিখিবার প্রথম প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন।' —'প্রমথ চৌধুরী', সময় ও সাহিত্য, পৃঃ ১৭৩-৭৪।
'…শুধু মনটেইন বা la Rochefoucauld নয়, সমগ্র ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবই প্রমথ চৌধুরীর ওপর ছিলো।'—প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ৮৪।

৪০। 'প্রমথ চৌধুরী নাগরিক সাহিত্যিক, বিংশ শতাব্দীর বাংলার নাগরিকতার ভাষ্যকার।'—প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ৪৬।

৪১। কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, পৃঃ ২০৬।

৪২। ঐ, পৃঃ ২০৭।

৪৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-৪, পৃঃ ২৬৪-৬৫।

৪৪। ঐ, পৃঃ ২৬৭-৬৮।

৪৫। কবি মোহিতলাল, পৃঃ ৯।

৪৬। 'কাব্য ও জীবন', সাহিত্য-বিচার, পৃঃ ৫৬।

৪৭। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', নতুন সাহিত্য র. শ. সং পৃঃ ৭।

৪৮। কবি যতীন্দ্রনাথ ও আ. বাং. ক. প্র. প, পৃঃ ২৬০।

৪৯। 'পয়ার', মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃঃ ১১৪।

৫০। 'ভূমিকা' (ভবতোষ দত্ত), ঐ, পৃঃ ৬।

৫১। কালের পুতুল, পৃঃ ১৩২।

৫২। কল্লোল যুগ, পৃঃ ১৬৭।

৫৩। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', নতুন সাহিত্য র. শ. সং, পৃঃ ৮।

৫৪। কল্লোল, আষাঢ় ১৩৩৪, পৃঃ ২১১।

৫৫। কবি যতীন্দ্রনাথ ও আ. বাং. কবিতার প্র. প., পৃঃ ২৬১-৬২; একটি নক্ষত্র আসে, পৃঃ ১১।

৫৬। কল্লোলের কাল, পৃঃ ১৩৬।
৫৭। '...প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ কবিরা যখন কবিতা থেকে রোমান্টিসিজমকে উৎখাত করতে চাইলেন, সেই দূরন্ত ঢেউয়ের আলোড়নও আমাদের দেশে এই বাংলা কাব্যে এলো।'—কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল, পৃঃ ১৫৪।
৫৮। 'লোকেরা এর নাম দিয়েছিলো রবীন্দ্র-বিদ্রোহ'...'আমার যৌবন', শারদীয় দেশ ১৩৮০, পৃঃ ২৩।

দুই

এলিঅটের কবিতার বাংলা রূপান্তর

১. এলিঅট অনুবাদ : রবীন্দ্রনাথ

উপলক্ষ্য যাই থাক এবং যে-প্রক্রিয়াতেই সম্পন্ন হোক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টি এস. এলিঅটের কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এলিঅটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান শুধু ভৌগোলিকই নয়, কালগতও। তিন দশকের কালগত ব্যবধান কাব্যক্ষেত্রে উভয় মেরুর দূরত্ব এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্বজ কবি, কাব্যাদর্শেও সেই পূর্ববর্তী কাব্য-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী[১] যার সঙ্গে সম্পর্ক চোকাতে এলিঅট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এলিঅট কাব্যে ক্লাসিকরীতির প্রবক্তা আর রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ 'জন্ম রোমাণ্টিক' —লিরিক সাধনার তপঃসিদ্ধ যুগন্ধর সাধক। বিপরীত মেরুর কাব্য-সাধক হয়েও প্রাচ্যের ঋষিকবিকৃত এলিঅটের কবিতার বাংলা রূপান্তরের ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে প্রতীচীর যুগাতিশায়ী কবি-প্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন, স্বীকৃতি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারা তথা ঘোষিত প্রকাশ্য রবীন্দ্র-বিরোধী এবং সচেতন রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত (?) কাব্য-আন্দোলনকে।

এলিঅটের 'জার্নি অব দি মেজাই' কবিতার রবীন্দ্রনাথকৃত পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ 'তীর্থযাত্রী' প্রথম প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকার মাঘ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, সংখ্যায়। রবীন্দ্র-জীবনের উত্তরপর্বে এই সম্ভবতঃ একমাত্র পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ; যদিচ এই অনুবাদ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নয়, অন্যের প্ররোচনায়। বিষ্ণু দে-র তিনটি প্রবন্ধে এই অনুবাদের কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ আছে। গদ্য-কবিতা বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের সূত্রে বিষ্ণু দে-র অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'জার্নি অব দি মেজাই' অনুবাদের 'পুনর্লিখন' সম্পন্ন করেন :

> **So in my youthful impertinence I argued with him, and then sent him a poem with prose rhythms moving into**

১ আধুনিক কাব্য, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪, পৃঃ ৩৪১

verse rhythms as the need arose and asked him to rewrite it according to his cannons. He turned it into prose altogether, and then it was triumphantly revealed that it was realy a translation and the author was T. S. Eliot.[২]

'জার্নি অব দি মেজাই' কবিতাটিই যে উদ্দিষ্ট 'পুনর্লিখনের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির পরবর্তী অংশেই তার পরোক্ষ উল্লেখ আছে।[৩] তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে উভয়ে এলিঅটের ঐ একটি কবিতারই অনুবাদ করেন। তৃতীয়তঃ, উভয়ের অনুবাদের ধরণ সম্পর্কে বিষ্ণু দে যে-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন তা উভয় কবির ঐ কবিতার অনুবাদ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা-মালা'র দ্বিতীয় বক্তৃতার মধ্যেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে ঃ

> লেখক তখন ক্ষুব্ধ হয়ে আট নম্বব 'এরিয়েল' কবিতাটির যে অনুবাদ করেছিল সেটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠায়। সে সময়ে গদ্যছন্দ বিষয়ে তার জিজ্ঞাসা ছিল। তাই অনুরোধ করেছিল, কবিতাটি যদি তিনি তাঁর তৎ-কালীন গদ্য-কবিতার ছন্দে লিখে দেন তাহলে ঐ ছন্দের স্বরূপটা সে ধরতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দানুসারে লেখাটি পুনর্লিখন করে পাঠান কয়েকদিনের মধ্যে।[৪]

Mr. Eliot Among the Arjunas এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার মধ্যে দু-দশকের ব্যবধান থাকলেও[৫] একটা জিনিস স্পষ্ট যে কুড়ি বছর পূর্বের প্রবন্ধে যে-কবিতাটির নাম সোজাসুজি করা হয় নি, কুড়ি বছর পরের প্রবন্ধান্তরে সে-কবিতাটির উল্লেখ সোজাসুজিই করা হয়েছে। তবে একটি বিষয়ে উভয় প্রবন্ধের বক্তব্যে নির্বিরোধ সাম্য রয়েছে ঃ রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী' বিষ্ণু দে-র 'রাজর্ষিদের যাত্রা'-র 'পুনর্লিখন' মাত্র। এই উক্তি কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য তা অবশ্যই বিচার্য।

'তীর্থযাত্রী' রবীন্দ্রনাথের রচনারূপেই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে;

২। Mr. Eliot Among the Arjunas, *T. S. Eliot*, p. 101

৩। Ibid

৪। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা পৃঃ ২০

৫। প্রবন্ধ দুটির প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯৪৮ ও ১৯৬৬

সাময়িক পত্রেও কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রকাশিত হয়।[৬] 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে সংকলন কালে কবিতাটি অন্যান্য রচনার সমান মর্যাদা পেয়েছে। কেবল 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে আছে : 'তীর্থযাত্রী কবিতাটি 'টি. এস. এলিয়ট'-এর The Journey of the Magi-শীর্ষক কবিতার অনুবাদ।'[৭] অন্য কবির রচনা কিংবা অনুবাদের 'পুনর্লিখন' অনুরূপ ভাবে রবীন্দ্রনাথ আত্মসাৎ করেছেন, এ অভিযোগ সম্ভবতঃ আর কেউ করেন নি। অবশ্য পরবর্তী অংশে বিষ্ণু দে পরিচয়-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশরূপে উল্লেখ করেছেন :

> তিনি বলেন, তুমি ঐ কবিতাটির অনুবাদ ওর কাছ থেকে নিয়ে ছাপো। তার পরে তিনি ইংরেজি কবিতাটি এবং অনুবাদটি মিলিয়ে দেখেন এবং সেইটাই হল ১৩৩৯ সালের 'এলিঅট' অনুবাদ।

বক্তব্যটি অল্পাধিক বিভ্রান্তিকর। 'ঐ কবিতাটির অনুবাদ' বলতে Journy of the Magi-এর অনুবাদের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু অনুবাদটি কার? রবীন্দ্রনাথ অথবা বিষ্ণু দে-র? আলোচনার প্রাসঙ্গিক তথ্য রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের সম্ভাবনার পাল্লাই ভারি করেছে। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-র 'রাজর্ষিদের যাত্রা'-র পুনর্লিখন ক'রে থাকলেও ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু 'তীর্থযাত্রী' 'রাজর্ষিদের যাত্রা'-র পুনর্লিখিত রূপ নয়, আভ্যন্তরীণ প্রমাণের ওপর নির্ভর করলে এ কথাই বলতে হয়। 'তীর্থযাত্রী' 'জার্নি অব দি মেজাই'-এরই মূলানুগ অনুবাদ। পুনর্লিখনের অর্থই হল পূর্ববর্তী বা মূল রচনার অর্থ আনুপূর্বিক অবিকৃত রেখে শব্দ কিংবা বাক্যবিন্যাসে পরিবর্তন। শব্দ পরিবর্তনেও বাধা নেই কিন্তু পরিবর্তিত শব্দ অবশ্যই হবে পূর্ববর্তী শব্দের সমার্থক। কবির কাব্যাদর্শ কিংবা শৈলী অনুযায়ী প্রকাশভঙ্গী পাল্টাতে বাধ্য, প্রয়োজনে বাক্যের সঙ্কোচন-প্রসারণও সহনীয়; কিন্তু এই অজুহাতে অর্থবিকৃতি অ-ক্ষমার্হ। মূল কবিতার ক্রিয়ার কালেরও হেরফের ঘটানো অনুচিত।

একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বকীয় কাব্যবিশ্বাস এবং আকাঙ্ক্ষিত কাব্যরীতি অনুযায়ীই 'পুনর্লিখনের' অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিষ্ণু দে (to rewrite it according to his cannons) এবং রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই তাই করেছিলেন (He turned it into prose altogether)। 'তীর্থযাত্রী' শুধু

৬। প রি চ য়, মাঘ ১৩৩৯, পৃ: ৪৫৪-৫৫। পাদটীকা : 'T. S. Eliot-এর 'The Journey of the Magi' নামক কবিতার অনুবাদ।'

৭। পুনশ্চ, পৃঃ ২০৫

গদ্য-কবিতার ছন্দেই রচিত নয়, রবীন্দ্র গদ্যকাব্যরীতি অনুযায়ী তার মেজাজেও (spirit) গদ্যস্পন্দ :

কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সবচেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট—
একেবারে দুর্জয় শীত।
ঘাড়ে-ক্ষত পায়ে-ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।[৮]

এর পাশাপাশি 'রাজর্ষিদের যাত্রা'-র সংশ্লিষ্ট চরণগুলি, গদ্যস্পন্দ প্রয়োজনে কাব্যস্পন্দের অভিমুখী (prose rhythms moving into verse rhythms as the need arose), মিলিয়ে দেখলেই 'তীর্থযাত্রী'-র গদ্যধর্মিতা সহজেই ধরা পড়ে :

আমাদের সে যাত্রা হিমে
বছরের সবচেয়ে খারাপ সময়ে
অভিযান, ও রকম দীর্ঘ অভিযান :
পথঘাট কাদায় গভীর, ধারালো হাওয়া
দুর্গম পথস্তৎ, শীতের চরম।
আর উটগুলি উত্যক্ত, খুরে ঘা, তেরছা মেজাজ
থেকে থেকে শুয়ে পড়ে গলন্ত বরফে।[৯]

'কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা', 'সময়টা সবচেয়ে খারাপ,' 'ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ', 'একেবারে দুর্জয় শীত', 'শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে' প্রভৃতি অভিব্যক্তির তুলনায় 'আমাদের সে যাত্রা হিমে', 'বছরের সব চেয়ে খারাপ সময়ে', 'অভিযান, ও রকম দীর্ঘ অভিযান', 'দুর্গম পথস্তৎ, শীতের চরম', 'থেকে থেকে শুয়ে পড়ে গলন্ত বরফে' প্রভৃতির প্রকাশভঙ্গি যে অধিকতর কাব্যধর্মী সেকথা উপলব্ধি করতে খুব একটা কাব্যসচেতন না হলেও চলে।

আর একটা দিকও আছে। 'তীর্থযাত্রী'-র ছন্দ নির্ভেজাল গদ্য-ছন্দ, প্রচলিত বাংলা ছন্দ-রীতির কোনো ধারাতেই এর বিচার সম্ভব নয়, নিষ্ঠাবান ছান্দসিকের বিশ্লেষণেও এর অসম দৈর্ঘ্যের চরণের মতোই অসম দৈর্ঘ্য ও বিষম মাত্রার পর্ব

৮। পুনশ্চ, পৃ: ১৩০
৯। এলিঅটের কবিতা, পৃ: ৪৩

পীড়াদায়ক হয়ে ধরা পড়ে। 'রাজর্ষিদের যাত্রা'-র ছন্দ কিন্তু আগাগোড়া অক্ষরবৃত্ত ; ছয়, আট ও দশ মাত্রার পর্বে কবিতাটি রচনা করার সনিষ্ঠ প্রয়াস সর্বত্র ঃ

বছরের সবচেয়ে / খারাপ সময়ে /	=৮+৬
অভিযান, ও রকম / দীর্ঘ অভিযান /	=৮+৬
পথ ঘাট কাদায় গভীর, / ধারালো হাওয়া/	=১০+৬

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে কবি বিষ্ণু দে-র বক্তব্যের আংশিক সত্যতা প্রমাণিত হলেও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যে মূলতঃ অন্য অনুবাদের 'পুনর্লিখন' এ তথ্যের সমর্থন এখানে নেই। তাই, 'তীর্থযাত্রী'কে স্বাধীন অনুবাদ ব'লে গ্রহণ করতে কোথাও বাধা নেই। 'রাজর্ষিদের যাত্রা' এবং 'তীর্থযাত্রী'-র শব্দপ্রয়োগে যথেচ্ছ অর্থপার্থক্যও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। অর্থপার্থক্যের কিছু নমুনা এখানে দিচ্ছি ঃ

The ways deep and the weather sharp

রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট (তীর্থযাত্রী)

পথ ঘাট কাদায় গভীর, ধারালো হাওয়া (রাজর্ষিদের যাত্রা)

The very dead of winter

একেবারে দুর্জয় শীত (তীর্থ)

দুর্গম পথস্তৎ, শীতের চরম (রাজ)

And the camels galled, sore-footed refractory

ঘাড়ে-ক্ষত পায়ে-ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো (তীর্থ)

আর উটগুলি উত্যক্ত, খুরে ঘা, তেরছা মেজাজ (রাজ)

There were times we regretted

মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে (তীর্থ)

মাঝে মাঝে আমাদেরও আফশোষ হয়েছে (রাজ)

The summer palaces on slopes, the terraces,

যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্ত মঞ্জিল, তার চাতাল (তীর্থ)

কোথায় গড়ানে সেই গ্রীষ্মাবাস, সেই হাওয়াখানা, (রাজ)

Then the camel men cursing and grumbling

এদিকে উটওয়ালারা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ করে রাগে (তীর্থ)

তারপরে উটের লোকেরা দিব্যি পাড়ে গজগজ করে, (রাজ)

And running away, and wanting their liquor and women,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে (তীর্থ)
পালায়, চাহিদা তোলে মদ আর স্ত্রীলোকের (রাজ)

And the night-fires going out, and the lack of shelters,
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না (তীর্থ)
আর নিভে যায় রাতের আগুন, আর আস্তানা জোটে না (রাজ)

And the cities hostile and the towns unfriendly
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা ; নগরীতে সন্দেহ, (তীর্থ)
শহর বিরুদ্ধ সব আর সদর বেগানা, (রাজ)

At the end we preferred to travel all night,
শেষে ঠাওরালেম, চলব সারারাত ; (তীর্থ)
শেষে তাই আমরা চললাম সারারাত, না থেমেই (রাজ)

Sleeping in snatches,
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে (তীর্থ)
টুকরো টুকরো ঘুমিয়ে (রাজ)

With the voices singing in our ears, saying
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে (তীর্থ)
এদিকে কানে কানে গান করে দিব্য কণ্ঠস্বর, তারা বলে, (রাজ)

That this was all folly
এ সমস্তই পাগলামি (তীর্থ)
এ সবই নির্বুদ্ধিতা (রাজ)

দেখা যাচ্ছে, 'জার্নি অব দি মেজাই'-এর প্রথম অনুচ্ছেদের কুড়িটি চরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র অনুবাদে তেরটিতেই অর্থপার্থক্য। উভয়ের বাংলা তর্জমাই মূলানুগ হলেও মূলের শব্দপ্রয়োগ বাচনরীতি চরণসন্নিবেশ, এমনকি চিহ্নপ্রকরণ পর্যন্ত, 'রাজর্ষিদের যাত্রায়' যথাযথ অনুসরণ করার প্রবণতা বেশি। কেবল দু-একটি চরণে যথাযথ অনুবাদের অতিরিক্ত শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে অথবা প্রয়োজনীয় শব্দপ্রয়োগের অপ্রতুলতা দেখা গেছে। With the voices singing in our ears, saying-এর বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদে 'এদিকে কানে কানে গান করে দিব্য কণ্ঠস্বর, তারা বলে' এই চরণটিতে 'দিব্য' শব্দটি অতিপ্রযুক্ত, আবার And an old white horse galloped away in the meadow-এর অনুবাদ 'আর একটা সাদা ঘোড়া মাঠে ছুটে যায়' এই চরণে old অর্থজ্ঞাপক বাংলা শব্দ

অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ কিন্তু যাথার্থ্যের গণ্ডী অতিক্রম করে নি।

অনুবাদের চরণবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কোথাও-কোথাও স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। মূলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ মিলে অনুবাদে একটি চরণ হয়েছে এবং মূলের দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় চরণটি অনূদিত চরণের প্রথমাংশে জায়গা পেয়েছে :

Just the worst time of the year
For a journey, and such a long journey :

ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সবচেয়ে খারাপ,

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের নবম, দশম ও একাদশ চরণ অনুবাদে এর বিপরীত প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মূলের চরণ ভেঙে নিজস্ব গদ্য-কবিতার ধরণে মুক্তচ্ছন্দের চরণ-বিন্যাসরীতিতে সাজিয়েছেন :

But there was no information, and so we continued
And arrived at evening, not a moment too soon
Finding the place ; it was (you may say) satisfactory.

কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরও আগে।
যেতে যেতে সন্ধে হল ;
সময় পেরিয়ে যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা।
বলা যেতে পারে—ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক।

তৃতীয় অনুচ্ছেদের চরণবিন্যাসে কবির স্বাধীনতা আরো ব্যাপক। এলিঅটের মোট ছ'টি চরণ ভেঙে নিজের মতো ক'রে সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

This set down
This : were we led all the way for
Birth or Death ? There was a Birth, certainly,
We had evidence and no doubt. I had seen birth and death,
But had thought they were different ; this Birth was
Hard and bitter agony for us, like Death, our death.

এই লিখে রাখো : এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর !
জন্ম একটা হয়েছিল বটে
প্রমাণ পেয়েছি সন্দেহ নেই।

এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও—

মনে ভাবতেম তারা এক নয়।

কিন্তু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোর,

দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।

বিষ্ণু দে-র তর্জমায় কিন্তু চরণবিন্যাসে অনুরূপ স্বাধীন আচরণ বিশেষ দেখা যায় না। তাঁর চরণ-বিভাগ সর্বত্রই মূলানুগ, স্বাধীনতা কেবল শব্দ প্রয়োগেই।

এই বিশ্লেষণ একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেয় যে 'তীর্থযাত্রী' কোনোক্রমেই 'রাজর্ষিদের যাত্রা'-র 'পুনর্লিখন' নয়, এলিঅটের মূলানুগ অনুবাদ। 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দানুসারে লেখাটি পুনর্লিখন ক'রে পাঠান কয়েকদিনের মধ্যে' এই উক্তি পুরোপুরি সত্য নয়, বরং অধিকতর সত্য বিষ্ণু দে-র এই উক্তির পরবর্তী অংশ: 'তারপরে তিনি ইংরেজি কবিতাটি এবং অনুবাদটি নিয়ে মিলিয়ে দেখেন এবং সেইটেই হল ১৩৩৯ সালের এলিঅট অনুবাদ।'

ব্যঞ্জনার নিরিখে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে কিছু দৈন্য প্রকট হয়ে উঠেছে। 'তীর্থযাত্রী' নামকরণে ভাবের পবিত্রতা অভিব্যঞ্জিত হলেও মূলের চিত্রকল্প ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি। 'রাজর্ষিদের যাত্রা'-র মধ্যেও সে-খৃষ্টীয় চিত্রকল্প অনুপস্থিত, তবে 'জার্নি অব দি মেজাই'-এর বঙ্গানুবাদ হিসেবে তা অধিকতর সার্থক। অনুরূপ না হলেও অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যাপক চিত্রকল্পের ব্যবহার এলিঅট সর্বত্র করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে এই সমস্ত চিত্রকল্প স্থান পায় নি, ব্যাখ্যামূলক ভাষায় সেগুলো বোঝানো হয়েছে। **And the silken girls bringing sherbet**, অস্পষ্ট মিতভাষণে এই চিত্রকল্পের প্রাণ সঞ্চারিত। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে এই চিত্রকল্প ধরা পড়ে নি, 'আর শর্বতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল।' স্পষ্টভাষণের তরল বক্তব্য অপমৃত্যু ঘটিয়েছে চিত্রকল্পটির। আর একটি চিত্রকল্প **And three trees on the low sky**, এও হারিয়ে গেছে অনুবাদে 'দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে।' বিষ্ণু দে-র অনুবাদে এ সমস্ত চিত্রকল্প অক্ষতই আছে।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে এই চিত্রকল্প-বিভ্রান্তির সম্ভবত: একমাত্র কারণ এই যে তিনি চিত্রকল্পবাদী কবি নন। নৈর্ব্যক্তিক বস্তুনিষ্ঠ কবি **Orrick Johns, Amy Lowel, Edwin A. Robinson, T. S. Eliot, Ezra Pound** প্রভৃতির আধুনিক কাব্য তাঁর মনে হয়েছে, 'ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।'[১০] অন্য দিকে বিষ্ণু দে চিত্রকল্পবাদী

১০। রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪, পৃ: ৩৪৪

আধুনিক কবি ব'লেই বলতে বাধ্য হন, 'গদ্যধর্মের পূর্ণ ব্যাখ্যার চেয়ে তাই কাব্য-ধর্মী ইঙ্গিতময়তায়, ব্যঞ্জনায় আত্ম অভিজ্ঞতার পূর্ণ রূপায়ণ।'[১১] এলিঅটের ইঙ্গিতময় কাব্যধর্মী চিত্রকল্পব্যঞ্জনা বিষ্ণু দে-র অনুবাদে যথাযথ রূপায়ণের প্রয়াস আছে, রবীন্দ্রনাথে এই প্রয়াস রূপায়িত হয়েছে গদ্যধর্মী পূর্ণ ব্যাখ্যায়।

সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতার বাস্তব বিচারবোধও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদকে কোথাও-কোথাও বিড়ম্বিত করেছে ব'লে অনুমিত হয়। **And the camels galled, sore-footed, refractory** চরণটির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ঘাড়ে ক্ষত পায়ে-ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো।' 'gall'-এর অর্থ 'ঘর্ষণজনিত ক্ষত' এবং ভেতরে-ভেতরে মেজাজ বিগড়ে যাওয়া।' রবীন্দ্রনাথ প্রথম অর্থগ্রহণ ক'রে ঐ চরণে 'galled'-এর অনুবাদ করেছেন 'ঘাড়ে-ক্ষত'। সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন, ভারবাহী পশুর ক্ষেত্রে (বলদ বা ঘোড়ার মতো) জোয়াল বা তজ্জাতীয় কিছুর দ্বারা ঘাড়েই ঘর্ষণজনিত ক্ষত হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবে উটের বেলায় তা হয় না। অনুরূপ **Six hands at an open door dicing for pieces of silver** -এর রাবীন্দ্রিক তর্জমা, 'দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে।' এলিঅটের সৃষ্ট চিত্রকল্পের যাদু বিশ্বকবির দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, সেই সঙ্গে **'six hands'**-এর অধিকারী হয়েছে 'দুজন মানুষ'। এখানেও সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতার চিন্তাই অনুবাদককে অনুরূপ অনুবাদে প্ররোচিত করেছে ব'লে মনে হয়। খেলাটা যখন পাশাই তখন দুজনের বেশি পাশুড়েকে নিয়োজিত করা অসমীচীন, এরকম বাস্তবচিন্তাই কবির মনে থাকা স্বাভাবিক। **'for pieces of silver'**-এর বিশ্বাস্য তথা দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী অনুবাদ করেছেন 'টাকার লোভে'; কিন্তু তার ফলে অর্থের ব্যঞ্জনা এবং ব্যাপকতা উভয়ই বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

অনুবাদে অসঙ্গতি থাকলেও একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য যে 'তীর্থযাত্রী' সমসাময়িক রবীন্দ্রকাব্যধারার পরিচয়বাহী এবং রচনারীতিতে 'পুনশ্চ'-র অন্যান্য কবিতার সমপর্যায়ভুক্ত—রবীন্দ্রনাথের সে-কাব্যধারা অবশ্যই রোমান্টিক এবং সে-রীতি অ-নৈর্ব্যক্তিকতার অনুসারী।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার একটা বিশিষ্ট রীতি, চরণের মাঝখানে তিনি পূর্ণযতি বা পূর্ণচ্ছেদ কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন।[১২] এজরা পাউন্ড, টি. এস. এলিঅট, উইলফ্রেড ওয়েন, সিসিল ডে লুইস, স্টিফেন স্পেন্ডার প্রমুখ গদ্য-

১১। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আ. স., পৃঃ ৪৭
১২। বিরল ব্যতিক্রম 'চিররূপের বাণী' (পুনশ্চ)

কবিতার প্রবক্তারা চরণের মাঝখানে পূর্ণযতি (বা পূর্ণচ্ছেদ) ব্যবহার করাকে গদ্যকবিতার এক বিশিষ্ট প্রকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'তীর্থযাত্রী' কবিতার মূলের চরণমধ্যস্থ পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ পরিহার করেছেন।

Birth or Death ? There was a Birth, certainly,
We had evidence and no doubt. I had seen birth and death,

সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।
জন্ম একটা হয়েছিল বটে
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও—

চরণমধ্যস্থ পূর্ণচ্ছেদ বর্জন ছাড়াও মূলের একটি চরণ অনুবাদে দুটি চরণে বিভাজিত।

'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে [১৩] বিশ শতকের প্রথম পাদের প্রতিনিধি 'আধুনিক' ইংরেজ কবিদের 'বিশুদ্ধ আধুনিকতার' প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন চীনা কবিতার পাশাপাশি কয়েকটি আধুনিক কবিতা 'আদর্শ' হিসেবে গ্রহণ ক'রে তাদের আংশিক অনূদিত নমুনা তুলে ধরেছেন। পূর্ববর্তী ধারার কবি ব'লেই আধুনিক অভিধায় অভিহিত পরবর্তী বিরোধী কাব্যধারা তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন নি। সে-সময় এই সমস্ত কবিতার প্রতি তাঁর কোনো অনুরাগ বা শ্রদ্ধা ছিল না। অনুবাদেও তা ধরা পড়ে নি। বরং 'বিশ্বের প্রতি উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি'-তে আবিল 'চিত্তবিকারের' প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের প্রয়াস যেন অনুবাদেও সংক্রমিত।

এলিঅটের 'প্রিল্যুডস্' ও 'আণ্ট হেলেন' কবিতা দুটির আংশিক অনুবাদ 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট। 'প্রিল্যুডস্'-এর আনুপূর্বিক অনুবাদ কবি করেন নি, অনুবাদও সনিষ্ঠ মূলানুগ নয়। চরণবিন্যাসে মূলের অনুক্রম রক্ষিত হয় নি। প্রথম অনুচ্ছেদের (অন্তিম চরণটি ব্যতীত) যে-অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেছেন মূলের পাশাপাশি তা তুলে ধরলেই অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।

The winter evening settles down
With smell of steaks in passageways.
Six o'clock.
The burnt-out ends of smoky days.

১৩। সাহিত্যের পথে এবং রবীন্দ্র রচনাবলী ২৪শ খণ্ডে সংকলিত

And now a gusty shower wraps
The grimy scraps
Of withered leaves about your feet
And newspapers from vacant lots ;
The showers beat
On broken blinds and chimney-pots,
And at the corner of the street
A lonely cab-horse steams and stamps.

এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসের গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা—
ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুল মাখা শুকনো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা শার্সি আর চিমনির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া—
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অনুবাদ করেন নি কবি, কেবল বক্তব্যের ক্ষীণ আভাস দিয়েছেন : 'তার পরে বাসি বিয়ার-মদের গন্ধওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা।' এর পরেই তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম পাঁচটি চরণের অনুবাদ করেছেন :

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চিৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরী।

বক্তব্যের সমর্থনে অনুবাদ না ক'রে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে রবীন্দ্রনাথ [illegible] চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক উদ্ধৃত করেছেন। অনুবাদ করেছেন কেবল ঐ অনুচ্ছেদেরই তৃতীয় তথা উপসংহার স্তবকের তিনটি চরণ :

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে, যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্ছে, পোড়ো জমি থেকে।

সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক কবির সহজাত স্পর্শকাতরতা অ-সুন্দরের প্রতি, অশুচি ও অশোভনের প্রতি। যে-কবিতার মূল উপজীব্য অ-সুন্দর দৃশ্য, ঘটনা, সংসার তার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-অনীহা প্রকটিত এমন কথা বলা না গেলেও সুন্দর 'বিশ্বের প্রতি উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি'-র প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই এই অনুবাদের লক্ষ্য এমনটা অবশ্যই বলা চলে। সম্পূর্ণ কবিতার অনুবাদ তাই প্রয়োজন হয় নি, উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য প্রয়োজন হয়েছে কেবল বিশেষ-বিশেষ অংশের অনুবাদ। মূলের ক্রম রক্ষায় সনিষ্ঠ হতেও পারেন নি, চরণবিন্যাসে এবং প্রকাশভঙ্গিতে অধিকতর স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। কোথাও-কোথাও অনুবাদ হয়েছে বাংলা ভাষার প্রকাশভঙ্গি নির্ভর (প্রথম অনুচ্ছেদের পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

'আণ্ট হেলেন' কবিতার অনুবাদের চেষ্টা কবি করেন নি, কেবল 'কুৎসার দৃষ্টি' দেখাতেই বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলেছেন গদ্যে :

> এই প্রসঙ্গে এলিঅটের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই : বুড়ি মারা গেল—সে বড়োঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নামিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমতো সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এদিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো খানসামা ডিনার টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।[১৪]

কবি বিষ্ণু দে এই ভাবানুবাদ সম্পর্কে বলেছেন, 'পিছনের ছবিটার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ অধীরভাবে বাদ দিয়েছেন।'[১৫] কিন্তু 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধের বক্তব্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে কবিতাটির গূঢ়ার্থ আবিষ্কার কবির উদ্দেশ্য নয়, কবিতায় অবলম্বিত 'কুৎসা দৃষ্টি'-র প্রতি ইঙ্গিত করাটাই এই অনুবাদের মূল লক্ষ্য।

১৪। রবীন্দ্র রচনাবলী-১৩, পৃঃ ৩৫০
১৫। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আ. স., পৃঃ ৬৭

২. এলিঅট অনুবাদ : সুধীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিস্বভাব তথা কাব্যবৈশেষ্ট্য অনুবাদ কর্মেও সমান বিচ্ছুরিত। তাঁর বিশিষ্ট কবিস্বভাব অনায়াস বৈদগ্ধ্যে ও মননশীলতায় প্রতিভাত, অনন্য কাব্যবৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার-মথিত অচলিত শব্দচয়নে সযত্ন লালিত। মৌলিক কিংবা অনুবাদ উভয়তঃ তাঁর ভাষাভঙ্গি, শব্দসন্নিবেশ কিংবা অনুপ্রাসশাসিত ধ্বনিব্যঞ্জনা তারতম্যহীন। উভয় শ্রেণীর কবিতা পাশাপাশি উদ্ধৃত করলেই এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে :

মৌলিক

শোধবোধ শূন্যে অবসিত :
নির্গত স্বেদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত ক্ষমতা ;
পারিশ্রমিকের ক্লান্তি সর্বস্বান্ত শরীরে কষিত ;
নষ্টনীড়ে বিবিক্ত সে, স্বগত মমতা,
অবকাশে নির্বেদ শ্বসিত।
ঘুম নেই তবু রুদ্ধ চোখে :
শিথিল সন্ধিতে জাড্য, ধমনীতে হিম ;
কিন্তু সে, এখনও অন্ধ অস্তমিত সূর্যের আলোকে,
বোঝে না স্বভাবদোষে রাত্রিক কুট্টিম
বররুচি অক্ষয় অশোকে।[১৬]

অনুবাদ

পাদপের গন্ধোচ্ছ্বাসে অনন্তর বিভ্রান্ত, ব্যাকুল,
শষ্প মেলে দিই দেহ কল্পনার সমাধিপত্তনে,
দাঁতে কাটি তপ্ত মাটি, ভুঁইচাঁপা যেখানে প্রতুল,
সর্বনাশে ডুবে যাই নির্বেদের পুনরন্বয়নে···
সম্বন্ধ গুল্মের ঊর্ধ্বে ইতিমধ্যে শূন্য প্রভাস্বর,
বিহঙ্গ বিকচ রৌদ্র নীলিমার হাসিতে মুখর॥[১৭]

১৬। 'অগ্রহায়ণ', এ কা লে র ক বি তা, পৃঃ ১০০

১৭। 'উজ্জীবন', প্র তি ধ্ব নি, পৃঃ ৯১

ওপরের দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে অচলিত তৎসম শব্দসন্নিবেশের প্রবণতা, অনুপ্রাসবহুল ধ্বনিব্যঞ্জনা, ভাবপ্রকাশে বৈদগ্ধ্যের অনুরণন মৌলিক-অনুবাদ-নির্বিশেষে তাঁর সৃষ্টির সর্বত্রই সুধীন্দ্রনাথ ছড়িয়েছেন। 'অবসিত' 'ক্লান্তি' 'ক্ষিবত' 'বিবিক্ত' 'নির্বেদ' 'জাড্য' 'কুট্টিম' প্রভৃতি অচলিত তৎসম শব্দ যেমন অনায়াসে ব্যবহার করেছেন মৌলিক কবিতায়, তেমনি অনূদিত কবিতায় নির্বিচারে প্রয়োগ করেছেন 'অনন্তর' 'বিশ্রান্ত' 'শষ্প' 'প্রতুল' 'নির্বেদ' 'সম্বদ্ধ' 'প্রভাস্বর' প্রভৃতি। অতি প্রকট অনুপ্রাস পাচ্ছি মৌলিক কবিতায় 'শোধবোধ শূন্যে' 'স্বেদের সঙ্গে' 'সর্বস্বান্ত শরীরে কষিত' 'শিথিল সন্ধিতে' 'অন্ধ অস্তমিত' 'অক্ষয় অশোকে', আর অনুবাদে 'অনন্তর বিশ্রান্ত ব্যাকুল' 'দিই দেহ' 'বিহঙ্গ বিকচ' প্রভৃতি।

সুধীন্দ্রনাথের বৈদগ্ধ্যের পরিধি প্রাচ্য ও প্রতীচীতে সমান প্রসারিত। মনীষী পিতা হীরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বৈদগ্ধ্যের উত্তরাধিকার বর্তেছিল তাঁর সুযোগ্য পুত্রের উপর। পিতার সাফল্যময় আদর্শ পুত্রকেও অনুপ্রেরিত করেছিল ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় একাধিক ভাষাচর্চার মতো দুরূহ তথা বিদগ্ধ পদচারণায়। হীরেন্দ্রনাথ বৈদগ্ধ্য ও বহু ভাষাবেত্তার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে, আর সুধীন্দ্রনাথ রেখেছেন তাঁর প্রবন্ধে ও অনূদিত কবিতায়।

'প্র তি ধ্ব নি' কাব্যগ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসী থেকে অনূদিত কবিতাগুলি সংকলিত। ফরাসী কবিতা অনুবাদে বিদুষী ভার্যা রাজেশ্বরীর সাহায্য গ্রহণ করলেও[১৮] ইংরেজি ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল নিঃসংশয়িত। অনুবাদের তালিকায় আছে ইংরেজির শেক্স্পীয়ার হিউ মেনাই, জন মেস্ফীল্ড্, সীগ্ফ্রিড সসুন্, ডি এইচ্. লরেন্স্, সি. ফিল্ড্, জার্মানীর হান্স্ কারোসা, হাইন্রিখ্ হাইনে, যোহান্ ভোল্ফ্গাংগ্, ফন্ গ্যোটে ; ফরাসীর পোল্ ভালেরি, স্তেফান্ মালার্মে প্রমুখের কবিতা। কিন্তু এই তালিকায় সমসাময়িক ইংরেজি সাহিত্যের এলিঅট, পাউন্ড, য়েটস্-এর মতো প্রভাবশালী কবির কবিতার অনুবাদের অনুপস্থিতি বিস্মিত করে। অথচ ইংরেজি কাব্যের বিভিন্ন ধারার পরিচয় দিতে ডি. এইচ্. লরেন্স, ভর্জিনিয়া উল্ফ্, উইন্ডাম্ ল্যুইস, এজরা পাউন্ড্, টি. এস. এলিঅট, ডব্লু. বি. য়েট্স, জেরার্ড ম্যান্লি হপকিন্স্ সম্পর্কে মননশীল দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

এলিঅট অনুবাদে এই নিস্পৃহতা শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে নি। মৃত্যু অব্যবহিত পূর্বে সুধীন্দ্রনাথ 'বরনট্ নরটন' অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন এবং

প্রথম দুটি স্তবক (আঠারটি চরণ) অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর এই সর্বশেষ রচনাটি অসম্পূর্ণ হলেও সযত্ন পরিমার্জনের সাক্ষ্য বহন করছে অনূদিত অংশের দুটি 'লেখন'। পরিবর্তন-পরিমার্জন-পুনর্লিখন আধুনিক কবিদের অনেকেরই কাব্যসাধনার তথা রচনারীতির একটা বিশিষ্ট দিক। ক্লান্তিহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তাঁরা উত্তীর্ণ হতেন তাঁদের নিজ নিজ স্বকীয়তায় তথা আধুনিকতায়। আত্মসচেতনতার সংকটক্রান্তিজনিত আর্তি (tension) উত্তরণের উদ্দেশ্যেই ক্ষমাহীন নির্মম পরিবর্তন ও পরিমার্জন। কবিধর্মের এই বিশেষ আত্মপ্রকাশ রচনারীতির অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে প্রমুখের কাব্যানুশীলনে।[১১] অনুবাদের বেলায়ও তাঁর অনুরূপ কবিকৃত্য থেকে বিচ্যুত হন নি। তাই সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে-র অনূদিত কবিতায় অজস্র পাঠান্তর।

'ফো র্ কো য়া র্টে ট স্' এলিঅটের অন্যান্য রচনার তুলনায় সমসাময়িক বাঙালী কবিদের বেশি আকৃষ্ট করেছিল। এলিঅটীয় কাব্যসিদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি কিংবা আধুনিক ইংরেজি কাব্যধারার অন্যতম সর্বোৎকৃষ্ট রচনার স্বীকৃতির জন্য নয়, সম্ভবতঃ 'অ্যাশ ওয়েডনেস্‌ডে'-র অপরিচিত খৃষ্টীয় জগৎ ছেড়ে ওয়েস্টল্যাণ্ডীয় পরিচিত সুর ও প্রতীকের জগতে প্রত্যাবর্তনের ফলেই 'ফো র কো য়া র্টে ট স্' বাঙালী কবিদের উল্লসিত করেছিল। সেই সঙ্গে মৌতাত বাড়িয়েছিল খৃষ্টীয় মতবাদ ও বৌদ্ধবিশ্বাসের ধর্মসংকর আদর্শে প্রলয়োত্তর মানব আশ্রয় পেতে পারে এরকম একটা পরম সান্ত্বনা।

'এলিঅটের নূতন কবিতা' নামে 'ক বি তা'-য় (পৌষ ১৩৫০) অমিয় চক্রবর্তী সদ্য প্রকাশিত 'ফো র কো য়া র্টে ট স্'-এর প্রথম রসগ্রাহী সমালোচনা করেন। ঐ সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে-র 'বার্ন্ট্‌ নর্টন'-এর কাব্যানুবাদ (আষাঢ় ১৩৫৫) এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে বেতারে প্রচারিত 'টি. এস. এলিঅট' নামে সুধীন্দ্রনাথের ইংরেজি কথিকার অনুবাদ (পৌষ ১৩৫৫)। নামকরণ 'টি. এস. এলিঅট' হলেও আলোচনা মুখ্যতঃ 'ফো র কো য়া র্টে ট স্'-এর ওপরই আধারিত। 'চ তু র ঙ্গ' (শ্রাবণ ১৩৫৫) প্রকাশিত হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের আলোচনা।

সুধীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ 'বার্ন্ট্‌ নর্টন' অনুবাদ তাঁর মৃত্যুর পর অপ্রকাশিত রচনা হিসেবে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ মূলানুগ হয়েও মূলানুগ নয়। অর্থের খাতিরে তাঁর অনুবাদ যথার্থই মূলানুগ। এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'এবং বারংবার পরিবর্তনের পরেও কোনওটা মূলের ত্রিসীমানাতে পৌঁছতে পারে নি' বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। বিনয়ের অংশটুকু উপেক্ষা করলেই এখানে

১১। এ কা লে র ক বি তা, পৃ. ছয়-সাত ; প্র তি ধ্ব নি, পৃ. ১০-১১

ধরা পড়ে 'মূল' বলতে মূল ভাষার বিশেষ প্রকাশরীতি, তাৎপর্যময় শব্দদ্যোতনা প্রভৃতি একান্ত অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথাই কবি বোঝাতে চেয়েছেন যা ভাষান্তরে কদাচ সঞ্চারিত হয়। সে-বিচারেই কবি বলতে বাধ্য হন, 'আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব।' সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তর্জমাকে মূলের প্রকৃত অর্থানুগ করতে সাহায্য করলেও তাঁর অনুবাদে বাক্যবিন্যাস কিংবা চরণ সংস্থাপন কোনোক্রমেই মূলানুগ নয়। বাংলা ও ইংরেজি বাক্যরীতিতে যথেষ্ট পার্থক্য, তদুপরি মূলের বাক্যবিন্যাস রক্ষায় অনুবাদকের স্বভাব-অনীহা মূলে এবং অনুবাদে ব্যবধান বৃদ্ধি করেছে। অনুবাদকেও মৌলিকের সমপর্যায়ভুক্ত সৃষ্টিকর্মরূপে গ্রহণ করাতেও অনুরূপ ব্যবধান প্রশ্রয় পেয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদে অর্থ ও বক্তব্য মূলানুসারী হয়েও চরণ ও বাক্যবিন্যাস হয়েছে অনুবাদকের স্বকীয় অভিপ্রায়ানুসারী। 'বারনট্ নরটন' অনুবাদ কালে তাঁর অভিপ্রায় নিয়ন্ত্রণে আবার নিম্ন বিষয়গুলির সুস্পষ্ট প্রাধান্য :

ক. অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রতি সনিষ্ঠ আনুগত্য,

খ. তৎসম ও অচলিত শব্দ প্রয়োগে সচেতন প্রবণতা,

গ. শব্দঝঙ্কারের প্রতি সুস্পষ্ট মোহ, এবং

ঘ. অনুপ্রাস শব্দালঙ্কারের প্রতি একান্ত দুর্বলতা।

আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা কবিরা ইংরেজির মুক্তচ্ছন্দ তথা গদ্যচ্ছন্দ বাংলায় প্রবর্তনে সনিষ্ঠ ছিলেন, আর সনিষ্ঠ ছিলেন বহু ব্যবহারে এবং কয়েক শতাব্দীর অনুশীলনে হৃত-মর্যাদা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। সুধীন্দ্রনাথেরও কবিতার মূল ছন্দ অক্ষরবৃত্ত (মৌলিক ও অনুবাদ উভয়তঃ)— আঠারো মাত্রার মহাপয়ার। অনুবাদে মহাপয়ারের প্রতি নিষ্ঠার (আসলে এই নিষ্ঠা ছন্দের প্রতিই) কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন অকপটে :

> ...ইংরেজী বা জার্মান দশ অক্ষরে আঠারো অক্ষরের বাংলা লাইন ভরানো এত শক্ত লেগেছিল যে কেবল পাদপূরণের গরজে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধুরূপ গ্রহণ ও বর্জন, তথা আরও অনেক সুবিধাবাদী প্রকরণ এড়িয়ে যেতে পারি নি ; এবং তৎসত্ত্বেও যেখানে মাত্রাগণনায় কম পড়েছিল, সেখানে অগত্যা যে-পুনরুক্তি বা বিশেষণ বাহুল্যের শরণ নিয়েছিলুম,...[২০]

ফলে তাঁর অনুবাদের সঙ্গে মূলের অভেদাত্মা সম্পর্ক হয়েছে বিঘ্নিত ও শিথিল।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা স্মরণে রাখলে এলিঅট অনুবাদে অনুসৃত

২০। প্রতিধ্বনি, পৃ. ১১

সুধীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট আঙ্গিক কোনো সংশয়ের উদ্রেক করে না, কবির কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও অস্বাভাবিক মনে হয় না 'বারনট্ নরটন'-এর দ্বিতীয় লেখন। বাঙালীর পাঠযোগ্যই নয়, শ্রুতিসুখকর করাও তাঁর লক্ষ্য ঃ

> ··অপরীক্ষিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বুঝেছিলুম যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধি-নিষেধ অকাট্য।···আমাদের কানে ভালো না লাগলে তার বৈচিত্র্য নিতান্তই অসার্থক।[২১]

'বারনট্ নরটন' অসমমাত্রিক চরণের গদ্যকবিতা। সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ গদ্য-কবিতায় নয়, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। 'প্রথম লেখন' অন্ত্যমিলহীন 'বলাকা'র ছন্দে। মুক্তক ছন্দ 'দ্বিতীয় লেখনে' হয়েছে মহাপয়ার, আঠারো মাত্রার নিয়মিত চরণ।

প্র থ ম লে খ ন

বর্তমান কাল আর / ভূত কাল, উভয়ে বুঝিবা /	=৮+১০
বর্তমান ভাবী কালে, / এবং আশ্রিত	=৮+৫
ভাবী কাল ভূত কালে। / যদি হয় নিত্য বর্তমান /	=৮+১০
সর্ব কাল, / তবে সর্ব কালের উদ্ধার /	=৪+১০
অগত্যা অকরণীয়। / ঘটনার পর্য্যায়ে না উঠে /	=৮+১০
যা সতত ঘটনীয় / থেকে গেল, তার /	=৮+৬

দ্বি তী য় লে খ ন

বর্তমান কাল আর / ভূত কাল, উভয়ে বুঝি বা /	=৮+১০
বর্তমান ভাবী কালে ; / এবং আশ্রিত ভাবী কাল /	=৮+১০
ভূত কালে। যদি হয় / নিত্য বর্তমান সর্ব কাল, /	=৮+১০
তবে সর্ব কালের উদ্ধার / আসাধ্য। যা ঘটমান /	=১০+৮
নয়, ঘটেনি রয়েছে শুধু / সদা ঘটনীয়, সে যে /	=১০+৮

সন্দেহ হয়, উৎকর্ষ ঘটাতে কিংবা অধিকতর মূলানুগ করতে 'দ্বিতীয় লেখনে' পরিবর্তন ঘটানো হয় নি ; হয়েছে ছন্দের জন্য, মহাপয়ারের অবয়ব পূর্তির জন্য।

'বারনট্ নরটন'-এর প্রারম্ভের মাত্র আঠারোটি চরণের অনুবাদ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। তার ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর অনুবাদের সার্থকতা-অসার্থকতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তবে এই ক'টি চরণেও তাঁর কাব্যরীতির সুস্পষ্ট পরিচয় বিধৃত। কাব্যবৈশিষ্ট্য, প্রকরণ এবং রচনারীতির বিচারে তাঁর অনুবাদ মৌলিক রচনার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন। অনুবাদ সম্বন্ধে

২১। প্র তি ধ্ব নি, পৃ. ৯

বিশিষ্ট স্বকীয় মতবাদই তাঁর অনুবাদকে মৌলিক রচনার সমগোত্রীয় করতে সাহায্য করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন :

…তাকে (বাংলাভাষাকে) ভাবনার নূতন প্রণালী শেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তার ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ।

সেই সঙ্গে এও উপলব্ধি করেছিলেন :

…বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধিনিষেধ অকাট্য।

'বঙ্গীয় আদর্শের বিধিনিষেধের' বিচার সুধীন্দ্রনাথের মৌলিক-অনুবাদ-নির্বিশেষে প্রকরণ, আঙ্গিক, শব্দনির্বাচন, রচনারীতি সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এই নীতিনির্ভরতার জন্য 'বারনট্ নরটন' অনুবাদের প্রথম লেখনে চরণক্রম বিপর্যস্ত হয়েছিল :

Footfalls echo in the memory
Down the passage which did not take
Towards the door we never opened
Into the rose garden.

স্মরণের যে-দালানে দৃকপাত করিনি
এ পর্যন্ত যে কবাট খুলে
গোলাপ বাগানে যেতে পারিনি, সেখানে
পদপাত তোলে প্রতিধ্বনি,

বিষ্ণু দে-র অনুবাদে কিন্তু এলিঅটীয় অনুক্রম সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন :

পদক্ষেপ ওঠে প্রতিধ্বনিত স্মৃতিতে,
যে দালানে যাইনি আমরা
দুয়ারের দিকে, যে দুয়ার খুলিনি কোনোদিন
গোলাপ বাগানে যেতে, সেই পথে।

দ্বিতীয় লেখনে এই ত্রুটি শোধরাবার চেষ্টা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ :

কার পদপাতে
প্রতিধ্বনিপ্রহত স্মৃতির সে-দালান, যা কখনও
আমাদের আকৃষ্ট করেনি, সে-কবাট, যা পেরিয়ে
গোলাপ বাগান।

এখানে চরণক্রম এবং বাক্যবিন্যাস প্রথম লেখনের মতো স্বাধীন নয়, অনেকাংশে মূলানুগ। বলতে দ্বিধা নেই, এলিঅটে ও সুধীন্দ্রনাথে চরণক্রম বাক্যবিন্যাস প্রভৃতিতে যে-বৈষম্য তা অনুবাদকের মহাপয়ারনিষ্ঠা থেকেই উদ্ভূত। তবে মহাপয়ার প্রবণতা এবং শব্দঝঙ্কারের প্রতি দুর্বলতা নিঃসন্দেহে এলিঅটীয় গদ্য-কবিতাকে অনুবাদে অনেক ক্ষেত্রে করেছে সংহত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। মূলের এই চরণগুলির অনুবাদই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ :

What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.

যা ঘটমান
নয়, ঘটেনি রয়েছে শুধু সদাঘটনীয়, সে যে
চির কল্পলোকে ভাবনার বিমূর্ত বিকার। ছিল
যা সম্ভবপর একদা, এবং নিষ্পন্ন যা আজ
দুই সন্নিবিষ্ট নিত্য বর্তমানে।

এ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিষ্ণু দে-র অনুবাদে অসুলভ। সুধীন্দ্রনাথ এখানেই অনন্য, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

৩. এলিঅট অনুবাদ : বিষ্ণু দে

'এলিঅটের কবিতা'-র তৃতীয় সংস্করণে সংকলিত বিষ্ণু দে-কৃত এলিঅটের অনুবাদ কবিতার সংখ্যা সাতাশ। এই তালিকায় কবির অভিপ্রায়ানুসারে 'অ্যাশ ওয়েড্‌নেশ্‌ডে'-র প্রত্যেকটি অংশ এবং 'কোরিওলান' ও 'ল্যান্ডস্কেপস' পর্যায়ের কবিতাগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র কবিতার মর্যাদা পেয়েছে। 'এল্ডার স্টেটসম্যান্' নাট্যকাব্যের উৎসর্গপত্রের কবিতাটিও এখানে একটি স্বতন্ত্র কবিতা।

অনুবাদের সংখ্যাটি হঠাৎই স্ফীত হয়ে ওঠে নি, অনুবাদকাল দীর্ঘ চার দশকে প্রসারিত। তিরিশের দশকের একেবারে গোড়া থেকেই এলিঅট-অনুবাদ সুরু করেন বিষ্ণু দে। সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম অনুবাদ 'রাজর্ষিদের যাত্রা', অনুবাদ কাল ১৯৩২। সমসাময়িক কালেরই অনুবাদ 'য়ো দোশিজা যো রোঙ্গ', 'ফাঁপা মানুষ', 'জীবকণা' ও 'সিমেঅনের গান'। ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয় 'মারিনা' ও 'চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাওয়া'। ১৯৪৬-এ অনূদিত হয় 'কোরিওলান', ১৯৪৭-এ 'জরায়ণ'। ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় 'নিসর্গ দৃশ্য'-র কবিতাগুলি ও

'বারনট্‌ নরটন্‌'। 'এ লি অ টে র ক বি তা'-র প্রতিটি সংস্করণে কিছু নূতন কবিতা সংযোজিত হয়েছে। ধ'রে নেওয়া যায় দুই সংস্করণের অন্তর্বর্তী বছরগুলিতে এই কবিতাগুলি রচিত হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত 'আফ্রিকায় নিহত ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি কয়ছত্র', 'আলফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগান' ও 'এক বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য কয়ছত্র'; আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত 'হেলেন মাসি' ও 'আমার স্ত্রীকে উৎসর্গপত্র'।' 'হেলেন মাসি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে 'র বী ন্দ্র না থ ও শি ল্প-সা হি ত্যে আ ধু নি ক তা র স ম স্যা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, আলোচনার প্রয়োজন পূর্তিতেই এর আবির্ভাব। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে অনুমিত হয় 'আমার স্ত্রীকে উৎসর্গপত্র'-ই এলিঅটের শেষ অনুবাদ এবং রচনাকালের উল্লেখ না থাকায় অগত্যা ১৯৬৯ সালকেই ('এ লি অ টে র ক বি তা'-র তৃতীয় সংস্করণের) প্রকাশকাল) কবিতাটির প্রকাশকাল বলে ধ'রে নিতে হয়। 'চড়কের গান' পর্যায়ের কবিতাগুলি একই সময়ে রচিত হয় নি, প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর সময় লেগেছে এই পর্যায়ের সব ক'টি কবিতার অনুবাদ সম্পূর্ণ হতে। অনুবাদকালে মূলের ক্রমও লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রথম ও ষষ্ঠ সংখ্যক কবিতা দুটি প্রথমে অনূদিত, তারপর চতুর্থ এবং সর্বশেষে দ্বিতীয় তৃতীয় ও পঞ্চম সংখ্যক কবিতাগুলি অনূদিত হয়।

তিরিশের দশকের একেবারে গোড়া থেকেই বাংলা কাব্যে এলিঅটের সক্রিয় প্রভাব পড়তে সুরু করে। সমসাময়িক কালে বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদ এবং অন্যান্য আধুনিক কবিদের এলিঅট সচেতনতা তারই ফলশ্রুতি।

> **The powerful influence of T. S. Eliot on Bengali writers became manifest in the early thirties. In the pages of the progressive Bengali literary periodicals of the time, Eliot's name was frequently mentioned; …some of his poems were done into Bengali…[২২]**

কল্লোল যুগের কবিদের সংস্কারমুক্ত এবং প্রসারিত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল সমসাময়িক প্রতীচ্যের সংস্কারমুক্ত ও ঐতিহ্যবিরোধী কাব্য ও কবিকৃতি। বাংলা কাব্যকে গণ্ডিমুক্ত করতেই তাঁরা খোঁজ নিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের আধুনিক কাব্যধারার এবং সে-ধারার বৈশিষ্ট্য বাংলা কাব্যে সঞ্চারিত করতে আন্তরিক প্রয়াসী হয়েই তাঁরা সনিষ্ঠ হয়েছিলেন অনুবাদে। অনুবাদকে গ্রহণও করেছিলেন মৌলিক সৃষ্টির সমমর্যাদায়।

২২। 'T. S. Eliot and Bengali poetry' (Dr. Amalendu Bose), *T. S. Eliot*, P. 225.

কবিতার অনুবাদও একটি সপ্রাণ, সংক্রামক, মূল্যবান সাহিত্যকর্ম, এবং কখনো-কখনো—কবি আপন ভাষায় কবি হলে—তা সৃষ্টিকর্মেরও মর্যাদা পায়।···যদি কখনো কোনো কবির মধ্যে রুচি, অবসর ও হার্দ্য অনুকম্পার যোগাযোগ ঘটে যায়, তাহলে তাঁর হাতে যে অনুবাদ বেরোবে, সেটা হবে নির্মাণ নয়, সৃষ্টি; শুধু কোনো বিদেশী কাব্যের সংযোজন, যা থেকে অন্য কবিরা শিখতে পারবেন, এবং হয়তো কারো-কারো রচনার ধারা বদলে যাবে।[২৩]

অনুমিত হয় অনুরূপ মানসিকতাই সুধীন্দ্রনাথকে লরেন্স-ভালেরি-মালার্মে, বুদ্ধদেব বসুকে বোদলেয়ার এবং বিষ্ণু দে-কে এলিঅট অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ইংরেজি কাব্যের ধারাবদলে এলিঅটের দৃষ্টান্তকে প্রায় আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন বিষ্ণু দে প্রমুখেরা। রবীন্দ্রসর্বস্ব পূর্ববর্তী কাব্যধারা থেকে বাংলা কাব্যের মুক্তি ঘটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাঁরা এলিঅট থেকেই উজ্জীবনের সমিধ আহরণ করেছিলেন।

Such is Mr. Eliot's influence in this Waste Land where Krishna admonished Arjuna and where 'a poet's poet consistently and persistently has to try to be a people's poet.' [২৪]

এলিঅট-প্রভাবে কল্লোল যুগের কবিদের সাহিত্যদৃষ্টি ও বোধও হল প্রসারিত, হল গভীরতর:

He widened and at the same time deepened our vision of literature, which is creative work. [২৫]

ফলে বিষ্ণু দে এলিঅট অনুবাদকে অন্যতম কবিব্রতরূপে গ্রহণ করবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি?

বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য মূলের আঙ্গিক, প্রকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি তর্জমায় যথাযথ সঞ্চারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। আঙ্গিক, প্রকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বই এলিঅটের কাব্যকে বিশিষ্টরূপ দিয়েছিল, অনুবাদেও এই বিশিষ্টরূপ অক্ষুন্ন আছে। 'কোরিওলান্' পর্যায়ের প্রথম কবিতাটির শেষাংশের মূল ও অনুবাদের দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

২৩। 'কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', ক বি তা, আষাঢ় ১৩৬২

২৪। 'Mr. Eliot Among the Arjunas, *T. S. Eliot*, p. 102

২৫। Ibid, P. 96.

Light

Light

Et les soldats faisaient la haie ? ILS LA FAISAIENT

আলো

আলো

ফৌজ ক্যা কিতার বন্দ্ রহি হ্যায় ?   বন্দ্ রহি জরুর ।

বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এলিঅট তাঁর কবিতায় বিভিন্ন ভাষা এবং বড় হাতের অক্ষরের যে-প্রকরণ ব্যবহার করেছেন তা অনুবাদেও সঞ্চারিত হয়েছে বঙ্গেতর ভাষা এবং মুদ্রণে ছোট-বড় মাপের হরফ ব্যবহার ক'রে। অনুরূপ প্রকরণের ব্যবহার দেখা যায় 'কোরিওলান' পর্যায়ের দ্বিতীয় কবিতাটি-তেও। বড় হাতের অন্তিম চরণটি অনুবাদে মুদ্রিত হয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে বড় মাপের হরফে। এখানে উল্লেখ্য, 'ক বি তা'-য় প্রকাশকালে এই প্রকরণের রূপান্তর ভিন্নভাবে ঘটানো হয়েছিল, চরণটি একই হরফে ছাপার পর অধোরে-খাঙ্কিত করা হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগের প্রকরণ ব্যবহৃত হয়েছে 'লা ফিগলিয়া শে পিয়াঞ্জে' কবিতায়ও। মূলের শিরোনামে ইতালী এবং শিরোদ্ধারণে (eqigraph) ল্যাটিন ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। অনুবাদে ইতালী স্থলে ফারসী (বা উর্দু) এবং ল্যাটিন স্থলে সংস্কৃত ব্যবহার ক'রে মূলের ব্যঞ্জনাটুকু অক্ষুণ্ন রেখেছেন। হুমায়ুন কবি'র-কৃত অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করলে অনুবাদে প্রকরণ রূপান্তরে বিষ্ণু দে-র দক্ষতা আরো বেশি চোখে পড়ে। হুমায়ুন কবির প্রকরণের এই বিশেষ দিকগুলি অনুবাদে পরিহার করেছেন, কবিতারই একটি চরণ নামকরণে ব্যবহার করেছেন। 'জেরনশান' কবিতার শিরোদ্ধারণে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাব্যভাষা বিষ্ণু দে-র অনুবাদেও প্রাচীনতর বাংলা কাব্যভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ থেকে তাঁর প্রকরণ-সচেতনতাই প্রমাণিত। অবশ্য পরবর্তীকালের অনুবাদে ভাষা সংক্রান্ত প্রকরণের এই রীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হয় নি। 'মারিণা' কিংবা 'বারনট্ নরটন্'-এর গ্রীক শিরোদ্ধারণ কিংবা 'প্রুফ্রকের' ইতালী বাংলাতেই অনূদিত, কেবল ভাষারূপটা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর।

বিষ্ণু দে-র বিভিন্ন যুগের এলিঅট অনুবাদের আংশিক নমুনা দিচ্ছি মূলের পাশাপাশি।

'জার্নি অব দি মেজাই' (অনুবাদ কাল ১৯৩২) ঃ

All this was a long time ago, I remember,
And I would do it again, but set down
This set down
This : were we led all that way for
Birth or Death ? There was a Birth certainly,

এ সব ঘটেছে বহুকাল আগে, মনে পড়ে
আবার ঘটুক এই চাই—কিন্তু লেখো
এই লিখে রাখো
এই ঃ এতখানি পথ চালিত হলুম আমরা যে
সে কি জন্ম না মরণের তীর্থে ? জন্ম হয়েছিল এক, নিশ্চিত তা,

'জেরনশান' (অনুবাদ ১৯৪৭) ঃ

The tiger springs in the new year, Us he devours.
Think at last
We have not reached conclusion, when I
Stiffen in a rented house. Think at last
I have not made this show purposelessly
And it is not by any concitation
Of the backward devils.

সিংহ আসে নবযুগে। আমরা আহার তার। ভাবো একবার
আমরা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিই নি, আর আমি
দড়া হই ভাড়াটিয়া ঘরে। ভাবো একবার
আমি তো দেখাই নি এ খেল্‌ বিনা-অভিপ্রায়ে
দেখাই নি কোনো পিছু-হাঁটা
শয়তানের দলের শমনে।

'এ ডেডিকেশন টু মাই ওয়াইফ' (অনুবাদ ১৯৬৯) ঃ

To whom I owe the leaping delight
That quickens my senses in our wakingtime
And the rhythm the governs the repose of our sleeping-time
The breathing in unison.

যার দানে পেয়েছি এ উৎপ্লবী পুলক
যা আমার চৈতন্যকে প্রাণক্ষিপ্র করে আমাদের জাগরপ্রহরে
এবং যে-ছন্দে নিয়ন্ত্রণ পায় আমাদের নিদ্রাকালের বিশ্রাম
এক সুরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

দেখা যাচ্ছে, এলিঅটের বক্তব্য ও চরণক্রম অবিকৃত রাখতে বিষ্ণু দে বদ্ধপরিকর। মূলের একটি চরণকে অনুবাদেও একটির মধ্যে সংহত ক'রে রাখতেও তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি। ফলে তাঁর অনুবাদে হয়েছেঃ ১. চরণ এলিঅট সদৃশ ২. চিত্রকল্প সংহত ও প্রকৃত ইঙ্গিতধর্মী, এবং ৩. ছন্দ যথার্থই vers libre-এর অনুগামী।

'কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে[২৬] বুদ্ধদেব বসু অনুবাদের উচ্চতম লক্ষ্য নির্দেশ করতে গিয়ে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছিলেনঃ

১. মূলের ভাব, বক্তব্য বা সংবাদের পরিবেশন,
২. চিত্রকল্প, ভাষার ভঙ্গি, ছন্দ, মিল ও স্তবকের বিন্যাস, অর্থাৎ সমগ্র রূপকল্পের অনুসরণ,
৩. মূল কবির দেশ ও কালের স্বাদসঞ্চার, এবং
৪. অনুবাদের ভাষায় একটি সুন্দর, অন্ততঃ সুখপাঠ্য, নতুন কবিতার রচনা। অনুবাদের ভাষায় রচনাটি ভালো হবে, পাঠযোগ্য হবে—এই দাবিটাই সবচেয়ে জরুরী।

এই নিরিখে অনুবাদের উচ্চতম লক্ষ্য বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদে অক্ষুণ্ন আছে কি না তা পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

প্রথমে ধরা যাক, দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্থাৎ মূলের রূপকল্প অনুসরণের দিকটি। রূপকল্প বলতে এখানে বুদ্ধদেব বসু মুখ্যত: চিত্রকল্প, ভাষার ভঙ্গি, ছন্দ, মিল ও স্তবকের বিন্যাসের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এদের মোটামুটি ভাবে চিত্রকল্প, ভাষাভঙ্গি ও ছন্দ (মিল ও স্তবকবিন্যাস ব্যাপকভাবে ছন্দেরই অঙ্গীভূত) এই তিনটি পর্যায়ে গ্রহণ করা চলে। প্রকরণ ও আঙ্গিক বিষয়ক এলিঅটের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই সমসাময়িক কাব্য-সংস্কারকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, তাঁর কবিতাকেও দিয়েছিল একটা বিশিষ্টরূপ। সে-কারণে এই দিকটাই প্রথমে আলোচনা করছি।

২৬। ক বি তা, আষাঢ় ১৩৬২

অনুবাদকালে এলিঅটের মূলের চিত্রকল্প সর্বত্র স্ব-রূপে গ্রহণ করেন নি বিষ্ণু দে। অনূদিত কবিতাসমূহে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলিকে নিম্নরূপে শ্রেণী-বিন্যস্ত করা যায়ঃ

১. অবিকৃত বা মূলানুগ অর্থাৎ এলিঅটীয় চিত্রকল্প অপরিবর্তিত,
২. পরিবর্তিত অর্থাৎ এলিঅটীয় চিত্রকল্প বঙ্গীয় পরিবেশে বেমানান ব'লে তৎস্থলে পরিচিত অনুরূপ বঙ্গীয় চিত্রকল্প,
৩. বিলুপ্ত, স্ব-রূপে কিংবা পরিবর্তিত রূপে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় মূলের চিত্রকল্প অবলুপ্ত, এবং
৪. অ-মূলক বা ভুয়া চিত্রকল্প অর্থাৎ মূলের নয়, অনুবাদকের সৃষ্ট।

অ বি কৃ ত বা মূ লা নু গ চি ত্র ক ল্প ঃ মূলের ব্যঞ্জনা অনুবাদে যথাযথ সঞ্চার করতে মূলানুগ অবিকৃত চিত্রকল্প অপরিহার্য, বিশেষতঃ যেখানে চিত্রকল্পই কবিতার প্রাণভোমরা। চিত্রকল্পবাদী কবির নূতন আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রকল্প অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষ্ণু দে অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর এবং তিনি সে প্রয়াসে সফলকামও।

The yellow fog that rubs its back upon the window-panes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes
Licked its tongue into the corners of the evening, (Prufrock)

হলদে কুয়াশা তার পিঠ ঘষে শার্শিজানলায়,
হলদে ধোঁয়াটা তার নাক ঘষে শার্শিজানলায়
জিভ দিয়ে সন্ধ্যাটাকে চাটে খাঁজে খাঁজে,

That lift and drop a question on your plate (Prufrock)

যে হাত প্রশ্নটি তুলে ফেলে দেয় থালায় তোমার

I saw across the blackened river
The camp fire shake with alien spears.
Here, across death's other river
The Tartar horsemen shake their spears.
(The wind sprang up...)

দেখেছি সে কালো নদীর অপর পারে
ছাউনি আগুন নাচায় বর্শা কত
হেথা মরণের অপর নদীর পারে
তাতার সওয়ার নাচায় বর্শা যত।

The winter sun creeps by the snow hills ;

(A Song for Simeon)

শীতের সূর্য চুপি চুপি লতিয়ে উঠছে তুষার পর্বতে।

পরিবর্তিত চিত্রকল্প : যে-সমস্ত চিত্রকল্পের আবেদন দেশকাল সম্প্রদায় সাপেক্ষ, বিশেষতঃ যে-সমস্ত প্রসঙ্গ একান্তই পাশ্চাত্যের কিংবা একান্তই খৃষ্টধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পৃক্ত, বঙ্গীয় পরিবেশে আবেদনহীন সেই সমস্ত চিত্রকল্প স্বাভাবিক কারণেই পরিবর্তিত হয়ে অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

After the skirts that trail along the floor (Prufrock)

আভূমি চুম্বিত নিচোলের পর

Going in white and blue, in Mary's colour,

(Ash-wednesday)

কে ও যায় শুভ্রে নীলে শ্রীরাধার নীলাম্বরে ;

And the jew squats on the window sill, the owner,
Spawned in some estaminet of Antwerp,
Blistered in Brussels, patched and peeled in London.

(Gerontion)

ওদিকে মালিক ব'সে জানলার কিনারে ঐ মারবারী,
জন্ম তার বনারসে কোন্ ঘাটের কাদায়,
কানপুরে তেতেছে সে, মেতেছে সে কলকাতায়।

In the juvescence of the year
Came Christ the tiger (Gerontion)

স্বাধীন পরবে নবযুগের উদ্‌গমে
এল কৃষ্ণ নরসিংহ
পাঞ্চজন্যে কেশরী হুঙ্কারে, বংশীরবে

বিলুপ্ত চিত্রকল্প : ধর্ম বা সংস্কৃতির একান্তই বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা

প্রসঙ্গভিত্তিক চিত্রকল্প যার. অনুবাদ বা রূপান্তর সম্ভব নয়, সে-সমস্ত চিত্রকল্প অনুবাদকের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও তর্জমায় বিলুপ্ত।

Eager to be reassured, taking pleasure
In the fragrant brilliance of the Christmas tree, (Animula)

আগ্রহে আশ্বাস চায়, পুজার দালানে সুরভিত
সমারোহে খুঁজে পায় সোজাসুজি আনন্দের স্বাদ,

Living first in the silence after the viaticum. (Animula)

প্রথম সে বাঁচে বুঝি অন্তিমের শেষ স্তব্ধতায়।

Pray for Guiterriez, avid of speed and power,
For Boudin, blown to pieces,…
Pray for Floret, by the boarhound slain between
the yew trees, (Animula)

প্রার্থনা জানাও বেগ-শক্তিমত্ত গীতিরিয়ের তরে
শতধারে চূর্ণ চূর্ণ বুদ্যাঁরও প্রার্থনা…
ধুতুরার ছায়াতলে বরাহকুকুরাহত ফ্লরের প্রার্থনা ··

অ-মূলক বা ভুয়া চিত্রকল্প: মূলে যে-চিত্রকল্পের অস্তিত্ব ছিল না (সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে) এবং যা তর্জমায় অনুবাদকের স্বকপোল-কল্পিত, কোথাও বা মূল কবিতাটির ভারতীয় প্রতীক কল্পনাপ্রসূত।

When the evening is spread out against the sky (Prufrock)

হাতপা-ছড়ানো সন্ধ্যা আকাশের গায়ে

I have heard the mermaids singing, each to each. (Prufrock)

আমি যে শুনেছি জলকিন্নরীরা গান করে আখরে-উতোরে।

'অ্যাশ ওয়েড্‌নেশ্‌ডে'-র অনুবাদে বিভিন্ন অধ্যায়ে মহাভারতীয় প্রতীক গ্রহণ করায় অনেকগুলি অ-মূলক চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে:

Desiring this man's gift and that man's scope…
(Why should the aged eagle stretch its wings ?)

এর ইন্দ্রপ্রস্থ চেয়ে, চেয়ে ওর পাশা
(বৃদ্ধ জটায়ুর পাখা আর কেন উড়বে অবাধ ?)

And after this our exile

এর পরে আমাদের দ্বারকায় নির্বাসন-পালা।

চিত্রকল্পের এই বিশ্লেষণ থেকে এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয় যে এলিঅটীয় চিত্রকল্পকে সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে অক্ষুণ্ণ রাখতে আগ্রহী বিষ্ণু দে। যেখানে মূলের চিত্রকল্প রূপান্তরিত, কিংবা পরিত্যক্ত কিংবা নূতন চিত্রকল্প পরিকল্পিত সেখানেও মূলের ব্যঞ্জনা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্য সুপ্রকট।

এলিঅটের কবিতার অনেকখানি তাঁর ভাষাভঙ্গি, যা তাঁর কবিতাকে ঐতিহ্য-বিরোধীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। তাঁর আবেগমুক্ত প্রাঞ্জল এবং সংহত ভাষাভঙ্গির আলম্বন কতকগুলি বিশেষ প্রকরণ : ১. পূর্বসূরীর রচনাংশ ব্যবহার, ২. একই কবিতায় বিভিন্ন ভাষার সহাবস্থান, এবং ৩. পরিবেশ ও বিষয়ানুগ প্রতীকাত্মক বা ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা ব্যবহার। এই সমস্ত প্রকরণের রূপান্তর সহজসাধ্য কবিকৃতি না হলেও বিষ্ণু দে তাঁর তর্জমায় এই প্রকরণসমূহ সঞ্চার ক'রে যথেষ্ট কবি-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এলিঅটের পূর্বসূরীর চরণ ব্যবহার প্রকরণ অনুবাদে সঞ্চার করেছেন পূর্বসূরী বাঙালী কবির চরণ ব্যবহার ক'রে। মূলের ফরাসী, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার চরণের পরিবর্তে অনুবাদে ফারসী (বা উর্দু), সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'কোরিওলান' (১ম), 'লা ফিগ্‌লিয়া শে পিয়াঞ্জে' কবিতার মূলে ও অনুবাদে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারের আলোচনা পূর্বেই করেছি। এখানে 'অ্যাশ ওয়েড্‌নেশডে' (৪) থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

Made cool the day rock and made firm the sand
In blue of larkspur, blue of Mary's colour,
Sovegna vos

শীতল কে করে ঐ দগ্ধগিরি, কালিন্দীর বালুতীর কে করে সংহত
অপরাজিতার নীলে যেই নীল রাধার অম্বরে
শুন বড়ু কহে স্মরিও আম্মাহে

প্রতীকাত্মক বা ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতা-পংক্তি রূপান্তরেও বিষ্ণু দে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। 'দি হলো মেন' কবিতার পঞ্চম অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত ছড়ার অর্থ-হীনত্ব তর্জমায় ফোটাতে তিনি বাংলা ছড়া প্রয়োগ করেছেন :

Here we go round the prickly pear
Prickly pear prickly pear
Here we round the prickly pear
At five o'clock in the morning.

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি
কাঁকড়ার দল চলে
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি
মাকড়সা দেয়ালে
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চিম্‌সে পাখা
চামচিকেরা মেলে
শ্যাওড়া-কাঁটায় ভোর চারটেয়
ছেলেরা সব খেলে।

ভাষা-প্রকৃতিতে মিল না থাকলে এক ভাষার ছন্দের অনুসরণ অন্য ভাষায় সম্ভব নয়, কারণ ছন্দ ভাষা-প্রকৃতিরই ওপর নির্ভরশীল। ভাষা-প্রকৃতির কারণেই বাংলায় ছন্দ অক্ষরভিত্তিক, ইংরেজিতে 'অ্যাকসেণ্ট'-ভিত্তিক। তবে এলিঅট তাঁর কবিতায় যে-ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা তেমন দৃঢ়বন্ধ নয়, তাই বিষ্ণু দে-র অনুবাদে তা অনুসরণ করা খুব একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি। এলিঅটের vers libre সহজেই বিষ্ণু দে-র মুক্তছন্দ বা গদ্যছন্দে ধরা পড়েছে। তবে এলিঅটের অনেক কবিতাতেই ছন্দের একটা শিথিল বন্ধন অনুভূত হয়, বিষ্ণু দে-ও অনুবাদে ঐ সমস্ত কবিতায় অক্ষরবৃত্তের একটা ক্ষীণ আভাস জিইয়ে রেখেছেন। তদুপরি 'প্রুফ্রক', 'লা ফিগ্‌লিয়া শে পিয়াঞ্জে', 'অ্যাশ-ওয়েড্‌নেশ্‌ডে', 'ল্যাণ্ডস্কেপস্‌' প্রভৃতি কবিতার অন্ত্যমিল রীতিও তিনি অনুবাদে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। মূল ও অনুবাদের গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত তুলে দিলাম :

In the room the women come and go
Talking of Miche'angelo

And indeed there will be time

To wonder, 'Do I dare ?' and, 'Do I dare ?'
Time to turn back and descend the stair,
With a bald spot in the middle of my hair—
[They will say : 'How his hair is growing thin !']
My morning coat, my collar mounting firmly to the chin,
(Prufrock)

ঘরে যত মহিলারা ঘোরে ফেরে চলে
মিকেলাঞ্জেলোর কথা মুখে মুখে বলে।

সত্যি তখন হবে প্রকৃত সময়
'সাহস করব তবে ?' আর 'সাহস করব ?'—এই প্রশ্ন বারবার।
তখন সময় হবে পিছু ফেরবার আর সিঁড়ি নামবার,
সিঁথের চুলের মধ্যে এক ফোঁটা টাকে জেরবার—
(বলবে সবাই ওরা, 'কি পাতলা হয়েছে আহা চুল বেচারির !')
আমার প্রভাতী কোর্তা, গলার কলার চিবুক অবধি খাড়া স্থির,

Stand on the highest pavement of the stair
Lean on a garden urn—
Weave, weave the sunlight in your hair—
Clasp your flowers to you with a pained surprise—
Fling them to the ground and turn
With a fugitive resentment in your eyes ;
But weave, weave the sunlight in your hair. (La Figlia···)

দাঁড়াও সিঁড়ির সব উঁচু পইঠায়
কুসুম বেদীর গায়ে হেলান দাও—
সূর্যালোক বোনো বোনো তোমার চুলের ছায়ায়—
ফুলগুলি তোমার জাপটে ধরো করুণ বিস্ময়ে—
ছুঁড়ে দাও মাটিতে আর ফিরে তাকাও
উড়ন্ত বিরাগ এক তোমার চোখের আশ্রয়ে :
তবু বোনো সূর্যালোক বোনো তোমার চুলের ছায়ায়।

Those who sharpen the tooth of the dog, meaning
Death

Those who glitter with the glory of the hummingbird, meaning
Death
Those who sit in the sty of contentment, meaning
Death
Those who suffer the ecstasy of the animals, meaning
(Marina)
Death

যারা বসে শান দেয় কুকুরের দাঁতে, অর্থাৎ
মরণ
যারা শোভা পায় মুনিয়া পাখির রংবাহারে, অর্থাৎ
মরণ
যারা সব বাসা বাঁধে তুষ্টির খোঁয়াড়ে, অর্থাৎ
মরণ
যারা কাঁপে পশুভোগ্য পুলকের ভারে, অর্থাৎ
মরণ

মূলের দেশ ও কালের স্বাদ-সঞ্চার বিষয়ে এলিঅট অনুবাদ কালে বিষ্ণু দে উভয় কূল রক্ষা ক'রে চলেছেন। 'প্রুফ্রক', 'অণ্ট হেলেন', 'লা ফিগলিয়া শে পিয়াঞ্জে', 'জার্নি অব দি মেজাই', 'এ সঙ ফর সিমেঅন', 'দি উইন্ড স্প্রাং আপ অ্যাট ফোর ও'ক্লক', 'লাইনস্ ফর অ্যান ওল্ড ম্যান,' 'টু দি ইণ্ডিয়ানস হু ডায়েড ইন আফ্রিকা, 'এ ডেডিকেশন টু মাই ওয়াইফ্' প্রভৃতি কবিতার অনুবাদে মূলের দেশ ও কালের স্বাদ-সঞ্চারে সফল হয়েছেন বিষ্ণু দে। আবার 'জেরনশান', 'দি হলো মেন', 'অ্যাশ-ওয়েডনেশ্ডে', 'অ্যানিমুলা', 'মারিনা', 'কোরিওলান', 'ল্যাণ্ডস্কেপস', 'বার্নট্ নর্টন' প্রভৃতির অনুবাদে ইচ্ছাকৃতভাবেই মূলের দেশ-কালের স্বাদ পরিহার ক'রে বঙ্গীয় তথা ভারতীয় দেশ-কালের স্বাদ-সঞ্চার করা হয়েছে। স্থান, পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষ, রীতি-নীতি প্রভৃতিই দেশ-কালের স্বাদ-সঞ্চারের মুখ্য উপাদান। মূলের দেশ-কাল অক্ষুণ্ণ আছে এরকম অনুবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'জার্নি অব দি মেজাই' ঃ

And the camels galled, sore-footed, refractory,
Lying down in the melting snow.
There were times we regretted

The summer palaces on slopes, the terraces,
And the silken girls bringing sherbet.
Then the camel men cursing and grumbling
And running away, and wanting their liquor and women,
And the night-fires going out, and the lack of shelters,
And the cities hostile and the towns unfriendly
And the villages dirty and charging high prices :
A hard time we had of it.

আর উটগুলি উত্যক্ত, খুরে ঘা, তেরছা মেজাজ
থেকে থেকে শুয়ে পড়ে গলন্ত বরফে।
মাঝে-মাঝে আমাদেরও আফশোষ হয়েছে
কোথায় গড়ানে সেই গ্রীষ্মাবাস, সেই হাওয়াখানা,
রেশমী মেয়েরা বয় সরবৎ পেয়ালা।
তারপরে উটের লোকেরা দিব্যি পাড়ে গজগজ করে,
পালায়, চাহিদা তোলে মদ আর স্ত্রীলোকের,
আর নিভে যায় রাতের আগুন, আর আস্তানা জোটে না,
শহর বিরুদ্ধ সব আর সদর বেগানা,
গ্রামগুলি নোংরা, হাঁকে গলা কাটা দাম ঃ
দুঃসময় গেল আমাদের।

দেশ-কালের স্বাদ অক্ষুণ্ণ রাখতে মূলের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পর্ব-পার্বণ, ফুল-পাখি, পুরাণ প্রসঙ্গবাচক নামপদ অবিকৃত রাখতে হয়েছে অনুবাদেও।

ফুলনাম ঃ

In the lost lilac and the lost sea voices (Ash-Wednesday)

লুপ্ত লাইলাক আর লুপ্ত সমুদ্রের কণ্ঠস্বরে

Lord, the Roman hyacinths are blooming in bowls···

(A Song for Simeon)

প্রভু! আজ রোমান হায়াসিন্‌থ্‌ টবে ফুটছে-·

দেশনাম ঃ

Grant Israel's consolation (A song for simeon)

দিয়ে যাক ইসরেয়লের আশ্বাস

ঐতিহাসিক নাম ঃ

No ! I am not Prince Hamlet,…(Prufrock)

না ! আমি নইকো রাজকুমার হ্যামলেট,

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo (Prufrock)

ঘরে যত মহিলারা ঘোরে ফেরে চলে
মিকেলাঞ্জেলোর কথা মুখে মুখে বলে।

ধর্মীয় নাম :

To say: 'I am Lazarus, come from the dead, (Prufrock)

ধরো যেন বলা ঃ 'আমি লাজারস, মৃত্যু থেকে উঠি মৃত্যুঞ্জয়,

যে-সমস্ত কবিতায় মূলের দেশ-কালের স্বাদ পরিহার ক'রে বঙ্গীয় (বা ভারতীয়) দেশ-কালের স্বাদ-সঞ্চার করেছেন, সেখানে ফুল-ফল, গাছ-গাছালি, পশু-পক্ষী প্রভৃতিবাচক মূলের নামপদও অনুবাদে রূপান্তরিত হয়েছে ঃ

ফুলনাম ঃ

And beyond the hawthorn blossom and a pasture scene
(Ash-Wednesday)

এবং মেহেদীর ফুলঝাড় আর গোচর দৃশ্যের শেষে

Lilac and brown hair (Ash-Wednesday)

অতসী ও পাটফুল উড়ন্ত হাওয়ায়

Who walked between the violet and the violet
(Ash-Wednesday)

কার আনাগোনা ঐ অতসী ও অতসীর মাঝে

ফলনাম ঃ

Of drouth, spitting from the mouth the withered appleseed
(Ash-Wednesday)

অনাবৃষ্টি দগ্ধ মুখ থেকে ফেলে ফেলে জগ্ধ জম্বুবীজ।

Swing up into the apple-tree. (Landscapes)

দুলে দুলে উঠে যাও জামরুলের ডালে।

বৃক্ষনাম ঃ

Between the yews, behind the garden god,
(Ash-Wednesday)

ধুতুরা সারির মাঝে, কুঞ্জদেবতার আড়ে

Lady, three white leopards sat under a juniper-tree
(Ash-Wednesday)

হে ভদ্রা, জয়িন্ত্রী গাছতলায় তিনটি শ্বেত চিতা

And scent of pine and the woodthrush singing through the
fog (Marina ;

আর বেতসের গন্ধ আর বনদোয়েলের গান কুয়াশাকে চিরে

পক্ষীনাম ঃ

O quick quick quick, quick here the song-sparrow,
Swamp-sparow. fox-sparow, vesper-sparow···
Of the goldfinch at noon. Leave to chance
The Black burnian warbler, the shy one. Hail
With shrill whistle the note of the quil, the bob-white
Dodging by boy-bush. (Landscapes)

আহা ! চট্‌পট্‌ চট্‌পট্‌ শোনো ঐ গানচড়াই
বিলচড়াই, মাঠচড়াই, সাঁঝের আকাশে তালচড়াই···
ভর্‌-দুপুর হরিয়ালের। ছেড়ে দাও খামকা খুশিতে
পাপিয়াকে, বাছা বড়ো লাজুক। ডেকে আনো ঘরে
দোয়েলের স্বরে ধারালো শিসে কাদাখোঁচাকে
খাগড়া-ঝোপে যে এড়িয়ে বেড়ায়।

'কোরিওলান', 'জেরনশান,' 'বার্নট্‌ নর্টন' প্রভৃতি কবিতার অনুবাদে বঙ্গীয় পরিবেশ, প্রতীক ও পটভূমি পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'কোরিওলান'-এর একটি প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি যার আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যবস্তু, ব্যক্তিনাম প্রভৃতির অনুবাদে বিষ্ণু দে সোজাসুজি বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার না ক'রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কেবল ব্যঞ্জনাদ্যোতক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

That is all we could see. But how many eagles ! and how
many trumpets !

(And Easter Day, we did not get to the country,
So we took young cyril to church. And they rang a bell
And he said right out loud, crumpets.)
Don't throw away that sausage,
It will come in handy.

ঐ যা দেখেছি আমরা। কিন্তু কত কপিধ্বজ! তূর্যনাদ খাসা।
(মহাষ্টমীর দিন, আমরা সেবার বাইরে যাইনি আর,
তাই তো গেলুম সব ছোক্‌রা শিবুকে নিয়ে বারোয়ারি-তলা।
বাজল কাঁসর ঘণ্টা
এবং সরবে শিবু ব'লে উঠল, বাতাসা।) ফুলুরিটা ফেলো না হে,
কাজে লেগে যাবে।

একথা অনস্বীকার্য যে 'ঈগল', 'ট্রাম্‌পেট্‌', 'ঈস্টার ডে', 'ইয়ং সিরিল', 'চার্চ', 'ক্রাম্‌পেট্‌', 'সসেজ'-এর যথাক্রমে 'কপিধ্বজ', 'তূর্যনাদ', 'মহাষ্টমী', 'ছোকরা শিবু', 'বারোয়ারিতলা', 'বাতাসা', 'ফুলুরি' প্রকৃত প্রতিশব্দ নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে ঐ সমস্ত বাংলা শব্দে মূল কবিতার ব্যঞ্জনা যথাযথ ধরা পড়েছে।

'জেরনশান' কবিতার অনুবাদে মূলের প্রতীকটিরই ভারতীয়করণ করা হয়েছে, -- এমনকি নামকরণেও। ফলে মূলের ব্যঞ্জনা ও দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ থাকলেও দেশ-কালের স্বাদবাহী শব্দগুলির যে-সমস্ত বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মূলানুগ বলা চলে না।

In depraved May, dogwood and chestnut, flowering judas,
To be eaten, to be devided, to be drunk
Among whispers , by Mr. Silvero
With caressing hands, at Limoges
Who walked all night in the next room ;
By Hakagawa, bowing among the Titians ;
By Madame de Tornquist, in the dark room
Shifting the candles , Frailein von kulp
Who turned in the hall, one hand on the door. Vacant shuttles
Weave the wind.

পচা ভাদ্রে, কচু শাক, কালোজাম, মোহিনী ধুতুরা
চর্ব, চোষ্য, বিভাজ্য ও পেয়
গোপন ফিসফাসে, তাই জোটে হাতিলাল মেহতা
কোমল পেলব হাতে, আহমেদাবাদে যেবা
পায়চারি করেছিল সারারাত পাশের কামরায় ;
জোটে তাই কালাচাঁদ প্রাণোলিয়া বেলোয়ারি ঝাড়ের তলায় :
মুখুয্যে গৃহিণী জোটে অন্ধকার ঘরে
বাতি নাড়ে আগে পবে পরে আর আগে ; জোটে
মিস্টার তরফদার বেলেঘাটা হলের চৌকাঠে : একহাত দ্বারে
শূন্য চরকাগুলি
হাওয়া বোনে পাকে পাকে শূন্য হাওয়ায়।

মূলের কাল 'ডিপ্রেভ্‌ড্ মে' হলেও অনুবাদ 'জরায়ণে' তা অবশ্যই বর্ষা ঘেঁষা। 'পচা ভাদ্র', ছবিটা স্পষ্টতঃ 'ভিজে ভাদুরে বাদলে'-র। ভাবানুষঙ্গের (asso-ciation of ideas) পথ বেয়েই এসেছে ভাদ্রের অনুষঙ্গ 'কচু শাক', 'কালোজাম' 'মোহিনী ধুতুরা' প্রভৃতি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মূলের দেশ-কালের স্বাদ অনুবাদে এই ধরনের পরিবর্তনের যৌক্তিকতা কতখানি। দেশ-কালের সঙ্গে কবিতার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। এবা কবিতার রসোপলব্ধির গভীরতাও বাড়িয়ে দেয়। কবিতার অনুবাদ অসম্ভব বলে মনে করেন অনেকে,[১৯] সে-অসম্ভব যদিও-বা সম্ভব হয় দেশ-কালের স্বাদ ভাষান্তরে সঞ্চার কিন্তু প্রকৃতই দুঃসাধ্য। এক দেশের রীতি-নীতি, প্রকৃতি, ধর্মীয় তথা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ প্রভৃতি অনেক সময় দেশান্তরে অপরিচিত তাই আবেদনহীনও। আক্ষরিক অনুবাদ প্রামাণিক হয় যতই, ততই তা ব্যর্থ হয় রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে। দেশ-কালের উপযোগী অনুবাদকেই অনেকে চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। এই প্রক্রিয়ায় অনূদিত কবিতা বোধগম্য হয়, রসাস্বাদনও সহজতর হয়। আবার বিপরীত মতাবলম্বীরা মূলের রূপ, রীতি ও কাব্যধারার সঙ্গে দেশ-কালের স্বাদ ও অনুবাদে যথাযথ সঞ্চারের পক্ষপাতী। কোন্ মতবাদের পশ্চাতে যুক্তির সারবত্তা কতখানি সে-আলোচনা এখানে অবান্তর। এখানে শুধু বিবেচ্য প্রতীক কবিতার ক্ষেত্রে কোন্ মতবাদটি প্রযোজ্য। আধুনিক কালে প্রতীক কবিতার প্রতীকগুলি পরিচিত জগৎ থেকে গ্রহণ করা হলেও এবং দেশ-কালের

১৯। প্রতিধ্বনির ভূমিকা

সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত ভাব বা বক্তব্যটি দেশ-কাল-নিরপেক্ষ। তাই এই ধরনের কবিতা সহজেই মূলের প্রতীক ছেড়ে ভাষান্তরে পরিচিত প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এই সমস্ত নূতন প্রতীক মূলের দেশ ও কাল আঁকড়ে থাকবে এমন আশা করাই বাতুলতা।

মূলের অপরিচিত প্রতীকের পরিবর্তে এলিঅটের অনেকগুলি কবিতার অনুবাদে বিষ্ণু দে নির্দ্বিধায় বঙ্গীয় দেশ-কালের পরিচিত প্রতীক ব্যবহার করেছেন। 'বার্নট নর্টন' কবিতার তৃতীয় অধ্যায়ে লণ্ডন ও শহরতলীর অপরিচিত নামের পরিবর্তে কলকাতা ও শহরতলীর নাম ব্যবহার ক'রে যেভাবে পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তা কৌতূহলোদ্দীপক ঃ

Eructation of unhealthy souls
Into the faded air, the torpid
Driven on the wind that sweeps the gloomy hills of London
Hampstead and clerkenwell, camnden and Putney,
Highgate, primrose and Ludgate. Not here
Not here the darkness, in this twillering world.

কলকাতার নিরানন্দ খালে বিলে সেঁচা
বিলীন হাওয়ায় যত অসুস্থ আত্মার
আকণ্ঠ উদ্গার, যত ভাবাক্রান্ত জড়
জড়ো হয় বাতাসের লগির ঠেলায়
বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বেহালা, মানিকতলা,
কাশীপুর, বরানগরের জোলো অন্ধকারে। এখানে সে নয়
নয় সে এখানে এই অন্ধকার কিচিমিচি এ জগতে নয়।

প্রসঙ্গক্রমে অনুবাদে দেশ ও কালের স্বাদ সঞ্চার সম্পর্কে কবি ও অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তে বোধহয় অনেকে সায় দেবেন যে যীশুর জীবনী লিখতে এখন যেমন অনূদিত বাইবেলের আক্ষরিক রীতি অনাবশ্যক, তেমনই অনাবশ্যক ক্রীসমাসের পরিবর্তে জন্মাষ্টমীর ব্যবহার ; এবং তার পরে এমন একটা সাধারণ নিয়ম হয়তো গ্রাহ্য যে ভাবচ্ছবির তারতম্যেও অভিপ্রায় যেখানে বদলায় না, সেখানেই পরিচিত, বা সার্বভৌম, প্রতীক প্রযোজ্য, অন্যত্র নয়।

লক্ষ্যণীয়, উপর্যুক্ত দুটি মতবাদের কোনোটিই পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি সুধীন্দ্রনাথ, আবার কোনোটাই পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন নি।

সুধীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য প্রকৃতই বিশেষ কোনো অনুবাদের প্রতি কটাক্ষ কিনা সে-উল্লেখ এই রচনায় না থাকলেও অনুমিত হয় এই মন্তব্যের লক্ষ্য বিষ্ণু দে-র অনুবাদ 'জরায়ণ' হওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। অনুবাদে 'জন্মাষ্টমীর' প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় এবং তা 'ক্রীস্‌মাস'-এর প্রতিশব্দরূপে না হলেও স্পষ্টতঃই ঐ অর্থে।

Signs are taken for wonders, 'We should see a sign !'
.. .. In the juvescene of the year
came christ the tiger

আবির্ভাব শেষটা দাঁড়ায় আশ্চর্য ঘটনা।
আমরা সবাই চাই আবির্ভাব
দর্শন, দর্শন, জন্মাষ্টমী !...
. .. . স্বাধীন পরবে নবযুগের উদ্‌গমে
এল কৃষ্ণ নরসিংহ

বিজাতীয় এবং অপরিচিত চিত্রকল্পের পরিবর্তে জাতীয় ও পরিচিত চিত্রকল্পের ব্যবহার বিষ্ণু দে তাঁর অনুবাদে ইতস্ততঃ করেছেন, তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। 'জেরনশান' এবং 'কোরিওলান' কবিতা দুটির বিজাতীয় ও অপরিচিত প্রতীক তিনি সামগ্রিক ভাবেই পরিহার ক'রে অনুবাদে সম্পূর্ণ পরিচিত ঘটনার প্রতীক গ্রহণ করেছেন।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। দাঙ্গার প্রতিবাদে জনগণের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭-এর ১লা সেপ্টেম্বর গান্ধীজি আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। গান্ধীজির ঘটনা এবং আরো কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যের সঙ্গে 'জেরনশানের' আশ্চর্য সাদৃশ্যই বিষ্ণু দে-কে ঐ পটভূমিকায় কবিতাটির অনুবাদে প্রেরণা যুগিয়েছে। 'জরায়ণ'-এর মূল প্রতীক ঐ ঘটনাটিই এবং ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূলের স্থান-কাল-পাত্র, এমনকি প্রাসঙ্গিক ঘটনাও, কলকাতার ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাভিত্তিক করে তোলা হয়েছে।

'Gerontion' rushed into a faithful translation when, last year against the communal riots over the Mountbatten award, and when young men and women went out in peace procession and kept guard at street corners, and when some of them gave their lives.

অপরিচিত চিত্রকল্প, তথ্য, ব্যক্তিনাম কিম্বা অনুরূপ কিছুর পরিবর্তে অনুবাদে পরিচিত ও বিশ্বাস্য চিত্রকল্পাদি ব্যবহারের প্রবণতা বিষ্ণু দে-র ছিলই ; কিন্তু তাই বলে 'ইন এ ড্রাই মান্থ', 'ওয়েটিং ফর রেন্', 'আই ওয়াজ নেইদার অ্যাট্ দি হট গেটস্', 'নর ফট্ ইন দি ওয়ার্ম রেন্', 'ইন ডিপ্রেভড্ মে' প্রভৃতির অনুবাদে যথাক্রমে 'ভিজে ভাদুরে বাদলে', 'রৌদ্রের ~ াশায়', 'আশ্রমে আমি তো কোনো খাদির খামারে হাঁকিনিকো দর', 'লড়িনি পশ্চিমা রৌদে,' 'পচা ভাদ্রে' ব্যবহার খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না, বরং অনুবাদের ব্যাকরণে একটা মারাত্মক ব্যত্যয় বলে সন্দেহ হয়। তবে প্রতীকাত্মক কবিতার এই ধবনের অনুবাদে খুব একটা আপত্তির অবকাশ থাকে না। 'জরায়ণের' প্রতীক ঘটনাটি সেপ্টেম্বরেব গোড়ার, বাংলা মাসের হিসেবে ওটা নিঃসন্দেহে ভাদ্র এবং ভাদ্র বলেই বৃষ্টি ভেজা কিম্বা রৌদ্রের প্রতীক্ষা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। গান্ধীজির প্রতীকাশ্রয়ে এসেছে আশ্রম, খাদির খামার, আমেদাবাদ, চরকা প্রভৃতি।

পরিচিত ঘটনার প্রতীক গ্রহণ ক'রে 'কোরিওলান' অনূদিত। 'অন্তর্বর্তী সরকারের' প্রতীক নিয়ে 'কোরিওলান' পর্যায়ের কোন্ কবিতাটি অনূদিত তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই বিষ্ণু দে-র স্বীকৃতিতে। প্রথম কবিতাটিতে সৈন্যদলের (? বিজয়ী) সঙ্গে সৈন্যাধ্যক্ষ, খেলোয়াড়, সেবাদল, মেয়র, কাউন্সিলারদের শোভাযাত্রা। এ-ছবির সঙ্গে ইন্টেরিম সরকারের কার্যকলাপের দূরাগত মিলটুকুও নেই। পক্ষান্তরে অনুবাদকের আর একটি প্রবন্ধের সাক্ষ্য থেকে প্রতীত হয় 'ইনটেরিম সরকারে'র প্রতীকের আলম্বন 'কোরিওলান' পর্যায়ের দ্বিতীয় কবিতাটি।

Similarly 'Coriolan' come to be translated all on a sudden, when Pandit Nehru had formed the Interim Government and there used to be frequent talk of his resignation.

'ডিফিকাল্টিজ্ অব এ স্টেটস্‌ম্যান'-এর অনুবাদ 'কর্ণের খেদ' কবিতাটির কোনো-কোনো অংশ 'অন্তর্বর্তী সরকার' তথা সমসাময়িক ঘটনাবলীর ইঙ্গিতবাহী ঃ

১. সর্বজীব নশ্বর নশ্বর
বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট, নবাব, সর্দার
আহা সে সর্দার! নিজামৎজং,
রানা শের জঙ্গের তারকা (সোনার, রূপার)
কাশ্মীরের কাকের পদক।

২. প্রথম কাজই হল অনেক সমিতি গড়া ঃ

পরামর্শ-পরিষদ্, উপদেষ্টা-সমিতি ও বিশেষজ্ঞ এবং বহু শাখা সমিতি গঠন।

একই সম্পাদকে হবে বহু সমিতির।

৩. একটা সমিতি গড়ো, সে সমিতি জল সরবরাহের ব্যাপারে
এক এন্‌জেনিয়ার-কমিশন গড়ে দেবে।
কমিশন চাই এক চির শান্তি ব্যবস্থার জন্যে
লাদাকী মিশনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে।

৪. আমি এক ক্লান্ত মাথা এসব মাথার মধ্যে
মোটা ঘাড়ে ভারি মাথা
বাতাস কার্টাবি নাক।

৫. আমরা কি একদিন, এখনই হয়তো মিলতে পারি না দোঁহে
যদি ধৈর্য, শর্ত ত্যাগ, আত্মদান, পরস্পর অনুরোধ
এখন সবাই মানে
আমরা কি পারি না মিলতে।

৬. আমরা সমিতি চাই, সর্বজন প্রতিনিধিমূলক সমিতি, তদন্ত-সমিতি
পদত্যাগ পদত্যাগ পদত্যাগ।

সাঁওতাল দেশ (= সাঁওতাল পরগণা) ঘুরে আসার পর 'ল্যান্ডস্কেপস'-এর অনুবাদ পূর্ণতা পেয়েছে, এ-স্বীকৃতিও বিষ্ণু দে-র। সম্ভবতঃ 'নিসর্গদৃশ্য' পর্যায়ের বিভিন্ন কবিতার নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলিতে সাঁওতাল দেশের ছবি ফুটিয়েছেন বিষ্ণু দে ঃ

১. বউলের মাস আর ফলের মাসের মাঝে
শিশুদের গলা ঐ আম জাম বনে
জড়াও, দোলাও, লাফ দাও, গাও
দুলে দুলে উঠে যাও জামরুলের ডালে।

২. লাল নদী, লাল নদী....
তাপের স্তম্ভ নড়ে কি একটিবার
বউ কথা কও বারেক ডাকায় : স্তব্ধ পাহাড়
প্রতীক্ষমান।

৩. ভেঙোনা হঠাৎ ডাল অথবা কোরো না আশা

৪. এখানে উপোসী কাক, এখানে সহিষ্ণু মৃগ পাতে তার সংসার বন্দুকেরই তরে।

৫. আহা! চট্‌পট্‌ চট্‌পট্‌ শোনো ঐ গানচড়াই
বিলচড়াই, মাঠচড়াই, সাঁঝের আকাশে তালচড়াই
সকালে বিকালে। নাচ দেখ চেয়ে নাচ দেখ ধেয়ে
ভর্‌-দুপুর হরিয়ালের।

'রাজর্ষিদের যাত্রা' সম্পর্কেও প্রেরণাগত অকপট স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় অনুবাদকের ঃ

প্রতীকী রীতির নিহিত স্বাধীনতার বশেই 'রাজর্ষিদের যাত্রা'-র মতো খ্রিস্টিয়ান কবিতা গান্ধীজির দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদ সম্ভাব্যতা পায়—

'গান্ধীজির দ্বিতীয় আন্দোলন' অর্থে কোন্‌ আন্দোলনের প্রতীক গ্রহণ ক'রে 'জার্নি অব দি মেজাই' অনূদিত হয়েছে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই এই স্বীকারোক্তিতে। রচনাকালের ভিত্তিতে অনুমিত হয় গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযান বা লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনই 'রাজর্ষিদের যাত্রা'-র প্রতীক। গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের দীর্ঘ পদযাত্রার সঙ্গে মূল প্রতীকের মিল যেমন বিস্ময়কর, ঠিক তেমনি স্থান কাল উপকরণ তথা আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর অমিলটাও অনস্বীকার্য। গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযান সুরু হয় ১২ মার্চ ১৯৩০, কিন্তু রাজর্ষিদের 'সে যাত্রা হিমে'। তুষারপথে উট নিয়ে যাত্রা ভারতীয় পটভূমিকায় বেমানান। রেশমী মেয়েদের হাতে সরবৎ পেয়ালা, মদ আর স্ত্রীলোক, সরাইখানার দরজায় রুপোর টুকরোর লোভে পাশা খেলা আর খালি মদের মশকে লাথি ছোঁড়ার দৃশ্য সত্যাগ্রহী গান্ধীজির আন্দোলনের পটভূমিতে গ্রহণ করতে মন সঙ্কুচিত হয়।

বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদ সম্পর্কিত এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করছি এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে অনুবাদকে মূলের ছায়ামাত্র ক'রে না রেখে তাকে পুনঃসৃষ্টিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বিষ্ণু দে সর্বতোভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এলিঅটীয় আঙ্গিক, প্রকরণ, ভাষাভঙ্গি প্রভৃতির অক্ষুণ্ণতা রক্ষায় তিনি সচেতন প্রয়াসী। কি মূলের দেশ-কালের স্বাদ সঞ্চারে, কি বঙ্গীয় (তথা ভারতীয়) দেশ-কালের স্বাদ সঞ্চারে, উভয়তঃ তিনি সিদ্ধকাম। যথাযথ অনুবাদেরই নয়, যথাযথ ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেও তিনি অভাবিত মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। সব দিক দিয়েই তাঁর অনুবাদ সার্থক এবং অনবদ্য। তাই কবি বিষ্ণু দে-কে এলিঅটের

শ্রেষ্ঠ অনুবাদকরূপে অভিহিত করা অসমীচীন নয়। তাঁর অনুবাদও অন্য যে-কোনো এলিঅট-অনুবাদকের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। দীর্ঘ চার দশকের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা তাঁর অনুবাদে উৎকর্ষ এনে দিয়েছে, সেই সঙ্গে সংখ্যা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়েছে, এ একান্ত বাস্তব সত্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত কারণগুলি অনুমিত হয়ঃ ১. এলিঅটের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র মানসিকতার নৈকট্য, ২. অনুবাদকে নিছক অনুবাদরূপে গ্রহণ না ক'রে মৌলিক সৃষ্টিকর্ম রূপে গ্রহণ, ৩. এলিঅটের কবিতায় ব্যবহৃত পাশ্চাত্য ভাষাসমূহে বিষ্ণু দে-র সংশয়াতীত ব্যুৎপত্তি, ৪. স্বকীয় আঙ্গিক বা প্রকরণের অযথা আরোপ ক'রে অনুবাদকে ভাবাক্রান্ত করার পরিবর্তে মূলের আঙ্গিক, প্রকরণ, মেজাজ (spirit) প্রভৃতি রক্ষা ক'রে চলার আন্তরিক নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি, ৫. অনুবাদে প্রাঞ্জলতা তথা প্রসাদগুণের সঞ্চার।

বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদ নিরবচ্ছিন্ন নয় সে-বিষয়ে পূর্বেই আলোকপাত করেছি। চার দশকের বিভিন্ন সময়ের সৃষ্টি এই অনুবাদগুলি। সমসাময়িক কোনো-কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিতে এলিঅটের দু-একটি কবিতা অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছে এবং অনুবাদককে অনুবাদে প্রলুব্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি কবিতারই অনুবাদ খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে এমন নয়। কোনো কবিতার অনুবাদ ত্বরায় সম্পন্ন, আবার কোনো কবিতার অনুবাদের প্রস্তুতিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত ঃ

I might be of some interest to consider how these translation happened. They really happened after months, and even years of preoccupation with them. 'Ash Wednesday' and 'Burnt Norton' came off in a rush, but 'Gerontion' had taken years before it burst, and so had 'Coriolan'.

অনুবাদে নানাভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসী বিষ্ণু দে। এলিঅটের কবিতায় যেখানে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির ক্লান্তিকর প্রকরণ বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনাশ্রয়ী সেখানেও বিষ্ণু দে-র অনুবাদ শব্দচাতুর্যে ভাস্বর। প্রতিশব্দে ব্যঞ্জনানুসারী রূপান্তর ঘটিয়ে অনুবাদকে সুন্দর করেছেন। 'অ্যাশ্‌ ওয়েড-নেশ্‌ডে' কবিতার পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রারম্ভের অনুরূপ একটি অংশের চাতুর্যময় অনুবাদ পাচ্ছি 'চড়কের গানে (৫)' ঃ

If the lost word is lost, if the spent word is spent
If the unheard, unspoken

Word is unspoken, unheard
Still is the unspoken word, the Word unheard,
The Word without a word, the Word within
The world and for the world ;
And the light shone in darkness and
Against the Word the unstilled world still whirled
About the centre of the silent Word.

যদি লুপ্ত বাক্ লুপ্ত হয়, যদি নিঃশেষ অক্ষর হয় শেষ
যদিই, অশ্রুত, অভাষিত
বাক্ থাকে অভাষিত, এবং অশ্রুত
তবু স্থির অভাষিত সে অক্ষর, অশ্রুত সে বাক্
অক্ষর ব্যতীত বাক্ বিশ্বের অন্তস্থ আর বিশ্বেরই উদ্দেশ্যে
সেই বাক্
এবং আলোক ভাতিল আঁধারে আর
বাকের উপরে সেই ক্ষান্তিহীন বিশ্ব তখনও ঘূর্ণাযাবেশে
নিঃশব্দ বাকের মধ্য কেন্দ্রের চৌদিকে প্লুত।

'কোরিওলান' পর্যায়ের প্রথম কবিতার কয়েকটি চরণের অনুবাদেও অনুরূপ চাতুর্যের ক্ষীণ আভাস অনুভূত হয় ঃ

Now come the virgins bearing urns, urns containing
Dust
Dust
Dust of dust, and now

এবারে কুমারীদল শুচিব্রত অর্ঘ্য আনে কলসে, কলসে
মাটি
মাটি
ছাই মাটি, এবারে এখন

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যরীতিতে প্রাধান্য ছিল পুনর্লিখনের, বিষ্ণু দে-র কাব্যরীতিতে প্রাধান্য পরিবর্তনের। পুনর্লিখন কালে শুধু শব্দই নয়, ছন্দ চরণ সন্নিবেশ প্রভৃতিরও আমূল পরিবর্তন ঘটাতে দ্বিধা করেন নি প্রথম জন, অন্য জনের কাব্যরীতিতে কিন্তু পুনর্লিখন কিম্বা আমূল পরিবর্তন একান্ত অসুলভ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বিষ্ণু দে সাময়িক পত্রের পাঠ কোথাও-কোথাও পরিবর্তন করেছেন, আবার গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় গৃহীত পাঠেরও বিভিন্ন সংস্করণে

প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সীমিত, দু-একটি শব্দ কিম্বা চিহ্ন অথবা এক-আধটি চরণের সামান্য হেরফের ঘটিয়েই তিনি ক্ষান্ত।

বিষ্ণু দে-র 'মারিনা' অনুবাদটি সম্ভবতঃ সর্বাধিক পরিবর্তনের ছাপ বহন করছে। এর বিভিন্ন পাঠের তুলনামূলক আলোচনা করলেই আশা করছি অনুবাদকের পরিবর্তনের প্রকৃতি ও প্রবণতা ধরা পড়বে।

এলিঅটের 'মারিনা'-র চরণসংখ্যা পঁয়ত্রিশ। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অনুবাদের পাঠেও চরণসংখ্যা ছিল তাই; কিন্তু 'এলিঅটের কবিতা'-র তৃতীয় সংস্করণে মুদ্রিত চূড়ান্ত অনূদিত পাঠে চরণসংখ্যা চল্লিশ। তাছাড়া মূলের শিরোধারণটির (epigraph) কোনো অনুবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশের সময় ছিল না, 'এলিঅটের কবিতা'-র পাঠে তা সংযোজিত হয়েছে। সাময়িক পত্রের পাঠের কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে এমন চরণের সংখ্যা পনের। ছেদ চিহ্ন ও স্তবক-বিন্যাসের পরিবর্তন এতদতিরিক্ত। এর থেকেই এই অনুবাদ কবিতাটির পাঠে পরিবর্তনের ব্যাপকতা সহজেই অনুমেয়। 'মারিনা' অনুবাদের প্রথম প্রকাশ (সাময়িক পত্রে) এবং 'এলিঅটের কবিতা'-র তৃতীয় সংস্করণের মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় তিন দশকের। এই দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমার্জন যেমন একান্তই অনভিপ্রেত নয়, তেমনি অস্বাভাবিক নয় কবিমানসের পরিবর্তনও। তবে লক্ষ্যণীয় যে এই অনুবাদে ব্যাপক পরিবর্তন (অন্যান্য কবিতার তুলনায় অবশ্যই অনেক বেশি) এসেছে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়ই। যদিচ সাময়িক পত্র এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের (অবশ্যই প্রথম সংস্করণ) মধ্যে কালগত ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম, এক দশকের একটু বেশি (প্রায় বারো বছর), তাহলেও প্রথম সংস্করণের পাঠকেই অনায়াসে 'মারিনা'-র পরিণত এবং পূর্ণতর রূপ বলে গ্রহণ করা চলে। অর্থাৎ পরবর্তী ষোল বছরে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নি। প্রকৃতই পরবর্তী দুটি সংস্করণে পরিবর্তন নামমাত্র এবং তা নিতান্তই গুটিকয়েক শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মূল কবিতায় ল্যাটিন শিরোধারণ ছিল ঃ

Quis hie locus, quae
regio, quae mundi plaga ?

'কবিতা' সাময়িক পত্রের পাঠে এর কোনো অনুবাদ ছিল না। 'এলিঅটের কবিতা'-র প্রথম সংস্করণে এর অনুবাদ সংযোজিত হয়েছিল, 'এ কোন্ স্থান, কোন্ রাজ্য, পৃথিবীর কোন্ দেশ ?' মূলের অনুসরণে মুদ্রিত হয়েছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির হরফে। দ্বিতীয় সংস্করণে এই পাঠ অবিকৃত থাকলেও

তৃতীয় সংস্করণে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে, 'এ কোন্ স্থান, কোন্ রাজ্য, পৃথিবীর কোন্ দেশ ?' বিষ্ণু দে-র অনুবাদে শিরোধারণের চরণসংখ্যা সর্বত্র মূলানুসারী হলেও ব্যতিক্রম 'মারিনা'। এখানে মূলের দুটি চরণ অনুবাদে হয়েছে একটি।

মূলের প্রথম চরণ ঃ

What seas what shores what grey rocks and what islands

'কবিতা'-য় এর অনুবাদ ঃ

কোন্ সে সমুদ্র, কোন্ বালুতীর, ধূসর পাহাড়,
আর কোন্ সব দ্বীপ

'এলিঅটের কবিতা'-র প্রথম সংস্করণে চরণটি পেয়েছে পূর্ণতর রূপ ঃ

কতো না সমুদ্র কোন্ বালুতীর ধূসর পাহাড়…

দেখা যাচ্ছে চরণের গোড়ার 'কোন্ সে' শব্দ দুটি বর্জন ক'রে 'কতো না' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ 'কোন্' শব্দটির অতি প্রয়োগজনিত আপাত ত্রুটি এড়ানো ছাড়াও মূলের what seas-এর অনুগামী বহুবচনধর্মী ব্যঞ্জনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই এই পরিবর্তন। ছেদ চিহ্ন তিনটি কমাই (,) পরবর্তী পাঠে পরিত্যক্ত। অন্যত্রও 'কবিতার-'র পাঠের ছেদ চিহ্নের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত ক'রে মূলানুগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের 'কত' শব্দের বানান সংস্কার ক'রে 'এলিঅটের কবিতা'-র প্রথম সংস্করণে করা হয়েছিল 'কতো', কিন্তু পরবর্তী সংস্করণ থেকে আবার 'কবিতা'-র পাঠই পুনর্বহাল করা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে পরিবর্তন ও পরিমার্জন খুব বেশি। মূল স্তবক ঃ

Those who sharpen the tooth of the dog, meaning
Death
Those who glitter with the glory of the hummingbird, meaning
Death
Those who sit in the sty of contentment, meaning
Death
Those who suffer the ecstasy of the animals, meaning
Death

'কবিতা'-র অনুবাদে ছিল ঃ

কুকুরের দাঁতে যারা শান দেয়, অর্থাৎ

মরণ
মনিয়া পাখির রংবাহারে যারা শোভা পায়, অর্থাৎ
মরণ
যারা সব ব'সে থাকে প্রসাদের খোঁয়াড়ে, অর্থাৎ
মরণ
যারা পশুর পুলকে বাঁচে, অর্থাৎ
মরণ

সুন্দরতর কিম্বা মূলানুগ করতে পাঠ-সংস্কার অনিবার্য মনে হোক বা না হোক অনুবাদের রূপ মূলানুগ করতে এই স্তবকের পাঠ-সংস্কার ছিল অবশ্যই অপেক্ষিত। পাঠ-সংস্কার এবং আকাঙ্ক্ষিত রূপ পাওয়া গেল 'এলিঅটের কবিতা'-র একেবারে প্রথম সংস্করণেই। সংস্কৃত পাঠ :

যারা ব'সে শান দেয় কুকুরের দাঁতে, অর্থাৎ
মরণ
যারা শোভা পায় মনিয়া পাখির রংবাহারে, অর্থাৎ
মরণ
যারা সব বাসা বাঁধে প্রসাদের খোঁয়াড়ে, অর্থাৎ
মরণ
যারা কাঁপে পশুভোগ্য পুলকের ভারে, অর্থাৎ
মরণ

এলিঅটের স্তবকটির চরণ-বিন্যাসের একটি বিশেষ রীতি ফুটে উঠেছে যা 'কবিতা'-র অনুবাদে অক্ষুণ্ণ ছিল না। মূলের এই বিশেষ রীতিটি পূর্ণতা পেয়েছে 'এলিঅটের কবিতা'-র প্রথম সংস্করণের রূপান্তরেই। 'কবিতা'-র মুখ্যতঃ গদ্যধর্মী অনুবাদ কাব্যধর্মী করা হয়েছে শব্দবিন্যাসের হেরফের ঘটিয়ে। পর্যায়ক্রমে Those এবং Death শব্দ দুটি ব্যবহার ক'রে এলিঅট যে ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন, পাঠ-সংস্কার ক'রে বিষ্ণু দে-ও অনুরূপ ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন। 'যারা সব বাসা বাঁধে প্রসাদের খোঁয়াড়ে, অর্থাৎ' চরণটিতে 'প্রসাদের' পরিবর্তে মূলানুগ 'তুষ্টির' ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণে। উপধা চরণটিতে 'যারা পশুর পুলকে বাঁচে' গদ্যধর্মী বাক্যটি কাব্যধর্মী করতে শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে, ঋজু অর্থটিও তির্যক করা হয়েছে : 'যারা কাঁপে পশুভোগ্য পুলকের ভারে'।

ম্লের অষ্টাদশ চরণ ঃ

The pulse in the arm, less strong and strongers—

'ক বি তা'-র অন্ববাদে ছিল ঃ

হাতের ধমনী ব্বঝি লীন, বেগবান

'এ লি অ টে র ক বি তা'-র (প্র. সং) সংশোধিত পাঠ ঃ

হাতের ধমনীস্পন্দ লীন, বেগবান—

ম্লের চরণান্তিক 'ড্যাশ' চিহ্নট্বকু যা 'ক বি তা'-র পাঠে স্থান পায় নি, তাকে যথাস্থানে বসানো হয়েছে 'এ লি অ টে র ক বি তা'-র পাঠে। অন্ববাদ ম্লান্বগ করতে ম্লের স্বক্ষ্ম প্রকরণগ্বলিও যত সামান্যই হোক, অন্ববাদকের দ্বষ্টি এড়ায় নি।

ম্ল কবিতার ২০-২২শ চরণ ঃ

Whispers and small laughter between leaves and
hurrying feet

Under sleep, where all the waters meet.

Bowsprit cracked with ice and paint cracked with heat.

'ক বি তা'-র অন্ববাদ ঃ

নেপথ্যে গ্বঞ্জন আর মিহি হাসি ডালপাতা আর ছ্বটন্ত পায়ের রেশে
ঘ্বমের পাতাল দেশে, যেখানে সব জল মেশে।
চণ্ডীপাটে চিড় লাগে, বরফের চাপে চড়া রোদে রং চটে যায়।

'এ লি অ টে র ক বি তা'-র (প্র. সং) সংশোধিত পাঠ ঃ

কানে কানে কথা আর ছোট-ছোট হাসি পাতা আর
ছ্বটন্ত পায়ের রেশে রেশে
ঘ্বমের গভীরে যেখানে সব জল মেশে।
চণ্ডীপাটে চিড় পড়ে বরফের চাপে, চড়া রোদে রং চটে যায়।

প্রথম চরণটির 'ক বি তা'-র পাঠের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, চরণটি দ্বিধাবিভক্তও হয়েছে। অন্বর্পভাবেই ম্লের ২৭শ চরণটি 'ক বি তা'-র পাঠে একটি চরণে বিন্যস্ত থাকলেও 'এ লি অ টে র ক বি তা'-য় তা দ্বটি চরণে বিন্যস্ত।

ম্ল কবিতার ২৯-৩৩শ চরণের অন্ববাদে 'ক বি তা'-র পাঠের যথেষ্ট হেরফের ঘটানো হয়েছে পরবর্তী পাঠে। ম্লের চরণগ্বলি ঃ

This form, this face, this life
Living to live in a world of time beyond me ; let me

Resign my life for this life, my speech for that unspoken,
The awakened, lips parted, the hope, the new ships.

What seas what shores what granite islands towards my
timbers

'ক বি তা'-র অনুবাদে ছিল :

এই রূপ, এই মুখ, এ জীবন কোন্ কালের
আমাকে ছাড়িয়ে জগতে জীবনের তরে
এ জীবন ; দিতে চাই
আমার জীবন এনে মেনে দিই এ জীবনে, আমার যতেক কথা
ঐ অকথিতে
এই জাগরিত, ঠোঁট দুটি ফুটফুটে, এই আশা, এই সব
নূতন জাহাজ।
কোন্ সে সমুদ্র সব বালুতীর কষ্টিপাথরের কোন্ দ্বীপ আমার
কাঠের দিকে আর

মূলে না থাকলেও 'ক বি তা'-র অনুবাদে 'এই রূপ, এই মুখ' ···চরণ থেকে নূতন স্তবক সুরু হয়েছে। এই ভুঁইফোড় স্তবকটির ক্ষেত্রেই নয়, চরণ-বিন্যাসেও এখানে 'ক বি তা'-র পাঠের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ফলে প্রথম চরণটির পরিবর্তন ও নূতন বিন্যাস মূলানুগ হলেও পরবর্তী চরণগুলি আর মূলানুগ (পূর্বে মূলানুগই ছিল) থাকে নি। পরিবর্তিত 'এ লি অ টে র ক বি তা' -র পাঠ :

এই রূপ, এই মুখ, এ জীবন
আমাকে ছাড়িয়ে কোন্ কালের জগতে জীবনের তরে এ জীবন ;
দিতে চাই আমার জীবন এনে মেনে দিই এ জীবনে,
আমার যত কথা ঐ অকথিতে
এই জাগরিত, ঠোঁট দুটি ফুটফুটে; এই আশা
এই সব নূতন জাহাজ।

কোন্ সে সমুদ্র, কোন্ বালুতীর কষ্টিপাথরের কতো দ্বীপ
আমার কাঠের দিকে আর।

পরবর্তী সংস্করণগুলিতে প্রথম সংস্করণের পাঠের ওপরই দাগা বুলোনো

হয়েছে। সব কটি চরণই অক্ষত। কেবল 'কোন্ সে সমুদ্র, কোন্ বালুতীর…' চরণে 'কতো' পাঠ বর্জন ক'রে 'ক বি তা'-র 'কত' পাঠই পুনর্বহাল করা হয়েছে। নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণততর রূপে উপনীত হওয়ার প্রবণতা বিষ্ণু দে-র অন্য অনুবাদেও পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন কবি ওয়ালেস স্টিভনস্-এর অনুবাদ 'আধুনিক কাব্য'-এর 'এ কা লে র ক বি তা' (পৃ. সাত) ও 'র বী ন্দ্র না থ ও শি ল্প সা হি ত্যে আ ধু নি ক তা র স ম স্যা' (পৃ. ৫) গ্রন্থের পাঠ মিলিয়ে দেখলেই বক্তব্যের সারবত্তা ধরা পড়বে। মৌলিক কবিতায় অনুরূপ প্রবণতা ধরা পড়বে 'জল দাও' কবিতাটির 'এ কা লে র ক বি তা' ও 'ব ছ র প' চি শ'-এর পাঠ মেলালে।

পাঠ-সংস্কারের এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে কবির প্রবণতা এবং অভিপ্রায়ের মোটামুটি একটা হদিস পাওয়া যায়ঃ ১. মূলানুগকরণ, ২. অনুবাদে উৎকর্ষ, ৩. দেশ-কালের স্বাদ-সঞ্চার, ৪ যথাযথ প্রতীক সৃষ্ট, ৫. প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা, ৬. বাক্য ও চরণ সংহতকরণ, ৭. ছন্দের মর্যাদা রক্ষা প্রভৃতি।

রীতি এবং প্রকৃতি বিচার ক'রে পরিবর্তন সমূহকেও শ্রেণীবিন্যস্ত করা চলেঃ ১. শব্দগত, ২. বানানগত, ৩. বিভক্তিগত, ৪. প্রত্যয়গত, ৫. ছেদচিহ্ন-প্রকরণগত, ৬. বাক্যবিন্যাসগত, ৭. চরণবিন্যাসগত, ৮. ছন্দোগত, ৯. স্তবক বিন্যাসগত প্রভৃতি।

৪. এলিঅট অনুবাদঃ হুমায়ুন কবির

এলিঅটের 'লা ফিল্‌লিরা চে পিয়াঙ্গে' কবিতাটির অনুবাদ করেন হুমায়ুন কবির। 'নিবিড় কেশের জালে তোমার আলো জড়াও' নামে অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'প রি চ য়'-এর বৈশাখ ১৩৪১ সংখ্যায়। অনুবাদ কাল অনুমিত হয় তিরিশের দশকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়। সে-দিক দিয়ে অনুবাদ কবিতাটি বিষ্ণু দে-র 'য়ো দোশিজা যো রোঙ্গ', 'ফাঁপা মানুষ', 'জীবকণা', সিমেঅনের গান' প্রভৃতি অনুবাদের সমসাময়িক। সময়টা অবশ্যই এলিঅট অনুচারণার কাল, অনুবাদে এবং মৌলিক কবিতায় নানাভাবে এলিঅটীয় কাব্যরীতি অঙ্গীকরণের প্রয়াস স্পষ্টতই অনুভূত হয়েছে সে সময়।

হুমায়ুন কবিরের মুন্সিয়ানা তিনি তাঁর অনুবাদ কবিতাটিকে প্রকৃতই এলি-

অটের অনুবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনুবাদকে পুনঃসৃষ্টির মর্যাদায় ভূষিত করেননি, সম্ভবতঃ সে অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল না। পুরোপুরি মূলানুগ অনুবাদ বলতে যা বোঝায় 'নিবিড় কেশের জালে তোমার রবির আলো জড়াও' ঠিক তাই। বক্তব্য, চরণ এবং বাক্য-বিন্যাস মূলানুসারী। অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে এলিঅটকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন। 'লা ফিলুলিয়া চে পিয়াঞ্জে' কবিতায় এলিঅট অনতিতীব্র ছন্দের অনুরণন সঞ্চার করেছেন, হুমায়ুন কবিরের অনুবাদেও অনুরূপ ছন্দের অনুরণন স্পষ্ট অনুভূত হয়। অনুবাদে আগাগোড়া স্বরবৃত্ত ছন্দ রক্ষা ক'রে চলার প্রবণতা আছে। মূলের একটি স্তবক আর তার অনুবাদ পাশাপাশি উদ্ধৃত করলেই অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য এবং মূলানুসরণ স্পষ্ট হবে ঃ

Stand on the highest pavement of the stair—
Lean on a garden urn—
Weave, weave the sunlight in your hair—
Clasp your flowers to you with a pained surprise—
Fling them to the ground and turn
With a fugitive resentment in your eyes ;
But weave, weave the sunlight in your hair

সিঁড়ির পরে সবার চেয়ে উঁচু ধাপে দাঁড়াও,
বাগানের এই টবের কাছে ঘেঁসে,
নিবিড় কেশের জালে তোমার রবির আলো জড়াও,
ব্যথিত বিস্ময়ে লহ ফুলের রাশি বুকের কাছে টানি',
ধূলোয় তাদের দাও ছড়িয়ে নিমেষ শেষে
দাঁড়াও ফিরে ক্রুদ্ধ চকিৎ চক্ষে তবে বহ্নিশিখা হানি,'—
জড়াও তবু রবির আলো, তোমার নিবিড় কেশের জালে জড়াও।

দেখা যাচ্ছে, মূল কবিতায় যেমন এক-একটি বাক্য এক-একটি চরণে সীমাবদ্ধ, অনুবাদেও তেমনি। মূলের চরণান্তিক অন্ত্যানুপ্রাসের ক্রম ক খ ক গ খ গ ক অনুবাদেও অব্যাহত।

হুমায়ুন কবির কল্লোল গোষ্ঠীর কবি হলেও রোমাণ্টিকতার জেরটুকু নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতেও তিনি পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। সে-কারণেই এলিঅটীয় কাব্যরীতির অঙ্গীকরণ সম্ভবতঃ বিষ্ণু দে-র মতো হুমায়ুন কবিরের ক্ষেত্রে অনপেক্ষিত। 'নিবিড়

কেশের জালে তোমার রবির আলো জড়াও' অনুবাদে একটা ক্ষীণ রোমাণ্টিক রেশ, ভাষার মধ্যেও গদ্যধর্মিতা ফুটিয়ে তোলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না। বিষ্ণু দে কাব্য-স্বভাবেই এলিঅটীয় কাব্য-রীতির নৈকট্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর অনুবাদে সহজেই সে-রীতি ধরা পড়েছে। এলিঅটীয় গদ্যধর্মিতাই নয়, চিত্রকল্প প্রভৃতি কাব্যপ্রকরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গিও অনুবাদে সঞ্চারিত করা তাঁর পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়। 'য়ো দোশিজা যো রোঙ্গ'-এর সঙ্গে 'নিবিড় কেশের জালে তোমার রবির আলো জড়াও'-এর মৌলিক প্রভেদটা এখানেই।

প্রকাশভঙ্গিতে এলিঅটীয় নৈকট্যে উপনীত হওয়া হুমায়ুন কবিরের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নি। অর্থের যাথার্থ্যও কোথাও-কোথাও হয়েছে বিড়ম্বিত।

She turned away, but with the autumn weather
Compelled my imagination many days,
Many days and many hours :
Her hair over her arms and her arms full of flowers
And I wonder how they should have been together !
I should have lost a gesture and a pose.
Sometimes these cogitations still amaze
The troubled midnight and the noon's repose.

ফিরল বালা আপন পানে, তবু হেমন্তের স্বর্ণালোকে
চিত্ত আমার পূর্ণ করি' রইল অনেকদিন,—
অনেক দিবস, অনেক নিমেষ ভ'রি !
কবরী তার লুটায় বাহুর পরে, বাহুতে তার কুসুম-মঞ্জরী।
ভাবি মনে, এমন ছবি কেমন ক'রে লাগ্‌ল চোখে !
ভাবি যদি অদেখা মোর হারিয়ে যেতো দেহের ছন্দ, দেহের যতি !
ভাবা-না-যায় সেই ভাবনায় আজো অধীর নিদ্রাবিহীন
মধ্যরাতের অশান্তি মোর, মধ্যদিনের স্নিগ্ধ পরিণতি।

অর্থ-যাথার্থ্যের বিড়ম্বনায় বিষ্ণু দে-কে পড়তে হয় নি। অবশ্য এই স্তবকের অন্ত্যানুপ্রাসে হুমায়ুন কবির এলিঅট অনুসরণে সম্পূর্ণ সফলকাম হলেও বিষ্ণু দে-র পক্ষে তা সম্ভব হয় নি।

শিরোনামায় ভাষান্তর ব্যবহার এবং শিরোন্ধারণ প্রয়োগ (তাও ভাষান্তরের) যে বিশেষ এলিঅটীয় প্রকরণের পরিচায়ক তার কোনো আভাস নেই হুমায়ুন কবিরের অনুবাদে।

তিরিশের দশকেই হেমচন্দ্র বাগচী এলিঅটের 'প্রিল্যুডস্' কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন। অধুনা তা দুষ্প্রাপ্য। 'লিটারেচর এ্যাণ্ড জার্নালিজম্' প্রবন্ধের অনুবাদ করেছিলেন অরুণ মিত্র চল্লিশের দশকে। সত্তরের দশকে 'পোড়ো জমি' নামে 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' অনুবাদ করেছেন অনিল বিশ্বাস।

এই সমস্ত এলিঅট অনুবাদকের অনুবাদরীতি প্রবণতা বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির তৌলন বিচারে প্রথমেই চোখে পড়ে, সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে ছাড়া অন্যান্যদের অনুবাদের পশ্চাতে সনিষ্ঠ প্রবর্তনা অনুপস্থিত। সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে অনেকাংশে ব্রত রূপে গ্রহণ ক'রে এলিঅট অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অন্যেরা কিন্তু বিশেষ ভাবেই সাময়িক প্রবর্তনার অনুগামী। কাব্যস্বভাবে এলিঅটের সঙ্গে নৈকট্য বিষ্ণু দে ছাড়া আর কারুর ছিল না; তাই বিষ্ণু দে এলিঅট অনুবাদে নিরলস (সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ অকাল মৃত্যুতে বিঘ্নিত); পক্ষান্তরে অন্যদের অনুবাদ এক-আধটি কবিতায় গণ্ডি অতিক্রম করে নি। কাব্যস্বভাবের গুণেই অনুবাদে এলিঅটীয় আঙ্গিক, কাব্যরীতি, প্রকরণ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি যথাযথ সঞ্চারে বিষ্ণু দে সম্পূর্ণ সফলকাম এবং সে-কারণেই তিনি বাংলায় শ্রেষ্ঠ এলিঅট অনুবাদক।

তিন

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সুর এবং এলিঅটের অবদান

১

সমসাময়িক প্রথানুগ কবিতাব লক্ষ্যহীনতা ও বৈশিষ্ট্যহীনত্বে বিক্ষুব্ধ কয়েকজন ইংরেজ কবি ১৯১৩ খৃঃ অব্দে কবিতা ও কাব্যরীতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঃ

1. To use the language of common speech, but to employ always the exact word, not the merely decorative word.

2. To create new rhythms—as the expression of new moods. We do not insist upon 'Free-verse' as the only method of writing poetry···we do belive that the individuality of a poet may often be better expressed in free verse than in conventional poems.

3. To allow absolute freedom in the choice of subject.

4. To present an image. We are not a school of painters, but we believe that poetry should render particulars exactly and not deal with vague generalities.

5. To produce poetry that is hard and clear, never blurred or indefinite.

6. Finally, most of us believe that concentration is the very essence of poetry.[১]

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর 'আধুনিক কবিতার রূপ' প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্ত-সমূহের বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন ঃ

১. কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার মতো করতে হবে, ঠিক যে শব্দ ব্যবহার করলে প্রকাশভঙ্গী স্বাভাবিক হতে পারে সে শব্দই ব্যবহার করা চাই।

কবিতার কারু-কার্যের জন্য অপ্রচলিত জমকালো বাক্য-বিন্যাসের দুর্বলতা ত্যাগ করতে হবে।

২. বিভিন্ন নতুন ভাবপ্রকাশের বাহন স্বরূপ নতুন ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, একমাত্র ফ্রিভর্স অথবা গদ্যচ্ছন্দে কবিতা লেখার ওপরেই জোর দিতে হবে। তবে একথা স্বীকার্য যেপ্রচলিত পদ্ধতিতে (conventional forms) কবিতা না লিখে ফ্রিভর্স অথবা গদ্যচ্ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করলে কবির স্বাতন্ত্র রক্ষা হয়তো সহজেই সম্ভবপর হতে পারে।

৩. বিষয়বস্তু নির্বাচনে কবি সীমাহীন স্বাধীনতা পাবেন।

৪. কবির একটা ঝোঁক থাকবে কবিতায় প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করবার দিকে। কবিরা কোনো বিশেষ ইস্কুলের একদল শিল্পী নন, তাঁরা বিশ্বাস করবেন যে কবিতা বিশেষ ও নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেই গঠিত হবে, কোনোরূপ অস্পষ্ট সীমারেখাহীনতাকে প্রশ্রয় দেবে না।

৫. শক্ত ও স্পষ্ট কবিতা লেখা চাই,—অনির্দিষ্ট অথবা ঝাপসা কিছু হলে চলবে না।

৬. সর্বশেষে, যাঁরা নবীন উদ্যোগী তাঁদের সকলেরই বিশ্বাস যে তন্ময়তা (concentration) কাব্যরচনার প্রধান ও সার বস্তু এবং তাই অপরিহার্য।[৫]

স্পষ্টতঃই কাব্য-আন্দোলনের এই ইস্তাহার মুখ্যতঃ কাব্যের বহিরঙ্গ-বিষয়ক। প্রথানুগ কাব্যরীতি সম্পর্কে (এবং আংশিক কাব্য-বিষয় সম্পর্কে) ফতোয়া জারি ক'রে আধুনিকতাবাদীরা কাব্যধারায় আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। আন্দোলনের অন্যতম শরিক ছিলেন এলিঅট। সক্রিয় অংশগ্রহণে তাঁর যথাযথ ভূমিকা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা চলে যে এই ঐতিহাসিক কাব্য-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল অবশ্যই টি. এস. এলিঅটের 'দি ও য়ে স্ট ল্যা ণ্ড'। এই ক্ষুদ্রাবয়ব কাব্যটিতে আধুনিকতাবাদের মূল সুরগুলির সার্থক রূপায়ণ ঘটেছিল, ইংরেজি কাব্যধারায়ও (অপ্রত্যক্ষভাবে বাংলা কাব্যধারায়ও) যুগান্তর এনেছিল। কল্লোল যুগের কাব্য-আন্দোলন ইংরেজি কাব্যধারার উপর্যুক্ত আন্দোলনের সম্পূর্ণ সমান্তরাল না হলেও কল্লোল যুগের 'অতি আধুনিকতাবাদী' কবিরা ইংরেজ কবিদের কাব্য-আন্দোলন থেকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা আহরণ করেছিলেন এবং ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন আঙ্গিক, কাব্যরীতি প্রভৃতির দ্বারা। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখ আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা কবিরা নির্বিচারে এলিঅটীয় কাব্যরীতি থেকে প্রভূত ঋণগ্রহণ করেছিলেন। তাই দেখা যায় তিরিশের দশকের বাংলা কবিতার কাব্য-

রীতিতে আধুনিকতার লক্ষণগুলি হুবহু মিলে যায় ১৯১৩-এর ইংরেজি কাব্য-আন্দোলনের কাব্যরীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে। আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকৃৎ গবেষক বাংলা কাব্যরীতিতে আধুনিকতার লক্ষণসমূহের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

১. বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলিত শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্যভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা। পরবর্তী পর্যায়ে অতি-ব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ অর্থাৎ ভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শুচিবায়ু পরিহার।

২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কবিদের কাব্য অথবা ভাবনা থেকে উদ্ধৃতির যত্রতত্র প্রয়োগে সিদ্ধরসকে চূর্ণ করা বা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অনুভূতির সমন্বয় সাধন।

৩. প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ও বর্ণনার বিরলতম ব্যবহার। প্রচলিত কাব্যিক শব্দ, যথা—ছিনু, গেনু, মনে, হিয়া প্রভৃতি বর্জন।

৪. প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ এবং তৎসহযোগে নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি।

৫. শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা।

৬. এই মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বাহুল্যবর্জনের ফলে মধ্যবর্তী চরণের অনুল্লেখ। তার জন্য চিন্তাধারার মধ্যে একটা উল্লম্ফনের সৃষ্টি, আপাত দৃষ্টিতে যাকে মনে হয় অসম্বন্ধ। ছড়ার উল্লম্ফনের সঙ্গে তার পার্থক্য মৌলিক।

৭. নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ।

৮. প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর এবং মধ্যমিলের (internal rhyme) সৃষ্টি।

৯. গদ্যছন্দের ব্যবহার।

১০. ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের ব্যাপক ব্যবহার।

১১. বিষয়বৈচিত্র্য।[৩]

তিরিশের দশকের বাংলা কাব্য-আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত কাব্যরীতি, আঙ্গিক ও প্রকরণগত আধুনিকতার লক্ষণগুলির সঙ্গে ১৯১৩ সালের ইংরেজি কাব্য-আন্দোলনের সিদ্ধান্তগুলির এই গভীর সাদৃশ্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে

১৯১৩-এর ইংরেজি কাব্য-আন্দোলনের ঢেউ বাংলা কাব্যের তটে আছড়ে পড়েছিল তিরিশের দশকে। ইংলণ্ডে আলোড়ন তোলার মূলে ছিলেন এলিঅট স্বয়ং, বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা ছিল প্রধানতঃ এলিঅটের কাব্য ও কাব্য-আলোচনার। সে কারণে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সুর সঞ্চারে এলিঅটের ভূমিকা উপেক্ষার নয়, বরং অধিকতর গুরুত্ব ও মর্যাদার।

এলিঅট প্রভাবিত তথা অনুপ্রাণিত বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সুর নানা-দিকে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। যে-সমস্ত দিকে এই সুর সহজেই চোখে পড়ে তা হল কাব্যরীতি, আঙ্গিক, প্রকরণ, বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা, উপস্থাপন প্রভৃতি। আধুনিকতার সুরের ব্যাপকতা ছিল অনেক বেশি, তাই ঐ দিক-সমূহের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। আবার বিশেষ-বিশেষ কবির রচনায় আধুনিকতার বিশেষ-বিশেষ সুর ফুটে উঠেছে বলেই এলিঅট প্রভাবিত তিরিশের দশকের কবি ও কবিকৃতির ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তিরিশের দশক-পূর্ববর্তী তথাকথিত অনাধুনিক বাংলা কবিতা কিভাবে আধুনিকতার সুর অঙ্গীকৃত করার দিকে অগ্রসর হয়েছিল তার পশ্চাৎপটের প্রতিও একবার ঐতিহাসিক দৃষ্টিক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২

প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্য ছিল একান্তই (সমগ্র বাংলা সাহিত্যই) রবীন্দ্র সর্বস্ব, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যই একমাত্র ঐতিহ্য, রোমাণ্টিকতাই একমাত্র সুর। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অনুবর্তনেই কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটছিল অধিকাংশ কবির, বাংলা কাব্যও প্রগতিতে যত না এগোচ্ছিল, কলেবরে স্ফীতকায় হচ্ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। এরই মধ্যে আংশিক ব্যতিক্রম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অন্যতম স্তম্ভ হয়েও ছন্দের চাপল্যে কতকাংশে ঐ ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। নতুন সুরও এনেছিলেন। সে-সুর লৌকিক ছন্দের সুর, লৌকিক ছড়াই এর আলম্বন। সম্ভবতঃ যদিও ছন্দে, তাহলেও কথ্যরীতি প্রবণতাই এই সুরের অভিনবত্বের কারণ (সমসাময়িক কালেই গদ্যে কথ্যরীতির প্রবর্তনার প্রবক্তা ছিলেন প্রমথ চৌধুরী)।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল ইয়োরোপে। ইয়োরোপীয় জীবনের সর্বস্তরে—রাজনীতিতে, সাহিত্যে, কলায়, শিল্পে, সংস্কৃতিতে, মননে, দর্শনে, জীবনচর্যায় পড়েছিল এর অনপনেয় ছায়া। অনুরূপ প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি

ভারতে কিম্বা বাংলা দেশে। অনুরূপ অনপনেয় ছায়াও পড়েনিভারতীয়জীবনের সর্বস্তরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম মহাযুদ্ধ বাংলা কাব্যে এক সুস্পষ্ট সীমারেখা। এরপর আর বাংলা কাব্যের রবীন্দ্রসর্বস্ব স্বরূপ রইল না, রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের বাইরেও নতুন সুর শোনা গেল। সে সুর ধ্বনিত হল নজরুল-যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের মধ্যে। এ'রা সকলেই প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী কবি, বিশের দশকের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এ'রা বাংলা কাব্যের সুরে যে-অভিনবত্ব এনেছিলেন সমসাময়িক কালের বিচারে তা আধুনিক ব'লে অভিনন্দিত হওয়াতে কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সুর তাঁরা আনতে পারেন নি। তার কারণ, প্রথমতঃ, তাঁদের এই প্রয়াস একক কাব্যবৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছু নয়, বহুল অনুসৃত রীতি রূপেও প্রতিষ্ঠিত হয় নি; দ্বিতীয়তঃ, এ'দের অভিনবত্বের কোনো আঁচ লাগে নি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের গায়ে, সে-ধারায় ফাটলও ধরে নি; তৃতীয়তঃ, কেবল অন্তঃপ্রেরণার সাহায্যেই আধুনিকতার সুর নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না, বহিঃপ্রেরণারও অনিবার্য আবশ্যকতা ছিল। হাবিলদার নজরুল প্রথম মহাযুদ্ধের বাঙালী পল্টনরূপে মধ্য-প্রাচ্য এশিয়া থেকে কিছুটা বহিঃপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু বাংলা কাব্যের ব্যাপকতার তুলনায় তথা রবীন্দ্রঐতিহ্যে ফাটল ধরাবার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না, তাই বাংলা কাব্যে তার বিশেষ কোনো কার্যকরী প্রভাবও পড়ে নি।

নজরুল-যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল সম্পর্কে যে তথ্যটি মূল্যবান তা হল এই যে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য এড়িয়েও বাংলা কাব্যে সুর-স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়েতোলা সম্ভব সে সত্য তাঁদের প্রয়াসের মধ্য দিয়েই প্রথম উদ্ঘাটিত হয়েছিল। কিন্তু এ'দের কালে নয়, তিরিশের দশকে বাংলা কাব্যে প্রকৃত আধুনিকতার সুর ফুটে উঠল। পাওয়া গেল রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার রূপ, যাকে রবীন্দ্রনাথও আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। এমন অঘটন ঘটানো যে সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, এর পশ্চাতে ছিল রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর সামূহিক প্রয়াস—যাঁরা আন্তঃপ্রেরণার মতোই বহিঃ প্রেরণাতেও ছিলেন সমধিক পীড়িত। বহিঃপ্রেরণা এসেছিল মুখ্যতঃ এলিঅট থেকে।

৩

সমসাময়িক ইংরেজি কাব্যে ভিক্টোরীয় রোমান্টিকতা-বিরোধী যে কাব্যরীতি ধরা পড়েছিল সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই কাব্যরীতি সিদ্ধান্তের দিক

দিয়ে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারেন নি, তাহলেও এই রীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আশ্চর্য রকমভাবে ধরা পড়েছে সত্যদ্রষ্টা কবির কাছে। রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত আধুনিক কাব্যধারার বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু মূল্যবান, তার কারণ বাংলা কাব্যে এলিঅট প্রমুখ প্রভাবিত ধারার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করেই তিনি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছিলেন। প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৩২ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ), ১৯১৮ সালে প্রকাশিত 'The New Poetry' নামে একটি সংকলন গ্রন্থের আধারে প্রবন্ধটি রচিত। 'আধুনিকতার তত্ত্ব' নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়'; তাঁর মনে হয়েছে 'বিশুদ্ধ আধুনিকতা···বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গত ভাবে দেখা।' তিরিশের দশকের বাংলা কাব্যে আধুনিকতার স্বরসঞ্চারে মুখ্য ভূমিকা ছিল এই 'নৈর্ব্যক্তিকতা'র, এই 'ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গত ভাবে দেখা'র।

নৈর্ব্যক্তিকতার সুর ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা তিরিশের দশকের কবিদের মধ্যেও। তাঁদেরও আগ্রহ বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে নির্বিকার ভাবে দেখার।

বড়বাজারের উপল উপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্···
ট্রাফিক থমকে দাঁড়ায়, উঁচোট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায়
পন্টুনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,

এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে,

বিষ্ণু দে-র এই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বক্তব্য এলিঅট থেকেই পাওয়া ঃ

Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought Death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet,
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint Mary Woolnoth kept the hours
With a dead sound on the final stroke of nine.*

জীবনানন্দ দাশের মতো তিরিশের দশকের রোমান্টিক কবিও নৈর্ব্যক্তিকতা আশ্রয় ক'রে বিশ্বকে নির্বিকার তন্গত ভাবে দেখেছেন ঃ

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ; সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে—টেরিটিবাজারে,
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।[৬]

ভিক্টোরীয় যুগের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ছেদ টেনে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির স্বর লাগিয়েছিলেন এলিঅট প্রমুখেরা। রবীন্দ্রনাথ সে-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন : 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এই জন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়।' রবীন্দ্রনাথ আরো লক্ষ্য করেছিলেন, 'আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই।' আধুনিক কবিদের মনে 'বিশ্বের প্রতি উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি', তাও রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। আঙ্গিক এবং প্রকরণ নয়, ১৯১৩-এর ইংরেজি কাব্য-আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা, রীতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কিত মূল লক্ষণগুলি বিশ্বকবির দৃষ্টিতে পুরোপুরিই যে ধরা পড়েছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আসল কথা, শিল্পবিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ; প্রাচীন সংস্কার, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছিল। ফলে রোমান্টিক ধারার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ কাব্যরীতিকে আশ্রয় ক'রে বিশ শতকীয় পরিবর্তিত সংস্কার বিশ্বাস এবং মূল্যবোধই ভাষারূপ পেল। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে ইয়োরোপীয় তথা ইংলণ্ডীয় হাওয়া-বদলের ছোঁয়া লাগল বাঙালী মানসেও ; বাঙালীর সংস্কার, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধেও চিড় ধরল। তাই তিরিশের দশকের বাঙালী কবিরাও আশ্রয় করতে চাইলেন বস্তুনিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিভঙ্গি আর ধ্রুপদী (classical) কাব্য-রীতি। তাঁদের কাব্যেও স্পষ্টতঃই ফুটে উঠল 'বিশ্বের প্রতি উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি', আধুনিকের ধর্ম মেনে নেওয়া তাঁদের কাব্যও 'সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই।' এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এলিঅটের 'Preludes' কবিতার সাক্ষ্য মেনেছেন। তিরিশের দশকের কবিদের রচনা থেকেও অনুরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে :

ঝর্ ঝর্ ঝর্
সারারাত শ্রাবণের নির্গলিত ক্লেদরক্ত বৃষ্টির ভিতর
এ-পৃথিবী ঘুম স্বপ্ন রুদ্ধশ্বাস
শঠতা রিরংসা মৃত্যু নিয়ে
কেমন প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সংগীতে
মুখের ব্যাদান সাধ দুর্দান্ত গণিকালয় — নরক শ্মশান হ'লো সব।[৭]

কিম্বা,

তোমাকে রাখিয়া দূরে তবে মোর চিত্ত প্রাণ রাখে।
তোমাকে দেখিলে রীরি করে মোর গ্রন্থি স্নায়ুশিরা।
তোমার নিঃশ্বাস হানে বিষবাষ্প মোর নাসিকাকে।
তোমার কথায় মোর বুদ্ধি পায় পক্ষাঘাত পীড়া।

তুমি ক্লিন্ন অস্থিহীন পিচ্ছিল স্বেদাক্তত্বক সাপ।
পিত্তস্রাবী স্পর্শ পাই তোমার ও মেদাক্ত আঙুলে।
সামুদ্রিক পীড়া তুমি, তাই সারা দেহ ওঠে দুলে,
ঘৃণার শ্বেতোর্মিস্পর্শে পূণ্য হয় উদ্‌গারের পাপ।[৮]

প্রাচীন মূল্যবোধ ভেঙে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক কিম্বা জীবনের যে-জিনিষগুলি ছিল একদা শ্রদ্ধার এবং আস্থার, তিরিশের দশকের কবিদের কাছে তাই হল হাস্যকর নিরর্থক।[৯] 'উদ্ধত অবিশ্বাস আর কুৎসার দৃষ্টির' পাশাপাশি ব্যঙ্গের তির্যক দৃষ্টিও ভর করল আধুনিক কবিতায়। এলিঅটের প্রুফ্রকের মতো আধুনিক কাব্যিক চরিত্রেরা (Persnoa) নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করে। সমর সেনের স্বাভাবিক দক্ষতা এই রীতিতে ঃ

একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি।
দারুণ গ্রীষ্মে অভীপ্সা-ব্যাকুল মন
তোমার আদেশে শহরের দিগ্বিজয়ে ঘোরে
তোমার আদেশে সন্ন্যাসীর সাধনা-সঙিন দিনগুলি
যুবতী-সঙ্কুল আসরে
সান্ধ্য-সঙ্গীত সংহত।
প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
এসেম্‌ব্লি-হলে বিরহছলে মিলন আনো,

প্রবীণ কবির মুখে আবার আনো
স্বদেশী গান।[১০]

'বিশ্বের প্রতি উদ্ধত অবিশ্বাস আর কুৎসার দৃষ্টি' কিম্বা ব্যঙ্গের তির্যক দৃষ্টির মূলে ছিল আত্মসচেতনতা; বিশ শতকীয় যুগ, সমস্যা এবং পরিবেশ সম্পর্কে এই সচেতনতা এক নিঃসঙ্গ ত্রিশঙ্কু মানসিকতা এনে দিয়েছিল আধুনিক কবিদের মনে।[১১] প্রাচীন আদর্শ ও চিন্তাধারার সঙ্গে বাস্তবের গভীর অমিল বিশ শতকের কবিদের বিদ্রূপ ও পরিহাসমুখর করেছিল। যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলালের কবিতায় এই বিদ্রূপ ও পরিহাস স্থান পেয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের মধ্যে এর তীব্রতা খুব বেশি অনুভূত হয়েছে; কিন্তু তাহলেও সম্ভবতঃ তিরিশের দশকের বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির এঁরা পূর্বসূরী নন। এঁদের বিদ্রূপের সুর ছিল অনুযোগ মূলক, সে-অনুযোগ ঈশ্বর বা স্রষ্টার বিরুদ্ধে। তিরিশের দশকের কবিদের কবিতায় অনুযোগের সুর অনুপস্থিত, বিদ্রূপ এখানে নিজেরই অসহায় ও ত্রিশঙ্কু অবস্থার প্রতি। যে-আত্মসচেতনতা থেকে নিজেকেই নিজে উপহাস্যপদ করে তুলতে ইচ্ছে জাগে, তিরিশের দশকের বাঙালী কবিদের মধ্যে সেই আত্মসচেতনতা এলিঅট থেকেই সংক্রমিত।'

> The Eliotites were a minority…We were among the few, and so we were self-concious, but in isolation, somewhat like Prufrock, or like that man who did not commit the fornification.[১২]

বিশ শতকীয় ত্রিশঙ্কু মানুষের প্রতীক প্রুফ্রক নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলেছে :

> And when I am formulated, sprawling on a pin,
> When I am pinned and wriggling on the wall,

এলিঅট সংক্রমিত আত্মসচেতনতা সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিকে অনুরূপ বিশ শতকীয় নিঃসঙ্গ মানসিকতায় উপনীত করেছে : 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'। অনিকেত ত্রিশঙ্কু মানসিকতায়ও অনিবার্যভাবে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা।

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে

নিরন্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশঙ্কু এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ।[১৩]

বিষ্ণু দে-ও সচেতন এই ত্রিশঙ্কু মানসিকতা সম্পর্কে :

অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা ?
এ মরা শহরে নীড়সন্ধানী মন
হারাল চতুর উভচর দিশী তার।
চিরকাল কাকতালীয়ের যাওয়া-আসা।
কোন প্রারব্ধে করেছে সমর্পণ
বহুধাভক্ত ত্রিশঙ্কু তার ভার।[১৪]

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের কবি ব'লেই সমর সেনের কবিতায় বিংশ শতাব্দীর মানবের অধিকতর রূঢ় ও করুণ ছবি ফুটেছে :

বৃদ্ধ মহাকাল
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এসেছে জরার যন্ত্রণা
তাই তো গলিত দেহের উপরে গভীর রাত্রে ঘোরে
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুন,
নিষ্ফল দিন কাটে ক্ষয়রুগীর কামার্ত প্রার্থনায় :
তাই ঘরে ব'সে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই ;
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।[১৫]

বিশ শতকের মানুষ প্রকৃতির শান্তির নীড় ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে যেখানে শান্তি নেই সেই নগরের খোপে-খোপে। নগর জীবনে প্রকৃতির নয় যন্ত্রের প্রাধান্য, তাই

নাগরিকদের মধ্যে প্রাধান্য পেল যান্ত্রিক মানসিকতা, স্বতঃস্ফূর্ত সরল জীবন নয় দিনচর্যায় চেপে বসল যান্ত্রিক অভ্যাসের কৃত্রিমতা। রোমান্টিকোত্তর কবিতায়ও দেখা গেল নগর জীবনের রূপায়ণ, যান্ত্রিকতার প্রাধান্য। এলিঅট নগর জীবনের পাঁচালিরকার, বিষ্ণু দে-সমর সেন প্রমুখেরাও তাই।

বাসের সামনে ভিখিরীরা ভিড় করে;
হাওয়ায় মেঘের শব্দ,
আর বৈশাখের বৃষ্টিতে ভেজা অপরূপ শহর।
মোটরের সীটে দেখে শনিবারের বিলাস,
হর্নের আকস্মিক শব্দে
চকিত ভোলে অমর আত্মার গাম্ভীর্য
মুহূর্তে মুখর রাস্তা পারাপার করে।
রসিদ সামাদের কথা অমৃত সমান
পরস্ত্রী কাতর চোখে অস্পষ্ট দেখে
মাঠের অন্ধকারে প্রেমিক ফিরিঙ্গিদের ভিড়,
আর ব্যর্থতায় বিরস দিনগুলি কাটে।[১৬]

বুদ্ধদেব বসুর 'উদ্বাস্তু' কবিতায় আছে,

মনোহর পুকুরের মোড়ে
যেখানে হিন্দুস্থান পার্কের আকস্মিক আরম্ভ কিংবা শেষ,
সেখানে ফুটপাতের উপর
শুয়ে আছে একজন—বলতেই হয় মানুষ, একজন স্ত্রীলোক,
যেহেতু অন্য কোনো নাম নেই।
দৃশ্যটাকে খুব বেশি মৌলিক বলা যায় না কলকাতায়,
কিন্তু তার মধ্যেও এটা একটু চোখে পড়ার মতো।
গুছিয়ে শুয়ে আছে, মনস্থির ক'রে,
জন্তুরা যেমন জায়গা বেছে নেয় জঙ্গলে
খেতে, ঘুমোতে, মরবার জন্য।
গায়ে মুড়ি দিয়েছে চট,
ছেঁড়া একটা কাঁথাও আছে তলায়।
শিয়রে কানা-ভাঙ্গা হাঁড়ি, ন্যাতার মতো গামছা।[১৭]

যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে যন্ত্রের ছন্দও বিশ শতকের কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।[১৮]

বিশ শতকের কবিদের রচনায় যন্ত্রের চিত্রকল্প বাস্তবতার সুর প্রগাঢ় করেছে, আধুনিকতার সুরও।

At the voilet hour, when the eyes and back
Turn upward from the desk, when the human engine waits
Like a taxi throbbing waiting,
I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,

অভিন্ন চিত্রকল্পের ব্যবহার দেখা যায় বিষ্ণু দে-র কবিতায়ও। তাঁর 'প্রথম পার্টি' কবিতায় আছে,

সত্যই কি পৃথিবীর আনন্দমন্থন,
বাইশটি বসন্তের সঞ্চিত সঙ্গীত
আমার স্নায়ুতে এসে কাঁপে থরো থরো
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাক্সির মতো ?[১৯]

'সাত ভাই চম্পা' কাব্যগ্রন্থের 'কোড়া' কবিতায়ও আছে অনুরূপ চিত্রকল্প :

নীড়মুখী পাখির মতন
মৃত্যুহীন সমুদ্রের রন্ধ্রহীন প্রাণের আবেগে
কলকাতার শূন্যপথে, ঊর্ধ্বশ্বাস নেভানো ট্যাক্সিতে
প্রাণের মর্মরে থরো থরো নৈব্যক্তিক বেগে
বিদ্যুৎ আবেগ জাগে উদ্ভাসিত দেশ,
(আসন্ন সমাজে কাঁপে ঘুমন্ত জনতা),
অদৃশ্য আঁধারে কাঁপে
অবশ্যম্ভাবিতায় বীজকম্প্র সুনীল আঁধারে,
বর্ষার ফল মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন।[২০]

যন্ত্রসভ্যতার অনুপ্রবেশের ফলে বিশ শতকের মানসিকতায়, চিন্তাধারায়ও আমূল পরিবর্তন এসেছে। প্রাচীন অদৃষ্টনির্ভর মানসিকতা যন্ত্রনির্ভর মানসিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে। যিনি যতবড় প্রতিভাধর কবি তাঁর কাব্যে ততো সার্থক ভাবে রূপায়িত এই রূপান্তর, এই মানসিকতা।[২১] এলিঅট বিশ শতকীয় মানসিকথার রূপান্তরের সার্থক রূপকার। যন্ত্রসভ্যতা, যান্ত্রিক মানসিকতা, যান্ত্রিক দিনচর্যা, জৈব অভ্যাস প্রভৃতির সামগ্রিক ছবি ধরা পড়েছে তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' ও অন্যান্য কবিতায়। অনুরূপ যান্ত্রিক মানসিকতা এবং জীবন-চর্যার ছবি ফুটে উঠেছে তিরিশের দশকের বাঙালী কবিদের কাব্যে।

তাঁদের চোখেও বিশ শতকীয় 'ভালোবাসা প্রাকৃতিক', তাঁদের কাব্যিক পার্সোনারও অকপট অভিব্যক্ত :

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি, তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।
অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি ;[২২]

এলিঅটের কাব্যের টাইপিস্ট মেয়েটিও যান্ত্রিক অভ্যাসে বলে : 'Well now that's done : and I'm glad it's over.'[২৩]

৪

রবীন্দ্রধারার কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রচিত হয়েছে ভাষারীতির ক্ষেত্রেও। রোমান্টিক যুগের কবি রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব গীতিধর্মী (lyrical) বাতাবরণেই লালিত। তাই কবিজীবনের একেবারে অন্তিম পর্বেও তিনি তাঁর কবিতা থেকে গীতিধর্মীতা বিসর্জন দিতে পারেন নি।

বাঁশি বাজে কানাড়ায় সুগভীর তানে
সপ্তর্ষির ধ্যানের আহ্বানে।
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত সুখ স্বপ্নখানি
সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি।
বসন্তপঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাজি,
সুরে সুরে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি ;
পুষ্পিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে
মঞ্জীরে বসন্তরাগ উঠিতেছে কেঁপে।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্বে রচিত একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই চরণগুলি গদ্যকবিতার ছন্দে রচিত হলেও এদের কাব্যধর্মিতা অনস্বীকার্য। কথ্যরীতি এই চরণগুলিতে যথাযথ ফুটে ওঠে নি। এর পাশাপাশি সমসাময়িক কালে রচিত তিরিশের দশকের কবির কোনো কবিতা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিলে কথ্যধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য সহজেই অনুভূত হবে।

তন্বী! পৃথুল পৃথিবী তোমাকে ডাকে
সভ্য লোভের প্রবল স্বার্থে, হে বন্দিনী!
কারো দোষ নেই, অসহায়, বলো দুষবে কাকে?
তুমি তো জেনেছ আমাকে, আমিও তোমাকে চিনি।

আমাদের পথ দক্ষিণে বামে ত্রিশূল টানে,
তুমি ভেসে যাবে কালের তুচ্ছ সচ্ছলতায়।
তবুও তুষারহ্রদ উচ্ছল তোমার গানে
চিরকাল, জেনো, শ্রেণীস্বার্থের অতীত কথায়।[২৫]

উভয় কবিই অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার ক'রে ছন্দের একটা ক্ষীণ বন্ধন মেনে নিয়েছেন কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিতে উভয় কবিতার প্রভেদ কত গভীর! প্রথমটিতে আধুনিক কথ্যরীতি ফোটেই নি, অন্যটিতে আধুনিক কথ্যরীতিই প্রাণসঞ্চার করেছে।

এলিঅট নিজে বিশ্বাস করতেন, **Every revolution in poetry is apt to be, and sometimes to announce itself as, a return to common speech.**[২৬] কথ্যভাষা জীবন্ত ব'লেই কালান্তরে তার সঙ্গে সাহিত্যের রুদ্ধগতি সাধুভাষার ব্যবধান সৃষ্ট হয়। তখন স্রষ্টাদের যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে প্রাণের যোগ ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আন্দোলনে নামতে হয় কোমর বেঁধে। এমনি আন্দোলনে নেমেছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজ, এমনি আন্দোলনেরই শরিক এলিঅট কিংবা পাউণ্ড। বাংলা সাহিত্যেও প্রথম মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী কালেই অনুরূপ আন্দোলনে নেমেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, আর বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা নেমেছিলেন তিরিশের দশকে। এলিঅট তাঁর সমসাময়িক কাব্য-আন্দোলন (তিনি নিজেও এই আন্দোলনের শরীক) সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে,

> **I suppose that it will be agreed that if the work of the last twenty years is worthy of being classified at all, it is at belonging to a period of search for a proper modern colloquial idiom.**[২৭]

১৯৪২ সালে উক্ত এই মন্তব্যের 'বিগত বিশ বৎসর' বলতে এলিঅট স্পষ্টতঃই বিশের ও তিরিশের দশকই বুঝিয়েছেন। এই দুই দশকে তাঁর নিজেরও প্রুফ্রক কবিতাবলী ব্যতীত অধিকাংশ কবিতাই রচিত। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের আধারেই বলা চলে, তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই বিশ শতকীয় উপযুক্ত কথ্যরীতি অনুসন্ধানের ক্লেশলক্ষণ বিধৃত। আর উপযুক্ত মন্তব্য থেকেই সিদ্ধান্ত আসে, বিশ শতকের সুর কিংবা আধুনিকতার সুর কবিতায় ধরা পড়েছে তার কথ্যরীতির মধ্যেই। কবি (ডক্টর) অমিয় চক্রবর্তী সোজাসুজিই বলেছেন সে-কথা :

> **Here, I think, is the key to the technique of modern poetry. A determined and inflexible resolve to make poetry live the life of an ordinary day, to make it dwell on subjects of our**

normal emotive life, and then as a consequence, a similar resolve to make poetry talk in our own conversational language.[২৮]

আধুনিকতার সুর ফোটাতেই তিরিশের দশকের বাঙালী কবিদের কথ্যভাষারীতি আশ্রয় করতে হয়েছে, আর কবিতাকে সমৃদ্ধ করতে হয়েছে দৈনন্দিন জীবন চর্যার বিষয়বস্তু দিয়ে। কথ্যরীতি-আশ্রয়ী কবিতা রচনায় স্বাভাবিক দক্ষতা কবি সমর সেনের, সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছাতিতুচ্ছকেও কবিতার অঙ্গীভূত করণে তিনি সিদ্ধহস্ত।

কালসন্ধ্যার এই কুটিল লগ্নে
রাস্তায় হাসির গররায় ঘোরে তুখোড় ইয়ারের দল,
রেস্তহীন গুলিখোর গেঁজেল মাতাল ;
অবশেষে শূন্যের সরাইখানায়
ভ্রাম্যমান বিলোল দিন অদৃশ্য হয়,
পিছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ,
কয়েক প্রহরের নিশাচর শান্তি।[২৯]

রোমান্টিক কবিস্বভাব এবং আংশিক সাধুরীতির প্রতি দুর্বলতা নিয়েও জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় কথ্যরীতি সঞ্চারে সফল হয়েছেন :

কখন সে বাজেট-মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস, মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলো ;
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা, বেদুইন, সমুদ্রের তীর,
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি—সান্টাক্রুজে সব চেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর ?[৩০]

দেখা যাচ্ছে তিরিশের দশকের কবিরা প্রাতিস্বিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়েও অধিকাংশই আধুনিক প্রবণতায় সমধর্মী—কথ্যভাষারীতি তাঁদের অনন্য আশ্রয়।

৫

এলিঅট তাঁর বিভিন্ন কবিতায় কতকগুলি অভিনব কাব্যপ্রকরণ ব্যবহার করেছিলেন। এলিঅট-সৃষ্ট এবং ব্যবহৃত এই সমস্ত কাব্যপ্রকরণ তিরিশের দশকের কবিতায় ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয় কাব্যে আধুনিকতা প্রতিপাদনের জন্য। এখানে তাদের কয়েকটির প্রয়োগরীতি দেখানো হল। এই সমস্ত কাব্যপ্রকরণ এখনো বাংলা অলঙ্কার শাস্ত্রে স্থান পায়নি, তাই নামকরণ দিয়ে চিহ্নিত করারও প্রয়াস কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এখানে কয়েকটির নামকরণের প্রস্তাব দেওয়া হল।

অন্যপূর্বা চিত্রকল্প: যে-সমস্ত পূর্বসূরী কবির রচনা ধ্রুপদী (classical) মর্যাদায় ভূষিত তাঁদের বিখ্যাত চরণ (বা চরণসমষ্টি) বিশেষ ব্যঞ্জনা (কখনো-বা তির্যক দৃষ্টি) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিকৃত বা অবিকৃত ভাবে ব্যবহার ক'রে ঐ সমস্ত চরণের ব্যঞ্জনা বা প্রতীক মূল্যটুকু স্বীয় কবিতায় সঞ্চার করায় একটি রীতি বা প্রবণতা দেখা যায় এলিঅটের কাব্যে। শেকসপিয়ার, মিল্টন, গোল্ডস্মিথ, স্পেন্সার প্রমুখের কাব্যচরণ অনুরূপ ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' কাব্যে। 'দি টেম্পেস্ট'-এর Those are pearls that were his eyes এবং This music crept by me upon the waters চরণ দুটি অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করেছেন এলিঅট; কিন্তু The barge she sat in, like a burnished throne এবং Weeping again the king my father's wreck চরণ দুটি বিকৃত ভাবে The chair she sat in, like a burnished throne এবং Musing upon the king my brother's wreck রূপে ব্যবহার করেছেন।

বিষ্ণু দে এবং সমর সেনের অন্যপূর্বা চিত্রকল্পের প্রতি দুর্বলতা দেখা যায়। তাঁদের কাব্যে এর ব্যাপক প্রয়োগ। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের 'বেকারবিহঙ্গ' এবং 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতায় 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর' এবং 'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর' চরণ দুটি অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের 'রামধনু' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?' এবং 'যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে' চরণ দুটি অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি / ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী!' বিষ্ণু দে বিকৃতভাবে ব্যবহার করেছেন তার 'শিখণ্ডীর গান' কবিতায়

'কথকতা' অংশে 'ওরে যাত্রী গেছে কেটে যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি।' আবার রবীন্দ্রনাথের

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।

বিষ্ণু দে-র 'কবি কিশোর' কবিতায় বিকৃতভাবে ব্যবহৃত :

কোন্ ক্ষণে
মননের সমুদ্রমন্থনে
রূপ নেবে এক নারী
মনোময় প্রাণপথে সংসারের কারা আর তপ্ত শয্যা ছাড়ি।

সমর সেন বিষ্ণু দে-র কাব্যচরণও অন্যপূর্বা চিত্রকল্পরূপে ব্যবহার করেছেন। পূর্বসূরীর চরণের বিকৃত ব্যবহারের সাহায্যে চিত্রকল্প সৃষ্টির প্রবণতা তাঁর বেশি। রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি', ও 'যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' সমর সেনের কবিতায় হয়েছে 'মধ্যাদিনে গান বন্ধ করে পাখি' ('ক্লান্তি') ও 'যৌবনের উচ্ছল দিনগুলি' ('শেষ সন্ধ্যা')।

প্রয়োগ-পার্থক্য বোঝাতে অন্যপূর্বা চিত্রকল্পকে অবিকৃত ও বিকৃত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।[৩১]

উ প চ্ছা য়া চি ত্র ক ল্প : কবি-চাতুর্যে কখনো-কখনো অনুসূরীর কবিতায় পূর্বসূরীর কোনো-কোনো কবিতার ছবি উপচ্ছায়ার (penumbra) মতো ভেসে ওঠে, এই ধরনের চিত্রকল্পকেই বলা যেতে পারে উপচ্ছায়া চিত্রকল্প।

সুধীন্দ্রনাথের 'কৈফিয়ৎ' ('ত ন্বী') কবিতার

সুদূর শতাব্দী শেষে, জানি আমি, কোনও সপ্তদশী
আমার পুঁথির পানে নতমুখে বাতায়নে বসি,
লবে না উদ্দীপ্ত করি ম্রিয়মাণ দিনান্তের কালি,
সমব্যথাপরিপ্লুত দীর্ঘ নেত্রে প্রেমদীপ জ্বালি!

কিংবা বুদ্ধদেব বসুর আর-কিছু নাহি সাধ ('পৃ থি বী র প থে') কবিতার

একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী লীলাচ্ছলে—
মনে জানি —পড়িবে না আমার কবিতাখানি
জ্যোৎস্নাধৌত বাতায়ন-তলে ;

এই চরণগুলির পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের '১400 সাল' কবিতার ছায়া স্পষ্ট অনুভূত হয়।

বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা' কবিতার

স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘরজনীর সবিতা।

চরণগুলির পশ্চাতে অনুভূত হয় রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা-কণিকাটির ছায়া :

স্বপ্ন আমার জোনাকি
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা।

এলিঅট এই ধরনের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন 'দি ও য়ে স্ট ল্যা ন্ড'-র দ্বিতীয় অধ্যায়ের গোড়ায়। এই অংশে 'এন্টনী এ্যা ন্ড ক্লি ও পে ট্রা' নাটকের ক্লিওপেট্রার বর্ণনার ছায়া অনুভূত হয়। অনুরূপ ভাবেই তৃতীয় অধ্যায়ের গোড়ার দিকের বর্ননায় ফার্ডিনান্ড-এর সম্মুখে এরিয়েল-এর গান করার দৃশ্যটির ছায়া ফুটে উঠেছে।

অ ন্য পৃ ষ্ট চি ত্র ক ল্প : বিশেষ ব্যঞ্জনা বা অর্থবহ শব্দ (বা শব্দাবলী) প্রয়োগের সাহায্যে কোনো বিশেষ উপাখ্যান বা প্রসঙ্গের ছবি ফুটিয়ে তোলা।

এলিঅটের 'Sweeney Among the Nightingales' কবিতায় when Agamemnon cried aloud চরণের 'আগামেমনন', Prufock কবিতার I am Lazarus, come for the dead চরণের 'ল্যাজারাস' এই ধরণের চিত্রকল্পের উদাহরণ '

বুদ্ধদেব বসুর 'দায়িত্বের ভার' কবিতায় 'সব যেন, বৃহদারণ্যের মতো 'তর্ক-পরায়ণ' চরণে 'বৃহদারণ্য' কিংবা 'আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১' কবিতায় 'যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবর যুবতী'-এর মধ্যে অন্যপৃষ্ট চিত্রকল্পই লুকিয়ে আছে।[৩২]

উ ৎ ক লি ত চি ত্র ক ল্প : সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত এবং বোধ্য নয় এমন ভাষান্তরের উৎকলিত চরণ ব্যবহারের দ্বারা বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতেন এলিয়ট। তিনি ব্যবহার করতেন গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালী, ফরাসী কিংবা জার্মান

ভাষায় উদ্ধৃত। বিষ্ণু দে প্রমুখেরা ব্যবহার করেছেন সংস্কৃত। বিষ্ণু দে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'বহুবড়বা ১৯৪৬-৪৭' কবিতায় 'ও' উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ,' 'সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েতেতি', 'সোঽবিভেত্তস্মাদ্‌! স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ', 'একাকী বিভেতি' এবং 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ/ লেলিহরসনা' প্রভৃতি এর উদাহরণ। সমর সেনের 'নাগরিক' কবিতায় 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' অনুরূপ প্রয়োগ।

শব্দানুবৃত্ত বা শব্দাম্রেড়িত চিত্রকল্প: একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ঘুরে-ঘুরে আসার ফলে এক ধরনের ব্যঞ্জনাদ্যোতিত হতে দেখা যায় এলিঅটের কবিতায়। 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'nothing' শব্দটির আম্রেড়িত ব্যবহারে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে 'burning' শব্দটি আবৃত্ত হওয়াতে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা সৃষ্ট হয়েছে। তিরিশের দশকের কবিদের এই চিত্রকল্পটি বিশেষ প্রিয়। বুদ্ধদেব বসুর 'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে' কবিতায় আছে:

মনে হয়,
নেই,
ঘুম নেই, স্বপ্ন নেই, দিন নেই,
কিছু নেই—কিছু নেই—
শুধু এই ভালোবাসা,
শুধু এই ভালোবাসা ছাড়া,
আমার উন্মত্ত, তীব্র, আত্মহারা ভালোবাসা ছাড়া!

চরণানুবৃত্ত বা চরণাম্রেড়িত চিত্রকল্প: শব্দের মতোই চরণের আম্রেড়িত প্রয়োগ দ্বারাও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন এলিঅট, এই প্রকরণটি বিশেষ প্রিয় ছিল জীবনানন্দের। 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ডের' তৃতীয় অধ্যায়ে 'Sweet Thames run softly, till I end my song' চরণটি একাধিকবার আবৃত্ত হয়েছে। তৃতীয়বার আবৃত্ত হওয়ার সময় চরণটি ঈষৎ পরিবর্তিত। জীবনানন্দও এক-আধটি শব্দ বদলে দিয়ে চরণটিকে একাধিকবার আবৃত্ত করতেন। 'তোমাকে' কবিতায়,

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস,
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত:

কিংবা 'বোধ' কবিতায়,

মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন !
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন !
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন !

চরণানুবৃত্ত বা চরণাম্রেড়িত চিত্রকল্পের যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখা যায় 'ঈস্ট-কোকর' কবিতায় :

i. The time of the seasons and the constellations
The time of milking and the time of harvest
The time of the coupling of man and woman

ii. The houses are all gone under the sea.
The dancers are all gone under the hill.

iii. You must go by a way which wherein there is no ecstasy.
In order to arrive at what you do not know
you must go by a way...etc.

ধ্রুবপদকল্প চরণ (refrain) : প্রাচীন বাংলা কবিতার ধ্রুবপদের অনুসরণে স্তবক শেষে বিশেষ চরণ (চরণসমষ্টি) ঘুরে-ঘুরে আসে। 'প্রুফ্রক' কবিতার প্রথমার্ধে ধ্রুবপদরূপে এসেছে

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

আবার দ্বিতীয়ার্ধে ধ্রুপদ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে :

That is not it at all,
That is not what I meant, at all.

'ঈস্ট কোকর' কবিতায় In my beginning is my end ধ্রুপদকল্প চরণ।

'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যবহৃত ধ্রুপদকল্প চরণ HURRY UP PLEASE IT'S TIME-এর অনুরূপ অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'সার্বোক' কবিতায় ব্যবহার করেছেন, 'রাম নাম সত্ হ্যায়'। লক্ষণীয় অমিয় চক্রবর্তীও এলিঅটের ব্লক ক্যাপিটালস্-এর ধরণে অপেক্ষাকৃত বড় হরফ ব্যবহার করেছেন।

গেল
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,

চাতুড়ি আর হাপর ধারের (জাতা ছিল আমার).
দেহটা নিজস্ব।

রাম নাম সত্ হ্যায়
গৌর বসাকের পড়ে রইল ভরন্ত খেত খামার!
রাম নাম সত্ হ্যায়॥
দুচার পিপে জমিয়ে নস্য হঠাৎ ভোরে হলো অদৃশ্য—
ধরণটা তার ক্ষ্যাপারই—
হরেকৃষ্ণ ব্যাপারি।
রাম নাম সত্ হ্যায়...৩৩

জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতায় ধ্রুবপদের ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে এই দুটি চরণ ঃ

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

সমর সেনের 'একটি রাত্রের সুর' কবিতায় ধ্রুবপদ ঃ

বাতাসে ফুটেছে গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার

শিরোন্ধারণ (epigraph): মধুসূদনের যুগে বাংলা কবিতায় শিরোন্ধারণ প্রচলিত থাকলেও রোমাণ্টিক যুগে এই রীতি প্রশ্রয় পায় নি। এলিঅটীয় আদর্শে তিরিশের দশকের বাঙালী কবিদের মধ্যে শিরোন্ধারণ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। এলিঅট নানা ভাষার শিরোন্ধারণ ব্যবহার করতেন। বাঙালী কবিরা করেছেন মুখ্যত বাংলা সংস্কৃত এবং ইংরেজি। সমর সেনের 'একটি বুদ্ধিজীবী', 'রোমন্থন', 'খোলা চিঠি' , বিষ্ণু দে-র 'আইসায়ার খেদ', 'চৈতে-বৈশাখে' 'জন্মাষ্টমী', 'কবিকিশোর' এবং অমিয় চক্রবর্তীর 'সন্দীপ' প্রভৃতি কবিতায় শিরোন্ধারণ ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বগত ভাষণ (Parenthesis): এলিঅটের স্বগত ভাষণ ব্যবহারের ধরণে বিষ্ণু দে প্রমুখেরাও বন্ধনী মধ্যে তা ব্যবহার করেছেন। বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী', অমিয় চক্রবর্তীর 'লাল মনসা', 'আহুতি' এবং সমর সেনের 'রোমন্থন' কবিতায় স্বগত ভাষণ ব্যবহারের নজীর আছে।

৬

এলিঅটের কবিতায় একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিয়েছিল যে-দৃষ্টিভঙ্গিকে কবি মাইকেল রবার্টস অভিহিত করেছেন 'ইয়োরোপীয় কবি'র দৃষ্টিভঙ্গি বলে।[৩৪] এলিঅটের ভাষায় এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইতিহাস-চেতনা (historical sense)। ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

…the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence; the historical sense compets a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a felling that the whole of the litcrature of Europe from Homer and within it the whole of the literatuie of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order.[৩৫]

এলিঅটের এই ইতিহাস-চেতনা তিরিশের দশকের বাংলা কবিতায়ও আধুনিকতার সুরসঞ্চারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। স্বীয় ঐতিহ্যবাদ অনুযায়ী এলিঅট তাঁর কাব্যের পশ্চাৎপটে ইংলণ্ডীয় সাহিত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পাশাপাশি সমগ্র ইয়োরোপীয় সাহিত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে টেনে এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পশ্চাৎপটে ছিল কেবল ভারতীয় সাহিত্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য। তিরিশের দশকে ভারতীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি ইয়োরোপীয় ঐতিহ্যের অস্তিত্বও অনুভূত হল, অনুভূত হল একেবারে হোমার থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কালের বেঠোফেন-পিকাসো পর্যন্ত সমগ্র ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য। জীবনানন্দের মতো অন্তর্মুখী কবিও এলিয়টের ইতিহাস-চেতনার গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এর থেকেই তিরিশের দশকের বাংলা কবিতায় এই চেতনার গভীরতা সহজেই অনুমেয়।

তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা
ঈশার শবোত্থান—বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
হেগেল ও মার্কস : তার ডান আর বাম কান ধ'রে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিলো ,[৩৬]

বুঝতে অসুবিধা হয় না কবির এই চরণগুলির পাশ্চাৎপটে ভারতীয় পাশ্চাত্য ধর্মীয়-চেতনার আভাস আছে। ধর্মীয়-চেতনার পটভূমিতে স্থান পেয়েছে

'ভারতীয় তন্ত্রসাধনা, মরমিয়া সাধনমার্গ', 'বৌদ্ধধর্ম' এবং পাশ্চাত্যের ইহুদী তথা খৃষ্টধর্ম'। হেগেলের ডায়ালেক্টিক তত্ত্ব এবং মার্কস-এর সমাজবাদের ইঙ্গিতও নিহিত আছে কবিতাটিতে। শুধু ভারত কিংবা ইয়োরোপ নয়, সমগ্র বিশ্ব পরিসরের অস্তিত্ব অনুভূত হয় যেন এই চরণগুলিতে। অনুরূপ ইতিহাস-চেতনা দেখতে পাওয়া যায় 'সময়ের কাছে' কবিতায়।

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?[৩৭]

ইতিহাস-চেতনার কাব্যরূপায়ণ তিরিশের দশকের বিভিন্ন কবির কাব্যে ঘটলেও সম্ভবতঃ এই চেতনায় সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছেন বিষ্ণু দে, বাংলা কাব্যে এর রূপায়ণেও সার্বিক সাফল্য তাঁরই। তাঁর কাব্যসাধনায় একেবারে প্রথম পর্যায় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় দু'দশক ধ'রে এই চেতনার কাব্যরূপায়ণ চলেছে। এর থেকে এই চেতনার প্রতি কবির প্রগাঢ় অনুরাগ স্পষ্টতঃই অনুভূত হয়। গ্রীক, ইঙ্গ, ইয়োরোপীয়, মধ্য-প্রাচ্য, ভারতীয় প্রভৃতি সমস্ত ঐতিহ্যের সহাবস্থান ঘটেছে তাঁর কাব্যের পশ্চাৎপটে।

ও নয় সমুদ্রযাত্রী সপ্ত সমুদ্রের পারে
বাণিজ্য চণ্ডীর দীর্ঘ আরাধনা,
খালের পুঁটি কি দেখে কমলে কামিনী,
দাস পায় প্রভুর সাধনা ?
কোথায় চার্চিল কোথা সেসিল্ রুসেল
মাউণ্টবাটেন হেস্ অভিজাত ইংরেজের ফরাসীর
কোথায় তুলনা এই সোনার বাঙলায় ?
কেথায় নর্মাণ ক্ষিপ্র লুটেরার বংশধর সুজলা সুফলা
ভারতের নরম পলিতে হারুণ আল্‌রসিদও স্বপ্ন—
এখানে কিছুই নেই সামন্তবিলাস শুধু ধোঁয়া
আবুহোসেনের স্বপ্ন এখানে বাহিনী শুধু ফাঁকি
বহুরের স্ফীতি আর পানাহার নারীর দেহের শুধু নির্লজ্জ সন্ধান
এখানে বুর্জোয়া বাবু নববাবু, ব্যবসা চালাকি,

সাম্রাজ্য বন্ধুদ, সার্থক জনম মাগো

হুতোমের খেয়াল অদ্ভুত, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।[৩৮]

এলিঅটের অনন্ত এবং ক্ষণিক সময়-চেতনারও একটা সম্পর্ক আছে ঐতিহ্যের সঙ্গে, তাঁর ধারণায় ইতিহাস-চেতনা কাল-চেতনারই নামান্তর।

> This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional.[৩৯]

এলিঅটের এই সময়-চেতনাই সম্ভবতঃ আধুনিক কাল-চেতনা সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 'বরন্‌ট্‌ নর্টন'-এর অনবচ্ছিন্ন নিরন্তর কাল-চেতনার উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছে। কাল-সম্পর্কিত অনুরূপ আধুনিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের মধ্যেও। এলিঅটের

> The present and time past
> Are both perhaps present in time future,
> And time future contained in time past.[৪০]

এই কাল-চেতনাই তিরিশের দশকের কবিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। জীবনানন্দের 'আবহমান' কবিতায়

> আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
> কাচের গেলাসে জলে উজ্জ্বল শফরী;
> সমুদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো;
> তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
> যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব এক সাথে প্রচারিত হবে।[৪১]

'বরন্‌ট্‌ নর্টন'-এর 'What might have been and what has been/ Point to one end, which is always present চরণদ্বয়ের অনুরণনই যেন শোনা যায় জীবনানন্দের চরণটিতে 'যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব একসাথে প্রচারিত করে।' 'সিন্ধুসারস' কবিতায় অনুরূপ চেতনাই ভাষা পেয়েছে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে :

> জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে? মরে গেছে অনেক নৃপতি?
> অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো নাকি? অনেক গহন ক্ষতি
> আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি;

ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান।[৪২]

এলিঅটীয় কাল-চেতনা ধরা পড়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' কবিতায় ঃ

অতীত এখনো ফুরিয়ে যায়নি, ভুলো না,
যে-অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভবিষ্যৎ ;
যাবে, হবে, ফিরে পাবে।[৪৩]

স্পষ্টতঃই এলিঅটের '.. time future contained in time past' উপলব্ধিই ভাষা পেয়েছে বুদ্ধদেব বসুর যে অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভবিষ্যৎ।' 'নস্টালজিয়া' কবিতায় অনুরূপ উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে রূপকের আশ্রয়ে ঃ

মনে হয় আমার গাত্রবাস যেন অতীত, আর ভবিষ্যৎ
আমার পায়চারি করার বারান্দা। আর বর্তমান এক
অন্তহীন পিঁপড়ের সারি, আমার পায়ে-পায়ে অনবরত ম'রে যাচ্ছে।[৪৪]

এলিঅটের কাল-চেতনার রূপান্তরহীনা অনবচ্ছিন্নতার দিকটি সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেও অনুভূত হয়। তিনিও বিশ্বাস করেন, 'অথচ সময় ভূত থেকে ভবিষ্যতে ধাবমান নয়।'

এলিঅটের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কাব্য আঙ্গিক তিরিশের দশকের বাংলা কবিতায়ও অভিনবত্বের অগ্রদূত। পার্সোনা সৃষ্টি, একক সংলাপ রীতি, নাটকীয় বেদ্যতা প্রভৃতি অভিনব কাব্য-আঙ্গিকগুলি বাংলা কাব্যে আধুনিকতারও সুরসঞ্চারী। এরা রবীন্দ্রোত্তর কবিতার বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত হয়েছিল। পার্সোনা (persona) সৃষ্টি ক'রে সার্থক কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে 'ওফেলিয়া', 'যযাতি,' 'টাইরেসিঅস',[৪৫] 'আমি তো গাঁয়ের লোক', 'কাসান্দ্রা' সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'জেসন' 'সংবর্ত', 'যযাতি' ; এবং বুদ্ধদেব বসু লিখছেন 'শিল্পীর উত্তর', 'সম্মিলন' প্রভৃতি। একক সংলাপ রীতিতে রচিত বুদ্ধদেব বসুর 'ম্যাল-এ' (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ), বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী' (পূ র্ব লে খ') প্রভৃতি কবিতা! 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' কবিতায় এলিঅটীয় নাটকীয় বেদ্যতার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে।[৪৬]

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১। 'Introduction to the First Edition' (Michael Roberts), The Faber Book of Modern Verse, p.15
২। সময় ও সাহিত্য, পৃ. ৪২
৩। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃ. ১৪
৪। 'টপ্পা-ঠুংরি,' চোরাবালি, পৃ. ৭৮-৮০
৫। Selected Poems, p. 53
৬। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ৯৭
৭। ঐ, পৃ. ১২৬
৮। 'বিবমিষা', চোরাবালি, পৃ. ৩৬
৯। 'All romance is dead, and the spiritual is a fantasy·' – English Literature Between the wars, p. 63
১০। সমর সেনের কবিতা, পৃ: ৫৭
১১। 'Eliot was especially impressed by Baudelaire's feeling for his age. Baudelaire's art represented an awareness of man's situation in the modern world'.— 'Baudelaire and Eliot,' T. S. Eliot: The Man And His Work, p. 100
১২। 'Mr. Eliot Among the Arjunas', T. S. Eliot, p. 97
১৩। 'যযাতি', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০২-৩
১৪। 'বেকারবিহঙ্গ', চোরাবালি, পৃ. ৫৫
১৫। 'একটি বুদ্ধিজীবী', সমর সেনের কবিতা, পৃ. ৫০
১৬। 'অখ্যাত নায়ক', ঐ, পৃ. ৪৭
১৭। বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১১৬
১৮। 'This is already in the tradition of the new style— the rhythm of the machine is there and it is part of

the greater actuality,…'—Modern Tendencies in English Literature, p. 7?

১৯। চোরাবালি, পৃ. ৬০

২০। বছর পঁচিশ, পৃ. ৪৪৮

২১। 'The test of genius within the period (between the wars) is largely the degree to which a writer has been able to convey into imaginative forms an awareness of how profound these changes have been.'—English Literature Between the Wars, p. 1.

২২। চোরাবালি, পৃ. ৩৩

২৩। The Waste Land, l. 25?

২৪। রবীন্দ্ররচনাবলী-৩, পৃ. ৯০০

২৫। 'চতুরঙ্গ', বছর পঁচিশ, পৃ. ৫০৬

২৬। Selected Prose, p. 58

২৭। Ibid, p. 66

২৮। Modern Tendencies in Eng. Lit. p. 66

২৯। সমর সেনের কবিতা, পৃ. ৬০

৩০। জীবনানন্দ দাশের শ্রে. ক. পৃ. ১০৮

৩১। সুধীন্দ্রনাথ অন্যপূর্বা চিত্রকল্পকেই 'বাক্যচোর্য' অভিধা দিতে চেয়েছিলেন (স্বগত, পৃ. ১৫৮)

৩২। 'পূর্বকথা-যুক্ত (এ্যালিউশান) শব্দ' ব'লে বোঝাবার প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়।—'বাংলা কাব্যে বিষ্ণু দে', দৈনিক বসুমতী, ৩১ আষাঢ় ১৩৮৬ (মফস্বল)

৩৩। পারাপার, পৃ. ৬২

৩৪। The Faber Book of Modern Verse, pp. 7-8

৩৫। The Sacred Wood, p. 49

৩৬। জীবনানন্দ দাশের শ্রে. ক. পৃ. ৮৭

৩৭। ঐ, পৃ. ১০৯

৩৮। নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, পৃঃ ৪৪

৩৯। The Sacred Wood, p. 48

৪০। Four Quartets, p. 7

৪১। জীবনানন্দ দাশের শ্রে. ক. পৃ. ৬৩

৪২। ঐ, পৃ. ৬৬-৬৭

৪৩। বুদ্ধদেব বসুর শ্রে. ক. পৃ. ১০৫

৪৪। ঐ, পৃ. ১৪৯

৪৫। সূচীপত্রে 'টাইরেসিয়স'। উত্তর পর্বে বিষ্ণু দে য়-তে স্বরধ্বনি সংযোজন না ক'রে শুদ্ধ একক স্বরধ্বনি ব্যবহারের পক্ষপাতী— —'এলিঅট', 'টাইরেসিঅস', 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' প্রভৃতি।

৪৬। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃ. ৩০৩



চার

এলিয়ট ও বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে-র কাব্য-অভিষেক এলিঅটীয় কাব্যবারিসিঞ্চনে, এমন দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্ততঃ সে-ঋণ স্বীকারে, কি কাব্য-বিচারে, কি কাব্য-অনুশীলনে দ্বিধা নেই বিষ্ণু দে-র। বর্তমান শতকের বিশের দশকে যৌবনের শুরুতেই তাঁর পরিচয় ঘটে এলিঅটের কবিতা এবং প্রবন্ধের সঙ্গে। সে-পরিচয় প্রভাবে রূপান্তরিত হতে বিলম্ব হয় নি এবং তা সর্বদা স্মরণে রাখতেও তিনি অকুণ্ঠিত চিত্ত :

It was on the basis of this slight familiarity that Mr. Eliot's 'Poems 1925' captured me completely and I was at first surprised and dazed. And continued to be, as it were, possessed, by this poetry.[১]

অনুরূপ অকপট স্বীকারোক্তির অনুরণন তাঁর নানা গদ্যরচনায়। এমনকি সাহিত্য-পাঠে তথা রচনায় আধুনিকতাবাদী ভারতীয় কবিদের 'অংসুদীক্ষা' যে এলিঅটীয় বীজমন্ত্রেই সে-বিষয়েও মুক্তকণ্ঠ উদ্‌ঘোষণায় তিনি পশ্চাৎপদ নন :

...Mr. Eliot teaching Indian writers how to write and how to read—not merely the literature of Europe, but that of India of Bengal...[২]

কেবল স্বীকারোক্তিতেই নয়, তাঁর কাব্যানুশীলনে এলিঅটীয় উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং এলিঅটীয় চিত্রকল্প বা বাক্-প্রতিমা স্বীকরণের মধ্যেও এলিঅটীয় প্রভাবেরই স্বীকৃতি। আর তা প্রথম বয়সের রচনাতেই নয়, পরিণত বয়সের রচনাতেও অনুভূত। দু-একটি কবিতার প্রাসঙ্গিক চরণের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণেই এর সত্যতা ধরা পড়বে।

'পূর্বলেখ'-এর 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটি কবির প্রথম বয়সের রচনা।[৩] যদিও

এলিঅটীয় রচনায় আলোড়িত হওয়ার কাল থেকে প্রায় এক দশকের ব্যবধানে রচিত, তাহলেও এলিঅটীয় আঙ্গিক তথা কাব্যরীতির বিভিন্ন প্রকরণ-ব্যবহারে কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। একটি স্তবক এখানে তুলে দিচ্ছি :

জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
চরণতলে
আমি অভাগ্য মানি,
বোসোই না, ওরা কেউই শুনছে না, এ দীন বলে
হয়তো আমিও উঠব ফুটে, এ দীন বলে
তোমার হাতের বাঙময় চাপে, রঙীন ঠোঁটের এককথায়,
রেশমী মেঘের একটুকু জলে
যেন কাকটুস গ্রান্ডিফ্লোরা।
কেউই ওরা
শুনছে না, শোনো, আবার কিন্তু এসো
আর চুপি চুপি বলি, একটুকু ভালো—
বেশ বেশ শুধু হেসো।
(রমার মুখের সরস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনের কালিমা
কাজের দিন।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন ?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস্ পেগ্।
লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-
এব্ল্ ইন্
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং ?
কাণে কাণে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
অলকা, আমার দিনরজনীর স্বপ্ন ভাসে

নিদ্রাহীন

পাঁচবছর, স্টালিনের মতো

—ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খসরু বেগ্ ?

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও 'জন্মাষ্টমী'র দৈর্ঘ্যের তুলনায় অংশটি নিতান্তই ক্ষুদ্র, একটি পূর্ণ স্তবকের অর্ধাংশ মাত্র। (লক্ষ্যণীয়, 'জন্মাষ্টমী' দৈর্ঘ্যে 'দি ও য়ে স্ট ল্যা ন্ড'-এর সমপর্যায়ভুক্ত তো বটেই, বরং চরণসংখ্যায় সামান্য ছাড়িয়েই গেছে।)

এলিঅটীয় আঙ্গিক তথা কাব্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির (অর্থাৎ কথ্যধর্মী বাক্‌ভঙ্গি, চরণের অসম দৈর্ঘ্য, অন্ত্যানুপ্রাসজাতীয় তথাকথিত কাব্যধর্মিতার প্রতি ঔদাসীন্য,* শব্দ ব্যবহারে প্রচলিত সংস্কার উল্লঙ্ঘন প্রভৃতি) অস্তিত্ব উদ্ধৃত চরণগুলিতে তো পাওয়া যায়ই ; তাছাড়াও এলিঅটীয় কাব্যরীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিও এই উদ্ধৃতিতে সুপ্রকট। এখানে তাদের কয়েকটি বিশ্লেষিত হল ঃ

ক. পার্সোনা সৃষ্টি ঃ 'প্রুফ্রক' বা 'জেরনশান' কবিতায় যে-ধরনের পার্সোনা বা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন এলিঅট তার সঙ্গে কবির কোনো সম্পর্ক নেই রোমাণ্টিক কবিতার মতো। এর ভূমিকা নৈর্ব্যক্তিক, আবেদন বস্তুনিষ্ঠ। তবে লক্ষ্যণীয়, অনুরূপ চরিত্রে কবির ব্যক্তিসত্তার আরোপ অসমীচীন হলেও এর তির্যক আক্রমের (approach) মধ্যেও কবির প্রকৃত প্রবণতাটুকু ধরতে সচেতন পাঠকের অসুবিধে হয় না। উদ্ধৃতাংশটি অনুরূপ পার্সোনারই সংলাপ।

খ. একক সংলাপ ব্যবহার ঃ ব্রাউনিং অনুসৃত একক সংলাপ (monologue) সার্থকভাবে প্রযুক্ত এলিঅটের 'প্রুফ্রক', 'জেরনশান,' 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' প্রভৃতি কবিতায়। উদ্ধৃতাংশে বিষ্ণু দে-ও তা ব্যবহার করেছেন, প্রতিপক্ষের সংলাপ অনুপস্থিত।

গ. অন্যপূর্বা চিত্রকল্প[৫] ঃ উদ্ধৃতাংশের এই চরণগুলিতে অন্যপূর্বা চিত্রকল্প সৃষ্ট হয়েছে ঃ

জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
চরণতলে
আমি অভাগ্য মানি,...

আভাসিত রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' ('চি ত্রা') কবিতার সংশ্লিষ্ট চরণগুলি ঃ

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি,
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া...

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বক্তব্য ও ব্যঞ্জনা (সাধনার ব্যর্থতা আরাধ্যার কৃপাদৃষ্টিপাতে সফল করতে ভক্তের আকুলতা) পশ্চাৎপটে রেখে স্বীয় কবিতার বক্তব্য ও ব্যঞ্জনাটুকু উজ্জ্বল ক'রে তুলতে উত্তর রৈবিক কবি কাব্য-চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছেন। সেইসঙ্গে তির্যকদৃষ্টির ফলশ্রুতিতে রাবীন্দ্রিক ব্যঞ্জনার ভক্তিমার্গীয় পবিত্রতা তথা সিদ্ধরস করা হয়েছে বিকৃত ও হাস্যাস্পদ।

ঘ. স্বগত ভাষণ (parenthesis): উদ্ধৃত স্তবকে এলিঅট অনুসৃত রীতিতে বন্ধনী মধ্যে স্বগত ভাষণ সংযোজিত।

আর চুপি চুপি, একটুকু ভালো—
বেশ বেশ শুধু হেসো।
(রমার মুখের সবস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনেব কালিমা
কাজের দিন।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন ?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)

ঙ. ঐতিহ্য হাস্যাস্পদকরণ: আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং যন্ত্রসভ্যতার প্রাদুর্ভাবে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইয়োরোপে ধর্ম, সমাজ, জীবন প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভেঙে পড়তে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মানসিকতায় ক্ষীণ আস্থাটুকুও রইল না, হয়ে উঠল উপহাসাস্পদ। ঈশ্বর, দৈব প্রভৃতি সংক্রান্ত আস্তিক্য-বোধের সঙ্গে অপার্থিব ও একনিষ্ঠ প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতিও আক্রান্ত ও উপহাসাস্পদ হল। বিষ্ণু দে প্রমুখ আধুনিক কবিদের এলিঅটসুলভ মানসিকতায়ও একনিষ্ঠ অপার্থিব প্রেম অবাস্তব কল্পনা, সতীত্ব প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ অলীক এবং উপহাসযোগ্য।

হয়তো আমিও উঠব ফুটে, এ দীন বলে
তোমার হাতের বাঙায় চাপে, রঙীন ঠোঁটের এককথায়,
রেশমী মেঘের একটুকু জলে
যেন কাকটুস্ গ্রাণ্ডিফ্লোরা। ·
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)

চ. আধুনিক জীবনের জটিলতা ও যান্ত্রিকতা: হৃদয়-ব্যাতিরেকী যান্ত্রিক বহু প্রণয়, ক্লাব-কাফের গতানুগতিকতায় প্রাণস্পর্শের অভাব, জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদরেখার বিলুপ্তি (টেনিস প্রসঙ্গে) কেবল এলিঅটীয় কাব্য-

ঐতিহ্যের প্রতিই নয়, আধুনিক সভ্যতা ও জীবনের যান্ত্রকতা ও জটিলতারি প্রতিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে।

ছ. অন্তঃসারশূন্যতা : 'দি হলো মেন', 'প্রুফ্রক', 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' প্রভৃতি কবিতায় এলিঅট আধুনিক মানবের যে অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, অনুরূপ অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ধৃত অংশে নায়কের মুখে লেনিন-স্টালিনের সপ্রতিভ উল্লেখ সত্ত্বেও অনুধাবনে পাঠকের অসুবিধে হয় না। লেনিন-স্টালিন আধুনিক মানবের মুখোশের মতো বাহ্য আবরণ, জিহ্বাগ্রের বিলাস।

জ. সর্বগ্রাহিতা (comprehensiveness) : উদ্ধৃতাংশে বিষয়ে ও বক্তব্যে এলিঅটের কবিতার মতো প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভেদরেখা মুছে গেছে - লেনিন-স্টালিনের উল্লেখ যেমন এক বিশ্বব্যাপকতা এনেছে, তেমনি 'রাজাস্ পেগ্,' 'রিমার্ক-এব্‌ল্,' 'ইন্‌টারেস্টিং,' 'কাক্‌টুস্ গ্রাণ্ডিফ্লোরা' প্রভৃতি ঐতিহ্যবিরোধী শব্দপ্রয়োগ ভাষার ক্ষেত্রেও ব্যাপকতা এনে দিয়েছে।

ঝ. উল্লেখপরায়ণতা (allusiveness) : বিষ্ণু দে-র কবিতাও এলিঅটের মতোই অনেক সময়ই উল্লেখ-ভারাক্রান্ত এবং 'জন্মাষ্টমী'-র উদ্ধৃতি অংশটিও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

ঞ. তির্যগ্‌দৃষ্টি : প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভেঙে পড়ায় সাবেকি সংস্কারের প্রতি আস্থাহীনত্ব জানাতে উদ্ধৃতাংশটিতেও তির্যগ্‌দৃষ্টি ভর করেছে।

ট. বৈদগ্ধ্য : এলিঅটের কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যার বাহন, তাই আস্বাদ্য কেবল সমধর্মা বিদগ্ধ ও মননশীলের কাছে। প্রকৃত প্রস্তাবেই এই কবিতা 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'। বিষ্ণু দে-র কবিতাও বৈদগ্ধ্যধর্মী এবং উদ্ধৃতাংশটিও।

ঠ. লিলি প্রসঙ্গ : উদ্ধৃতাংশের অন্ত্য চরণে লিলির অবতারণা আকস্মিক এবং 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে'র সঙ্গে নামগত সাদৃশ্য কাকতালীয় মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়।

এলিঅটের লিলি বিশ শতকের মহাযুদ্ধোত্তর জৈব বা দেহনির্ভর প্রেম-ভালোবাসার মূর্ত মানবী। প্রাচীন আদর্শ কিম্বা সংস্কারের নিগড়ে তার দাম্পত্য-জীবন বাঁধা পড়ে নি, তা তার কাছে জৈব অভ্যাসের পরিপূরক। হৃদয়হীন সামরিক পুরুষ অ্যালবার্টও তাকে প্রয়োজনপূর্তির উপকরণের বেশি মর্যাদা সম্ভবতঃ দেয় না।

...and think of poor Albert,

He's been in the army four years, he wants a good time,

And if you don't give it him, there's others will,···

বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই লিলি প্রতীক নারী। রবীন্দ্র-রোমাণ্টিক তিলোত্তমার ভাবমূর্তি অতিক্রম ক'রে সে রক্তমাংসের নারী। পরবর্তী একাধিক কাব্যে সে মহাযুদ্ধোত্তর দেহসর্বস্ব প্রেমের প্রতীক, এলিঅটীয় দ্যোতনারও ধারক। 'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স' কাব্যগ্রন্থে আবির্ভাব লগ্ন থেকেই লিলি বাস্তবের মানবী।

বাহুটি জড়িয়ে তাকে বলি,
তোমার চিত্তের, লিলি, চামেলিসৌরভ
যে মায়া ছড়ায় চেতনায়
সে মায়ায় ফুটে ফুটে ওঠে
পৃথিবীর পরম আশ্বাস।··
আগামী রাত্রির ছায়া নীড় বাঁধে শান্ত নির্নিমেষ
অনন্য সে পাণ্ডু মুখে তার। ('প্রজ্ঞাপারমিতা তাকে করে আশীর্বাদ')[৬]

আংশিক রোমাণ্টিক আচ্ছন্নতা থাকলেও স্বীকার করতেই হয় যে মুখের পাণ্ডুরতা আধুনিকতার মোক্ষম যুগচিহ্ন। 'গ্রীষ্ম' কবিতায় লিলি অধিকতর রক্তমাংসের নায়িকা।

অবসন্ন ব'সে দুইজনে।
কর্মহীন অবকাশ কর্কশ কঠিন গুমোটে
কাটে রৌদ্রতাপে।
আকাশ পৃথিবী আমবন
অদৃশ্য অস্পৃশ্য হল বর্ণহীন প্রদাহে রৌদ্রের।
শুধু লিলি; তোমার শরীর
মসৃণ কোমল পাণ্ডু মর্মর শীতল। ('গ্রীষ্ম')

প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায় সংগ্রামক্লান্ত অবসন্ন অসহায় মানুষের জৈব সান্ত্বনা কেবল লিলির পাণ্ডু অথচ রক্তমাংসের শরীরে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চো রা বা লি'-তেও লিলি প্লেটোনিক তথা রোমাণ্টিক প্রেম-বিরোধী মহাযুদ্ধোত্তর ত্রিশ দশকের জৈব নায়িকা। এলিঅটের নায়িকার মতোই তারও ভূমিকা ভালবাসার অভিনয়ের এবং তা নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ও আভ্যাসিক।

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি, তাইতো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি :
সহজের পেশা, আরামের নেশা, তাইতো আসি
তোমার শাড়ির ছটায়, কথায় কথায় হাসি - [৭]

অনুরূপ নিষ্প্রাণ আভ্যাসিক যান্ত্রিকতা এলিঅটেও দ্যোতিত ঃ

She turns and looks a moment in the glass,
Hardly aware of her departed lover ;
Her brain allows one half-formed thought to pass
'Well now that's done : and I'm glad it's over.'
When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smooths her hair with automatic hand,
And puts a record on the gramophone.[৮]

'শিখণ্ডীর গান (কথকতা [৯]'-এর লিলি প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ ঐ ঘটনারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ঃ

ডরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে,
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে বিচিত্র সন্ধ্যায়, ·

একথা অনস্বীকার্য যে বিষ্ণু দে-র লিলি তাঁর ডলু (মৈত্রেয়ী ঘোষ)-রমা-অলকাদেরই (অলকা বসু) একজন, কিন্তু ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো নয়, সে স্বতন্ত্র। তাই ডলু-রমাদের আবির্ভাব এক-আধটি কাব্যে এক-আধবারই। লিলির বিচরণ কিন্তু কবিতা থেকে কবিতান্তরে। কাব্য-কাব্যান্তরে মহাযুদ্ধোত্তর নায়িকার আদর্শ জাগরূক রাখতেই যেন তার অন্তঃশীল প্রবাহ। সর্বোপরি লিলিও এলিঅটীয় নায়িকাসুলভ মহাযুদ্ধোত্তর অনুর্বরতারই প্রতীক এবং সে-ভূমিকায় এলিঅটের লিলির যেমন প্রতিষ্ঠা অ্যালবার্ট প্রমুখ নায়কের বিপরীতে, বিষ্ণু দে-র লিলিরও তেমনি প্রতিষ্ঠা সুরেশ প্রমুখেরই বিপরীতে।

'পূ ব' লে খ' সমসাময়িক কিম্বা অদূর-পরবর্তী নয়, সার্ধ তিন দশক পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থেও বিষ্ণু দে-র এমন কবিতা সুলভ যাতে এলিঅটীয় প্রভাবের হদিশ সহজেই মেলে। 'ই তি হা সে ট্রা জি ক উ ল্লা সে' কাব্যগ্রন্থের 'আমৃত্যু চৈতন্যে' কবিতাটি অনুরূপ একটি রচনা।

চতুর্দিকে পোড়ো জমি, বিলাসী পশ্চিমা নয়, বিরিক্ত, আদিম।
বিদেশী-দেশীর তিন শতাব্দীর ভোজে-লেহ্যে-পেয়ে বিস্তৃত শিকার.

ফাঁপাফাঁপা মানুষদের সঞ্চয়াতিরিক্ত মৃত্যু ভূত নৃত্যে বাজায় ডিণ্ডিম
দেখি শুধু, যত চলি চতুর্দিকে রেখে গেছে বঞ্চনার দুরন্ত বিকার।...
ক্ষুধায় কাতর, শ্বাসরুদ্ধ, তৃষ্ণায় জর্জর, পথ বুঝি শেষ হল জগ্ধ
তেপান্তরে
অরণ্যের ভুক্ত-অবশেষে। বহুলোক, মেয়ে ও পুরুষ, বন্ধু শিশু খায়,
যেন দেয় হনো.
ভুরিভোজ পাথরে নুড়িতে, মরা আণব ধুলোয়
আর কুড়ি হাত ভ'রে ভ'রে
পরিবেশনে মেতেছে একাই দানব মৃত্যু, দেখি এক দণ্ড কেবা পর কেবা
আত্ম।
বসে পড়ি ফণিমনসার ঝোপে, শূন্যপাতে দুই হাত ভ'রে
আমৃত্যু চৈতন্যে ॥

সহজেই অনুধাবন করা যায় যে এলিঅটীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার স্বীকরণ ক'রেই কবিতাটির জগৎ কল্পিত, আলম্বনও 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড', 'দি হলো মেন' প্রভৃতি কবিতার কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রতীক। এলিঅট কল্পিত মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের অনুরূপ বিষ্ণু দে-র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ। 'বিদেশী-দেশীর তিন শতাব্দীর' শোষণে ভারতবর্ষও 'পোড়ো জমি'—ক্ষুধার অন্ন নেই, তৃষ্ণার জল নেই, স্নিগ্ধ ছায়া নেই, শ্বাসরুদ্ধকর 'জগ্ধ তেপান্তরে' আছে কেবল ছায়াহীন 'ফণিমনসার ঝোপ'। ছবিটা 'দি হলো মেন'-এর অনুরূপ ঃ

This is the dead land
This is cactus land
এই তো শ্মশানদেশ
ফণিমনসার দেশ (বিষ্ণু দে-র অনুবাদ)

মানুষেরাও 'হলো মেন'-এর প্রতিরূপ—'ফাঁপাফাঁপা মানুষ'। বিষ্ণু দে-র 'পোড়ো জমি', 'জগ্ধ তেপান্তর', 'ফাঁপাফাঁপা মানুষ', 'ফণিমনসা' প্রভৃতি প্রতীকের উৎস এলিঅটেরই 'ওয়েস্ট ল্যান্ড', 'হলো মেন,' 'ক্যাকটাস' প্রভৃতি প্রতিভাস।

বিষ্ণু দে-র 'পূর্ব লেখ'-এর 'জন্মাষ্টমী' এবং 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে'-র 'আমৃত্যু চৈতন্যে' কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশের প্রয়োজনীয় আলোচনা থেকে অন্ততঃ এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে কবি এলিঅটের কবিতা এবং কাব্যধারা কবি

বিষ্ণু দে-র সামগ্রিক কবিসত্তাকেই আমূল আলোড়িত করেছিল। একথাও সুস্পষ্ট যে এই আলোড়ন সাময়িক বা ক্ষণিক নয় এবং কোনো একটা বিশেষ যুগেই এর প্রভাব শেষ হয়ে যায় নি। এলিঅটের প্রভাব বিষ্ণু দে-র কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ কালব্যাপকতায় প্রসারিত। একথা শুধু তাঁর এলিঅট অনুবাদেই আভাসিত নয়, মৌলিক কবিতা প্রসঙ্গেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'আমৃত্যু চৈতন্যে'কবিতায় ব্যবহৃত এলিঅটীয় প্রতীক এবং দ্যোতনা থেকে এই দৃঢ় প্রত্যয়ে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে এলিঅটের প্রভাব বিষ্ণু দে-র কাব্যসাধনায় এমন এক মৌল ব্যাপার যা তাঁর কাব্যবিবর্তনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত।

২

প্রখ্যাত কবি মাইকেল রবার্টস বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি ও কাব্যধারাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। যাঁদের কবিতার গোড়ার কথাই হল বর্তমান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি ও পক্ষ সমর্থন[৯] তাঁদের তিনি অভিহিত করেছেন 'ইয়োরোপীয় কবি' ব'লে। এঁদের রচনার মূল লক্ষ্যই ছিল ইয়োরোপীয় চেতনাকে ভাষা দেওয়া। এই কবিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> ...They are aware of Baudelaire, Corbiere, Rimbaud, Laforgue and the later Symbolists (it is notable that German poetry has had little influence upon them),they turn to Dante or Cavalcanti more readily than to Milton, they are more likely to be interested in a Parisian movement in poetry, such as Surrealism, than in the corresponding tendency in 'Alice Through the Looking Glass' or Young's 'Night Thoughts'.[১০]

সোজাসুজি না ব'লে অপর শ্রেণীর, যাঁদের কাব্যে ইঙ্গ উপাদানেরই (English element) প্রাধান্য, কাব্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবার্টস বলেছেন, ইয়োরোপীয় চেতনার কবিদের কাব্য আস্বাদন করতে হলে ইংরেজি সাহিত্যের মতোই ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও গভীর দখল থাকা আবশ্যক এবং

এঁদের সৃষ্টি সাহিত্য-ইতিহাসের বোধের উপর নির্ভরশীল। এঁদের বিশেষ কাব্য-আচরণ ও কাব্যপ্রবণতা প্রসঙ্গে আরো বলেছেন :

> The 'European' poet is acutely aware of the social world in which he lives, he criticizes it, but in a satirical rather than in an indignant manner, he adjusts himself to it, he is interested in its accumulated store of music, painting, sculpture, and even in its bric-a-brac. There is something of the dandy, something of the dilettante,in his make-up, but he is aware of the futility and evanescence of all this, and of the 'irresponsibility of big business, conventional politics and mass education. He is witty, and acutely self-conscious. His attitude is the outcome of a genuine care for much that is valuable in the past, and it gains its strength from a desire to preserve these things : to preserve them, not 'things' at all, but certain attitudes and activities.[১১]

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কবি এজরা পাউন্ড, টি. এস. এলিঅট প্রমুখ কবির কবিতাবলীর বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তথাকথিত ইয়োরোপীয় চেতনার কবির আচরণ-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন মাইকেল রবার্টস্; কিন্তু আমাদের এই আলোচনায় উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ মূল্যবান। কারণ, 'ইয়োরোপীয় কবি' এলিঅটের প্রতি উদ্দিষ্ট কাব্যবৈশিষ্ট্যসমূহ কবি বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ইঙ্গ-চেতনার সমধর্মা বঙ্গ-চেতনার কবিদেরই প্রাধান্য ছিল বাংলা সাহিত্যে। কল্লোল যুগের বিষ্ণু দে প্রমুখ শক্তিমান কবিরা আবির্ভূতই হয়েছিলেন বঙ্গ-চেতনার প্রতি সচেতন বিরুদ্ধাচরণ ক'রে। এঁদের বিশিষ্ট চেতনা অবশ্যই ইয়োরোপীয় কবিদের চেতনার সমতুল, তবে কেবল ইয়োরোপীয় চেতনা কিম্বা তদনুরূপ ভারতীয় চেতনা ব'লে এঁদের বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। এঁরা এলিঅটের অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের কবি, তাই এঁদের পক্ষে এলিঅটের পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে চেতনার পরিধি বিশ্বব্যাপী ক'রে তোলা সহজ হয়েছে। 'বিশ্বচেতনার কবি' ব'লে অভিহিত করলে এঁদের কাব্যবৈশিষ্ট্যের প্রতি যথার্থ সুবিচার করা হবে। রবার্টসের যুক্তির প্রতিধ্বনি তুলে সহজেই বলা চলে, এই বিশ্বচেতনার কবিদের কাব্য আস্বাদন করতে হলে বাংলা ভাষার জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, সমগ্র বাংলা

সাহিত্যের সঙ্গে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের তো বটেই, সমগ্র ইংরেজি সাহিত্য তথা ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ওপরও যথোচিত দখল থাকা অত্যাবশ্যক।

এলিঅটের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র সম্পর্কটা অনেকাংশে লাফর্গের সঙ্গে এলিঅটের সম্পর্কের অনুরূপ। দীর্ঘদিনের অনুশীলনে রোমান্টিক যুগের শেষে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সমসাময়িক সময়ে উপনীত হয়ে ইংরেজি কাব্যধারা নবতর সৃষ্টির সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলেছিল। সাহিত্যিক ও কথ্য ইংরেজির মধ্যে ভাশুর-ভাদ্রবধূ সম্পর্ক ছিল না ঠিকই, ডব্লু. বি. ইয়েটস, উয়িলফ্রেড ওয়েন প্রমুখ শক্তিমান কবি অচলাবস্থার সমাধানে আন্তরিক প্রয়াসীও হয়েছিলেন; কিন্তু সর্বজনসম্মত কোনো প্রকৃত সমাধানে পৌঁছোনো সম্ভব হয় নি তাঁদের পক্ষে। ইয়েটসের আইরিশ পটভূমি ও কথ্যছন্দের সাহায্যে সমস্যা উত্তরণের প্রয়াস ছিল নিতান্তই কবিবিশেষের সমাধান, অকালমৃত্যুর সময় পর্যন্ত ওয়েন নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি রোমান্টিকতার ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে।[১২] বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান থেকে সম্ভবতঃ সমস্যা উপলব্ধির সুযোগ এঁদের জীবনে আসে নি বলেই সমাধানও করায়ত্ত হয় নি। পক্ষান্তরে, বিদেশাগত এলিঅটের এবং পাউন্ডের জীবনে বাইরে থেকে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে ইংরেজি ভাষা ও কাব্যের পরিস্থিতি পর্যালোচনার সুযোগ ঘটেছিল, বন্ধ্যাত্ব মোচনের এবং নতুন-নতুন সৃষ্টি-সম্ভাবনার পথ উন্মুক্তকরণের উপায়ও করায়ত্ত হয়েছিল। ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষা স্পষ্টতঃই এলিয়টের চোখে 'মৃত ভাষা' ব'লে মনে হয়েছিল, তাই তাতে প্রাণ-সঞ্চারের জন্যেই যেন ভাষার কথ্যধর্মিতার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কাব্যের আঙ্গিক ও প্রকরণে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এবং ফরাসী কবি লাফর্গের দৃষ্টান্তই মুখ্যতঃ তাঁকে এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছিল। জে. এম. কোহেন, লাফর্গ এবং এলিঅটের দ্রোণ-একলব্য সম্পর্কের ওপর গভীর আলোকপাত করেছেন ঃ

> Though temperamentally a conservative writer, Eliot had first to break with the tradition of Shakespeare, Milton and Wordsworth, which blocked the free development of English poetry. Ignorant of Hopkins, whose poems were not yet published, he turned to France, the obvious centre for an American expatriate to find a model. He found Jules Laforgue,a poet thirty years dead, whose reputation was overshadowed in his own country by those of

Mallarme and Rimbaud. What drew Eliot to the poet of 'Les Complaintes' was no doubt his technical accomplishment; but it happened that Laforgue had also been an inhabitant of the limbo of boredom. He too had distrusted tradition, parodying the high-sounding Romantic phrase, and contrasting it with the trivial pattern of contemporary speech. He had been conscious of the triviality of his own yearnings, and had contrasted these in his asides and refrains, with some more real and passionate existence in the legendary past.[১৩]

লাফর্গ-এলিঅট সম্পর্কের সঙ্গে এলিঅট-বিষ্ণু দে-সম্পর্কের গভীর সাদৃশ্য। বৈসাদৃশ্য যেটুকু তা এই যে এলিঅট যে ফরাসী কবির কাব্যরীতিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেই লাফর্গ তার তিন দশক পূর্বে শুধু মারাই যান নি, তাঁর কবিখ্যাতিও পরবর্তীকালের প্রতিভাধর কবি ম্যালার্মে ও র‍্যাঁবো-র (এলিঅটের অব্যবহিত পূর্ববর্তী) খ্যাতির তলায় চাপা পড়েছিল। বিষ্ণু দে কিন্তু যাঁর আদর্শ নিয়েছিলেন সেই এলিঅট পূর্বজ হলেও অনেকাংশে সমসাময়িক। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে বিষ্ণু দে-র ভূমিকা নতুন ধারা প্রবর্তনে এলিঅটের মতো নিঃসঙ্গ নয়, মর্যাদাটাও পথিকৃতের নয়। তবে লাফর্গ অনুচারণায় এলিঅটের মতোই এলিঅট অনুচারণায় বিষ্ণু দে-রই মুখ্য ভূমিকা, পথিকৃতেরও ভূমিকা।

লাফর্গ এবং এলিঅট ভিন্ন দেশের এবং ভিন্ন যুগের কবি হলেও মানসিকতায় উভয়েরই অবিসংবাদিত নৈকট্য ছিল—উভয়েই বিরক্তিকর অবসাদগ্রস্ত একঘেয়ে (limbo of boredom) মনোজগতের অধিবাসী। লাফর্গের অনুরূপ মানসিকতার সন্ধান পেয়েই সম্ভবতঃ এলিঅট এই মানসিকতাকে কাব্যে ভাষা দেওয়ার রীতিটাও তাঁর উত্তমর্ণ লাফর্গ থেকেই আহরণ করেছিলেন। এলিঅটের ঋণ বলা যেতে পারে পুরোপুরি কাব্যের প্রকাশরীতি সংক্রান্ত—আঙ্গিক,প্রকরণ এবং প্রবণতাই তন্মধ্যে মুখ্য। ঐতিহ্যের প্রতি অবিশ্বাস, গালভরা রোমাণ্টিক বাক্‌বন্ধের প্রতি ব্যঙ্গ, কোমল রোমাণ্টিক চরণের পাশাপাশি রূঢ় ধ্বনির আধুনিক চরণ সমাবেশ ঘটিয়ে বৈপরীত্য সৃষ্টি, বন্ধনী মধ্যে প্রাচীন প্রবাদ মূল্যের বিপরীত ভাবদ্যোতক স্বগত ভাষণ তথা ধ্রুবপদের অনুরূপ চরণ সংযোজন ক'রে স্বীয় বাস্তব আকাঙ্ক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্বের প্রতি ইঙ্গিত প্রভৃতি

কাব্যপ্রকরণ লাফর্গের কাব্য থেকেই এলিঅটে সঞ্চারিত হয়েছিল। অনুরূপ প্রকরণের কুশল ব্যবহার বিষ্ণু দে-র কাব্যেও সহজলভ্য। কেবল বিষ্ণু দে-ই নয়, সমসাময়িক আরো অনেকেরই কাব্যে ঐ সমস্ত কাব্য-প্রকরণের অকৃপণ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এলিঅট অনুপ্রাণিত বাংলা কাব্যে এলিঅট ব্যবহৃত কাব্য-প্রকরণ সমূহের অধিকাংশই সর্বজন ব্যবহার্য সাধারণ প্রকরণের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। অনুরূপ কয়েকটি প্রকরণের উল্লেখ করেছেন ডক্টর অমলেন্দু বসু তাঁর প্রবন্ধ বিশেষে :

Mainly from Eliot, our poets have learnt the Juxtaposition of imagery derived eclectically from various sources ; the use of hard, concentrated and therefore precise images ; linked nuances ; the sequence of the beautiful and the unlovely, the conventionally and the rudely realistic ; mocking comments in parenthesis , sudden allusions to well-known lines and phrases, · [১৪]

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বাংলা কাব্যের এলিঅট প্রভাবিত কবিগোষ্ঠীর কথা স্মরণে রেখেই এই তালিকা প্রণীত হয়েছে, নতুবা এককভাবে বিষ্ণু দে-র কথা ভেবে প্রভাবের তালিকা প্রণয়ন কার্যে ব্যাপৃত হলে তালিকা নিঃসন্দেহে আরো দীর্ঘতর হতে পারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র কাব্যে এলিঅটীয় প্রভাব বিচার কেবলমাত্র কাব্য-প্রকরণের সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। এলিঅটের কাব্য-রীতি ও কাব্য-প্রকরণ, তাঁর প্রবন্ধ, কবিতা ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি এলিঅটের কাব্যসিদ্ধির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কবি বিষ্ণু দে-র কাব্য, কবিমানস ও কাব্যদৃষ্টিকে নানাদিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিষ্ণু দে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন সময়ে মুক্তকণ্ঠে এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। কবিদৃষ্টি এবং কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কিত প্রাথমিক বোধটাই কিভাবে এলিঅটের দ্বারা, প্রভাবিত হয়েছিল সে-বিষয়ে বিষ্ণু দে-র একটি স্বীকৃতি এখানে তুলে দিচ্ছি :

Indeed, Mr. Eliot's great influence was that he sharp-pointed us in our self-consciousness. Perhaps his most important gift was that we were poetically aware of self-consciousness as a reality. The rest was subsidiary. He made us aware that a poem has to be a good poem in order to be a good poetry,

he helped us to be aware of history and literary history as a living source. He widened and at the same time deepened our vision of literature, which is a specific kind of creative work.[১৫]

কবি বিষ্ণু দে-র ভাষায় অভিব্যক্ত আত্মসচেতনতা স্পষ্টতঃই এলিঅটের ঐতিহাসিক চেতনা সঞ্জাত ; যেখানে তিনি বলেছেন,

...the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous rder.[১৬]

৩

এই পরিচ্ছেদের গোড়ার অনুচ্ছেদ দুটিতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে বিষ্ণু দে এলিঅটীয় কাব্যধারার সচেতন অনুসরণ করেছিলেন কাব্যিক তাগিদে এবং কবিসত্তার অস্তিত্বরক্ষার তাড়নাতেই। ব্যাপারটা অনেকাংশে অবস্থাবৈগুণ্যে এলিঅটের লাফর্গ অনুসরণের সমতুল্য। প্রত্যেক কবিকেই নিজ কবিসত্তার প্রকাশের ভাষা তৈরী ক'রে নিতে হয়, সেই সঙ্গে ব্যষ্টি সমস্যার অতিরিক্ত যুগ-সমস্যা প্রকাশের ভাষাও খুঁজে নিতে হয়। যুগসমস্যার ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য ছিল এলিঅটের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র।

শিল্পবিপ্লবের ফলে ইয়োরোপ তথা ইংলন্ডের সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক ভাঙন ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা যা আবহমান কাল ধ'রে চলে আসছিল এবং যাকে আশ্রয় ক'রে এতকাল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি মূল্যবোধ নির্বিরোধ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, সেই কৃষি-সমাজই অবহেলিত হল এবং ক্রমেই প্রাধান্য পেতে থাকল শিল্পনির্ভর সমাজ। নানা যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন মূল্যবোধের

ওপর নির্মম আঘাত এল; মানুষের মন থেকে প্রাচীন সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বনেদও অন্তর্হিত হল। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজে মানবিক মর্যাদারও হেরফের ঘটে গেল। কিন্তু এই পরিবর্তন যত দ্রুত এবং ব্যাপকই হোক না কেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন সামাজিক কাঠা-মোটা কোনক্রমে হলেও অক্ষতই ছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাতে তা একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ওপরের জোর ক'রে টেনেবুনে বজায় রাখা মিথ্যা খোলসটা হঠাৎ যেন অপসারিত হল এবং ভেতরে-ভেতরে দীর্ঘকাল ধ'রে ঘুণ ধরা ক্ষয়ে যাওয়া অন্তঃসারশূন্য মানুষের, সমাজের ও মূল্যবোধের নগ্ন রূঢ় দুঃসহ বাস্তব রূপটা প্রতিভাত হল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের এই ইংলণ্ডের (তথা ইয়োরোপের) মুখ্যত নাগরিক মানুষের, সমাজের ও মূল্যবোধের যথাযথ রূপ কাব্যে ফুটিয়ে তোলার ভূমিকা নিয়েছিলেন কবি টি. এস. এলিঅট আরো অনেকের মতোই। তবে তাঁর কৃতিত্ব এই যে সমসাময়িক যুগসমস্যাকে ভাষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রাক্ মহাযুদ্ধকালীন ইয়োরোপের নাগরিক মানুষের আসন্ন যুগান্তরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রতীক্ষায় একঘেয়ে অবসাদের ক্লেদাক্ত জীবন-যাপনের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে এলিঅটের প্রথম পর্বের 'দি লাভ্ সঙ অব্ জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক' প্রভৃতি কবিতায়।[১৭] সম্মুখে কোনো আশার হাতছানি নেই, কোনো জিজ্ঞাসাও নেই, জিজ্ঞাসার সদুত্তরও নেই, অতীত চারণা আছে কিন্তু তাতে শান্তি নেই, সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক দুঃসহ অবস্থা, নিজের কাছেই নিজের ভূমিকাটি হাস্যকর ঠেকে, নিজের অস্তিত্বকে রাজসভার ভাঁড় বা বয়স্যতুল্য ব'লে প্রতীয়মান হয়। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালের ইয়োরোপ ভাষা পেয়েছে এলিঅটের 'জেরনশান', 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড', 'দি হলো মেন' প্রভৃতি কবিতায়। 'জেরনশান' কবিতায় যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের ব্যক্তিস্বরূপ (persona) সৃষ্টি ক'রে প্রতীকাত্মক বিবরণের সাহায্যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার দেউলে রূপটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।[১৮] 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এ রূপ পেয়েছে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও আধ্যাত্মিক জীবনের অবক্ষয়। জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলা নগরসভ্যতার নরকতুল্য জীবনচর্যার মানুষেরা ভিড় ক'রে এসেছে যুগসমস্যার প্রতিনিধি রূপে। বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য মানুষেরাই 'দি হলো মেন'। দেখা যাচ্ছে, একটা বিশেষ যুগের সমস্যা, সভ্যতা ও মানুষের বাস্তবনিষ্ঠ রূপ ফুটিয়ে তুলতেই কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে এলিঅটকে এবং তাঁর

সার্থক কাব্যরূপায়ণের পশ্চাতে আছে যুগধর্মিতাদ্যোতক বিষয় ও সমস্যোপ-যোগী ভাষা আঙ্গিক ও প্রকরণের সমন্বয়, আধুনিক সভ্যতা ও জীবনের জটিলতা সোজাসুজি প্রতিবিম্বিত করতে পারে এমন প্রতীক, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ঘটনা-সংস্থান। যুগের প্রয়োজনে ও কাব্যিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদনে প্রয়োজনীয় উপাদানের অনেক কিছুই এলিঅটকে খুঁজে নিতে হয়েছে। খুঁজে নিতে হয়েছে কবি বিষ্ণু দে-কেও এবং সে-ক্লেশলক্ষণ ও সনিষ্ট প্রয়াস তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স' থেকেই প্রতিভাত। এখানেই বিষ্ণু দে কাব্যলক্ষ্মীর অঙ্গনে 'ইয়োরোপীয় কবি' এলিঅটের সমগোত্রীয় সতীর্থ।

এলিঅট যে পরিবর্তিত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি ও মূল্যবোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন ভারতে কিম্বা বাংলাদেশে অথবা কলকাতার নগরজীবনে বিষ্ণু দে-কে পুরোপুরি অনুরূপ পরিস্থিতি ও মূল্যবোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এমন কথা বলি না, তবে ইংলণ্ডীয় (তথা ইয়োরোপীয়) সভ্যতার ও মূল্যবোধের ভাঙনের কোনো আঁচই ভারতীয় জনজীবনে কিম্বা নাগরিক জীবনচর্যায় (বিশেষতঃ বাংলায় তথা কলকাতায়) লাগে নি এমন মন্তব্যকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না। উপনিবেশবাদী ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক নৈকট্যে এসেছিল ইংলণ্ডের, সেই সুবাদে ইয়োরোপেরও। শিক্ষা-সংস্কৃতির ভারতীয় জগতে পুরোবর্তী বাঙালীর নৈকট্য স্বভাবতঃই ছিল আরো বেশি। পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় ও ইংরেজি শিক্ষায় পারঙ্গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জীবনে পাশ্চাত্য জীবন-যাপন পদ্ধতিরও দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই। চাকুরীর দুর্নিবার মোহ সৃষ্টি হওয়ার ফলে শহরবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল দ্রুত হারে। একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন অনিবার্য হয়ে দেখা দিল, কৃষি ও ভূসম্পদের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হয়ে অবশেষে ছিন্নমূল পরিবার দানা বাঁধল পল্লী ছেড়ে চাকুরীর ভিত্তিভূমি শহরে।[১৯] কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘিরে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠতে শুরু করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই।[২০] স্বভাবতঃই কলকাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীই হল না, হয়ে উঠল দ্বিতীয় লণ্ডন; কলকাতা ও তার শহরতলির জীবনযাত্রাও হল কৃষি সম্পর্কশূন্য শহরভিত্তিক, অনেকাংশে লণ্ডন ও তার পার্শ্ববর্তী শহর-তলির জীবনযাত্রার অনুরূপ। এই পরবর্তিত কলকাতাভিত্তিক বাঙালী সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মনে এলিঅটের সমধর্মা ভাবনা এবং এলিঅটীয় সাহিত্য

প্রতিধ্বনি তুলবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে ডক্টর অমলেন্দু বসুর পর্যবেক্ষণ মূল্যবান্ :

> True, the external factors that bred 'The Waste Land' spirit were different for European and Bengali writers. Nevertheless, the deepening frustration engendered by a series of political crisis, the squalor and complexity of life in a huge modern industrial city like Calcutta (and Calcutta is the nerve-centre of Bengali life), the rapid break-up of the age-old social order—all these brought to the intellectual Bengali bourgeoisie an acute sense of things coming to a dead end. Above all, there was the feeling that the western European pattern of civilization on which the English-educated Bengali had built his faith, was on the verge of collapse. Familiar with trends of Modern European thought, the Bengali intellectual found in Eliot's early poetry…a reflection of his own mental processes.[৪১]

রোমাণ্টিক স্বপ্ন ছেড়ে নগ্ন বাস্তবের রূঢ় অনুভূতি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক নাগাদ (প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালেই বলা চলে) ক্রমেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের বিবেক অধিকার ক'রে বসল। নাগরিক সভ্যতার যূপকাষ্ঠে তথা পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক চাপে সমাজের সনাতন সংস্কার বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধগুলি একে একে গুঁড়িয়ে যেতে দেখে নতুন ক'রে ভাবনার সূত্রপাত হল। কাব্যে তারই প্রতিফলন দেখা দিল মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুলের রচনায় রোমাণ্টিক যুগের শাশ্বত প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে ধ্রুব বা শেষ পরিণতি ব'লে আঁকড়ে পড়ে থাকার দিন বিগতপ্রায়, নতুন যুগসমস্যার দিনে বক্তব্যে ও ভাষায় দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের রূঢ়তার প্রকাশ না থাকলে সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের মনকে ছুঁতে পারবে না, এরকম ধারণা এঁদের কাব্যানুশীলনে স্পষ্টতঃই ফুটে উঠল এঁরা যা বলতে চাইলেন তা অনেকটা এইরকম, রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক বাণী দুঃখদীর্ণ বিশ শতকের মানুষের প্রতি নিতান্তই ব্যর্থ পরিহাস, পরিশীলিত কোমল ভাষা এদের জন্য নয়, স্বপ্নময় ছবিও নয় ; বক্তব্যে ও ভাষায় রবীন্দ্র অনুচারণা রূঢ় বাস্তবতার প্রতি উপেক্ষা, তাই বিশ শতকের বাস্তবজীবনকে রূপায়িত করতেই রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে যাওয়া বাংলা কাব্যের পক্ষে

অপরিহার্য। অসীম দক্ষতায় সর্বত্র বিচরণক্ষম রবীন্দ্রপ্রতিভাকে পেয়েও এবং বহুব্যাপক রবীন্দ্রসাহিত্যের উত্তরাধিকার লাভ ক'রেও এই নবীন কবিগোষ্ঠীর মনে অকৃত্রিম অভাববোধ দেখা দিল। এঁদের 'মনে হ'ল তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'ল তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন।'[২২] রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত ঐ সমস্ত অভাববোধ ঘিরেই বিদ্রোহ দেখা দিল বিভিন্ন দিকে — নজরুলের বিদ্রোহ দানা বাঁধল ভাষাকে ঘিরে,[২৩] যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ দৃষ্টিভঙ্গি ঘিরে এবং মোহিতলালের বিদ্রোহ বিষয়বস্তুকে উপলক্ষ ক'রে। নজরুল বাংলা কবিতার ভাষায় পেলবতা-মুক্ত সংগ্রামী দার্ঢ্য নিয়ে এলেন, যতীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন স্বপ্নাতুর ভাবালুতা-মুক্ত বাস্তবতাসম্পৃক্ত দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আর মোহিতলাল আনলেন রোমাণ্টিক প্রেম সম্পর্কমুক্ত ইন্দ্রিয়সচেতন দেহবাদী বিষয়বস্তু। এ সমস্তই বিদ্রোহের অন্তরালে রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্বগ্রাসী প্রভাবকে পাশ কাটিয়ে বাংলা কাব্যধারায় নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত ক'রে দেওয়ার আন্তরিক ও সনিষ্ঠ প্রয়াস।

বাংলা কাব্যধারায় নজরুল-যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-এর পরবর্তী পর্যায়ে কবি বিষ্ণু দে-র আবির্ভাব। ততদিনে রবীন্দ্রকাব্য হয়েছে সন্দেহাতীত উত্তুঙ্গ শাশ্বত মূল্যে প্রতিষ্ঠিত, আর রবীন্দ্রবিরোধী সুরও খুঁজে পেয়েছে অস্তিত্বরক্ষার পায়ের তলার অবলম্বন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণু দে-কে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল দ্বিতভূমিকায়ঃ এক, রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্রকাব্যের আমোঘ অস্তিত্ব হৃদয়ে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েই রবীন্দ্র ঐতিহ্য উত্তরণ ; দুই, বিশ শতকীয় যুগ ও যুগ-সমস্যার জটিলতা এবং সর্বোপরি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মূল্যবোধ দ্যোতিত করে এমন নতুন কাব্যধারার প্রবর্তনা। ভূমিকা-নির্দেশের অর্থ এমন নয় যে কবি এক-একটি কাব্যে এক-একটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দুটি ভূমিকার সমন্বয়েই বিষ্ণু দে-র কাব্যানুশীলন। তবে, প্রথম দিকের কাব্যে ও কবিতায় রবীন্দ্র ঐতিহ্য অতিক্রমণের ভূমিকাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং ক্রমেই তা স্তিমিত হতে-হতে পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ভূমিকাটির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এখানে ব'লে রাখি, বিষ্ণু দে-র যুগে 'রবীন্দ্রপ্রভাব' এবং 'রবীন্দ্র বিরোধিতা' কথা দু'টি অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। এলিঅটের ঐতিহাসিক চেতনায় দীক্ষিত ও উদ্দীপিত কবিগোষ্ঠী এই প্রত্যয়ে উপনীত হতে পেরেছিলেন যে প্রত্যেক কবির ঐতিহাসিক চেতনার মধ্যেই the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a

simultaneous order ; তাঁরা আরো জেনেছিলেন, not only the best, but the most individual parts of his work may be those in which the dead poets, his ancesters, assert their immortality most vigorously.

রবীন্দ্রকাব্যের শাশ্বত মূল্য অবিসংবাদিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই তাঁরই কাব্যের উত্তরাধিকারে বলীয়ান হয়ে পরবর্তী নতুনতর সম্ভাবনার পথে অগ্রসর হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন কল্লোল যুগের কবিরা,[২৪] যদিও সিদ্ধির ভিন্নতর ধারায় অভিযানের মৌল প্রেরণাটাই এলিঅটের দৃষ্টান্ত ও ভূমিকা থেকে পাওয়া। মনে হয় এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্য 'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স'-এর[২৫] প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলে এই অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত কাব্যটির প্রতি যথার্থ সুবিচার করা হবে এবং বিষ্ণু দে-এলিঅট সম্পর্ক নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুপ্রবেশও সহজ হবে।

'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স' কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ-রূপে, কিন্তু এর যথার্থ মর্যাদা নিহিত সেকালের দুরতিক্রম্য ও দুঃসাধ্য (কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিণতি স্মরণে রেখে অন্ততঃ এ কথাই মনে আসা স্বাভাবিক) রবীন্দ্র-রোমাণ্টিক-আবেষ্টনী উত্তরণের মধ্যেই, এলিঅটীয় আদর্শ হয়েছিল এই প্রয়াসেরই সহায়ক। সে-যুগে রবীন্দ্রপ্রভাব এমনই দুর্বার, এমনই প্রবল ছিল যে তার আকর্ষণে রোমাণ্টিক ধারার মধ্যে আত্মনিমজ্জনই ছিল কবিমোক্ষালিপ্সুর অনিবার্য পরিণতি। এই আত্মহননের অনিবার্য পরিণতি এড়াতেই এলিঅটীয় ঐতিহাসিক সচেতনতাপুষ্ট বিষ্ণু দে বাংলা কাব্যের শাশ্বত প্রবাহের উত্তরাধিকার পেতেই রবীন্দ্র-রোমাণ্টিক-ঐতিহ্য পরিহার ক'রে বস্তুনিষ্ঠ কাব্যরীতি অনুশীলনের পথে এগিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে লিখিত 'কেন লিখি ?' নামক নিজ কাব্যাদর্শবিষয়ক প্রবন্ধে তিনি একথা অকপটেই ব্যক্ত করেছেন :

> আর চেষ্টা করি চর্যাপদ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু অবধি যে বাংলা লৌকিকসাহিত্য পাই তার মধ্যে উৎস খুঁজে পেতে। ঐ ঐতিহ্যেই ব্যাপক বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সেখানেই বাংলার জনসাধারণ নিজের মনকে, মেজাজকে, সরস বস্তুবাদকে রূপ দিয়েছে।...কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড কীর্তি ও প্রভাব হলেও তিনি বাংলার ঐতিহ্যে সাগরগামী নদী নন, বিশাল ও মনোরম হ্রদ, তা সে আমাদের রবীন্দ্রলালিত, আমাদের দুর্বোধ্যতাবিলাসী বন্ধুরা যাই বলুন।[২৬]

উপযুক্ত কাব্য বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-অতিক্রমণ-প্রয়াসী কবি বিষ্ণু দে-র পক্ষে কাব্যানুশীলনের একেবারে গোড়াতেই এলিঅটীয় ঐতিহ্যের ন্যায় বিদেশী ঐতিহ্যের আশ্রয় গ্রহণ এবং আবেগধর্মিতা বিসর্জন দিয়ে মননধর্মিতার প্রাধান্য অঙ্গীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।[৭৭]

পূর্বেই বলেছি 'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স' কাব্যে রবীন্দ্র-রোমান্টিক ঐতিহ্য উত্তরণের সচেতন প্রয়াসই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়, তুলনায় এলিঅটীয় প্রভাবের চিহ্ন তত প্রকট নয়, তবে এই রোমান্টিকতা অতিক্রমণের সক্রিয় প্রবর্তনার পশ্চাতে এলিঅটীয় দৃষ্টান্তের প্রণোদনা অবশ্যই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। রবীন্দ্র-বিরোধিতার সুর (বিষ্ণু দে-র সতীর্থ অন্যান্য কবিদের সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য) ছিল উচ্চগ্রামে বাঁধা এবং সুপ্রকট. এলিঅট-অনুচারণা কিন্তু তেমন সুপ্রকট নয়, কতকাংশে কাব্যরীতি এবং কতকাংশে কাব্য-প্রত্যয় থেকে এলিঅটীয় প্রভাবের অস্তিত্ব এই কাব্যে বহুলাংশে নির্ণেয়।

'ছেদ' এবং 'অতিক্রম' কবিতাদুটির মধ্যে কবি বিষ্ণু দে-র কাব্যচর্চার ঊষা-লগ্নের কাব্যপ্রত্যয়ের অনুসন্ধান করতে যাওয়া সম্ভবতঃ সর্বাংশে পণ্ডশ্রম নয়। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কবিতার বক্তব্যে সর্বদা কবির কাব্য-প্রত্যয়ের আরোপ সন্দেহাতীত নয়, এ-বিষয়ে সচেতন হয়েও উপযুক্ত কবিতা দুটিতে প্রকাশিত কাব্য-প্রত্যয়কে উপেক্ষা করতে পারি না। এদের বক্তব্যে এমন কিছু আভাসিত যাকে নির্দ্বিধায় কবির কাব্যাদর্শের অংশভাক্ ব'লে দাবী করা চলে এবং বলতে কুণ্ঠা নেই যে কবিতা দুটির নামকরণেও যেন একটা রূপকাত্মক অর্থ নিহিত আছে। রবীন্দ্র-রোমান্টিক ঐতিহ্যের সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকরণের ইঙ্গিতই যেন আভাসিত হয়েছে 'ছেদ' নামকরণে, আর 'অতিক্রম' কাব্যধারা অতিক্রমণের ইঙ্গিত। 'ছেদ' কবিতার এই চরণ দুটি গভীর অর্থবহ,

> হেথা নাই গান্ধিজীর নাটকীয় জয় অভিযান,
> হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।

বিষ্ণু দে-র সচেতন 'বানপ্রস্থের' মনোজগতে গান্ধিজী কিম্বা রবীন্দ্রনাথ কারুরই স্থান নেই। অথচ সে-সময় এই দুই মনীষীর উত্তুঙ্গ প্রতিভায় ভারতের রাজনীতি ও সাহিত্যের আকাশ আচ্ছন্ন, পৃথিবীর চিন্তাজগতেও আলোড়ন তুলেছে। বিষ্ণু দে কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক চেতনায় গ্রহণ করতে পারেন নি ঐ দুই মনীষীকে।[৭৮] তিনি অন্যান্য অগ্রগণ্য বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মতো বরণ করে নিয়েছেন প্রগতিবাদী দুনিয়ার চিন্তাবিদ্ মার্কসকে, আস্থাও তাঁর সাম্যবাদী নীতিতে; আর সাহিত্যেও তিনি কাব্যিক মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন

ব'লেই বরণ ক'রে নিয়েছেন এলিঅটকে, আস্থাও তাঁর আবেগমুক্ত বস্তুবাদী কাব্যধারায়। রোমাণ্টিক কাব্যধারায় ছেদ টেনেছেন ব'লেই তার আলম্বন প্রেম, আবেগ, কল্পনা প্রভৃতিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে, মুছে ফেলতে হয়েছে প্রেমের জগৎ, স্বপ্নময় আবেশ এবং পূর্বরাগের সুর,

সঙ্গীহীন দিন মোর– সঙ্গী শুধু বনানী বন্ধুর,
সঙ্গীহীন রাত্রি মোর—প্রেম আর সাথী মোর নয়। ··
আকাশ ঘনিষ্ঠ হেথা—সূর্য শূন্যে অগুণ্ঠিত রয়।
পৃথিবীর স্তব্ধতায় ডুবে গেছে পূর্বরাগ-সুর। ('ছেদ')

কবি যে মানসিক কাব্যজগৎ বরণ করে নিয়েছেন সেখানে নগ্ন রূঢ় বাস্তবতারই প্রাধান্য, সেখানে 'কণ্টকিত অন্ধকারে চেতনায় অবসাদ ক্ষরে' (এই স্বীকারোক্তি থেকে এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি একেবারেই অযৌক্তিক যে 'উ ব´ শী ও আ র্টে´ মি স'-এর যুগ থেকেই বিষ্ণু দে-ও এলিঅট এবং লাফর্গের মতোই limbo of boredom-এর আধবাসী ?),

বিতৃষ্ণার তরণীতে তোমাকে করেছি কবে দূর,
আছে শুধু জনশূন্য অরণ্য ও পর্বত বন্ধুর।
আর আছে নবাগত অজ্ঞাত এ রাত্রির আঁধার,
নিদ্রাহীন ভয় আছে অগুণ্ঠিত পৃথিবীর পাশে,
বিনিদ্র আমার ভয় অরণ্যের বিদেশী নিশ্বাসে।
করেছি তোমাকে দূর বিধাতার কম্পিত আশ্বাসে—
সে কল্পনা পলাতকা জনহীন স্তব্ধ অন্ধকারে। ('অতিক্রম')

এই কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতার মতোই ঐ কবিতা দুটিতেও মধ্যম পুরুষ 'তুমি' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। শব্দটিতে 'প্রেয়সী নায়িকা' কিম্বা 'পূর্ববর্তী রোমাণ্টিক কাব্যাদর্শ' উভয় ব্যঞ্জনাই সম্ভব।

কবি বিষ্ণু দে-র কাছে অতীত সর্বাংশেই রোমাণ্টিক কাব্যাদর্শের ধারক ও পালক। তাই এই অতীতকে তিনি বারে-বারে মুছে ফেলতে চান, অন্তরে উদগ্র দুর্বার বাসনা স্বপ্নের ইন্দ্রজালমুক্ত প্রেমের আবেশমুক্ত রূঢ় বাস্তবের জগতে উপনীত হতে। 'ছেদ' এবং অতিক্রম' কবিতাতেই নয়, আরো অনেক কবিতাতেই অনুরূপ বক্তব্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। যেমন,

আজ আমি পরিচ্ছন্ন, বৃন্তচ্যুত অতীত আমার
স্বপ্নের প্রাসাদ আজ ভেঙে দিয়ে তাই
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু ভেঙে

আজ আমি মাগি তাই বন্দীর বন্ধন
আজ আমি ছেড়েছি আমাকে
মেরুকন্যা তুষার-বাতাসে
পর্বতের শুভ্র দৃঢ়তায়
স্বচ্ছ দীপ্ত নিষ্ঠুর আকাশে
জীবনের অনন্ত মিছিলে। ('পর্যাপ্তি')

অথবা,

স্বপ্নগুলি ছুঁড়ে দাও আজ
পুরাতন ভগ্ন অলঙ্কার
রাত্রিশেষে বিলাসী-আসর
স্বপ্ন সব ঠেলে দাও প্রভাতের গণিকার মতো। (ঐ)

স্বপ্নের সঙ্গে-সঙ্গে প্রেমকেও বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নি কবি,

ভাসিয়েছি প্রেম আজ নীলিমার অন্ধকার জলে,
রাত্রির স্তব্ধতা আর জনহীন অন্ধকার কূলে। ·
আমার হৃদয়ে আজ প্রেম নেই—লবণাক্ত জলে
আমার হৃদয় ভাসে অন্ধকার জনহীন রাতে·· ('সমুদ্র')

:প্রেম এবং স্বপ্নের পরিবেশ এবং অনুষঙ্গকেও মুছে ফেলার আকুল আকুতি কবির মনে,

এ আকাশ মুছে দাও আজ,
অন্ধকারে রাত্রি লেপে দাও,
জ্যোৎস্না ডুবিয়ে দাও অনিদ্রার ঘন কালিমায়।

কিম্বা,

বজ্রপাণি রুদ্রাঘাতে দিক আজ সব কিছু মুছে,
মৈনাক ডুবিয়ে দিক পৃথিবীর জনতাকে আজ,
—প্রভাতে দু'চোখ মেলে অতীতকে বাতাসে উড়িয়ে
দেখি যেন অকস্মাৎ···
শুভ্র মরুভূর মাঝে একান্ত বিস্ময়··· ('প্রত্যক্ষ')

রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক চেতনা ব্যাপক সৌন্দর্যানুভূতি, গভীর প্রকৃতি প্রেম প্রভৃতির আলম্বনে আধারিত ছিল। বস্তু-নিরপেক্ষ (abstract) সৌন্দর্যকে রূপ দিতে তিনি উর্বশী, বিজয়িনী প্রভৃতি প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

বিষ্ণু দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে অব্যবহিত পূর্ববর্তী রোমাণ্টিক ঐতিহ্য অতিক্রমণে ব্রতী হয়ে রবীন্দ্রনাথের গড়ে তোলা সৌন্দর্যচেতনার দুর্গেই আঘাত হানলেন। 'পলায়ন', 'সাগর উত্থিতা,' 'উর্বশী,' 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রভৃতি কবিতায় আঘাত হানার ইতিহাসই বিধৃত। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী পূর্ণ প্রস্ফুটিতা অনন্ত যৌবনা, সৌন্দর্যের সংহত নির্যাস; বিকশিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দ-মাঝখানে তার অধিষ্ঠান হলেও স্বর্গীয় সুরভিতে ভূষিত এই রূপকল্প-মানবীয় পার্থিব সম্পর্কের ঊর্ধ্বে সকল অপূর্ণতার নাগালের বাইরে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের আধুনিক কবি কিন্তু এই উর্বশী-কল্পনায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তাঁর দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবী অনুর্বরতার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের উর্বশীতে উর্বরতার, সৃষ্টি সম্ভাবনার একটা ক্ষীণ ইঙ্গিত অবশ্যই ছিল,

তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,

বিষ্ণু দে-র পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বন্ধ্যা উর্বশীকে নির্ভেজাল রাখা সম্ভব হল না,

উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপটে।

উর্বশী আর উমা উভয়েরই প্রেমিকা; কিন্তু উমার প্রেম উর্বশীর মতো প্রতারণা-পীড়িত নয়, বন্ধ্যাও নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের উর্বশী-চেতনাকে চূর্ণ করে বন্ধ্যাত্ব চেতনা অতিক্রম ক'রে উর্বরতা-ধারণা সঞ্চার করতে কালিদাসের সাহায্য নিতে হয়েছে। আবার উর্বরতা-ধারণাই কবিকে আর্টেমিসের প্রতিও আকুতিতে উপনীত হতে সাহায্য করেছে।

আজ শুধু প্রার্থনা আমার
আর্টেমিস্, প্রার্থনা আমার
হেক্‌টরের মৃতদেহ রক্তস্নাত রথচক্রক্ষত হল মন
আমাকে পাঠিয়ে দাও, আজ তুমি দিয়ে যাও
দ্রুতগতি তোমার আশ্বাস।
আর্টেমিস, প্রার্থনা আমার।
চিত্তপ্লবী ঐশ্বর্যের ভার
আজো হেরি এরস-মাতার।
আর্টেমিস্, হিপোলিটসেরে
সঞ্জীবনী দিলে তো সেবার।
আর্টেমিস্, প্রার্থনা আমার। ('উর্বশী ও আর্টেমিস্')

কবি এলিঅটেরও প্রার্থনা উর্বরতার জন্য সঞ্জীবনী বারি,

If there were water
And no rock
If there were rock
And also water
And water
A spring
A pool among the rock
If there were the sound of water only...[২৯]

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অনুর্বর ইয়োরোপ তথা বন্ধ্যা সভ্যতার জন্যই উর্বরতার ব্যাকুলতা এলিঅটের,

I sat upon the shore
Fishing, with the arid plain behind me
Shall I at least set my lands in order [৩০]

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতা তথা কলকাতা-নির্ভর নাগর-সভ্যতাকেও বিষ্ণু দে-র (অন্যান্য সতীর্থ কবিদেরও) মনে হয়েছিল ইয়োরোপের অনুকল্প ব'লে ; তবে সে অনুভূতি 'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স'-এর যুগের নয়, অন্ততঃ তার পুরোপুরি সমর্থন পাওয়া যায় না সম্ভবতঃ এই কাব্যে। এ-যুগের হতাশা বা অনুর্বরতাবোধ কাব্যিক রোমাণ্টিক ঐতিহ্য সম্পর্কে এবং কাব্যিক ঐতিহ্যের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতেই আর্টেমিসের প্রতি প্রার্থনা। এ-প্রসঙ্গে প্রাচ্য পুরাণের উমাকে উর্বরতার প্রতীক রূপে গ্রহণ ক'রেও সম্ভবত মন ভরে নি, প্রতীচ্য পুরাণ থেকে টেনে আনতে হয়েছে আর্টেমিসকে। কারণ আর্টেমিস উর্বরতার প্রতীকই নন, কৌমার্য এবং উর্বরতার পালিকা রক্ষাকর্ত্রীও ;[৩১] উমা চরিত্রে এ-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ একান্তই অসুলভ। কলকাতা-নির্ভর নাগর-সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব বিষ্ণু দে প্রবলভাবে অনুভব করেছেন 'চো রা বা লি-'র যুগে এবং আরো পরে 'অ ন্বি ষ্ট'-এর যুগে। উর্বরতার প্রার্থনা সে-যুগে প্রকাশ পেয়েছে 'ঘোড়সওয়ার,' 'জল দাও' প্রভৃতি কবিতায়।

'উর্বশী' কবিতায় স্বর্গীয় সুরভিটুকু মুছে ফেলে পার্থিব রোমাণ্টিকতামুক্ত পরিবেশে উর্বশীকে নামিয়ে আনা হয়েছে। পৌরাণিক প্রেমের আবেশটুকুও ঝেড়ে ফেলার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়,

হে উর্বশী,
ক্ষণিকের মরঅলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জানো গ'ড়ে তুলি আমার ভুবন ?
এসো তুমি সে ভুবনে, কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে।
ক্ষণেক সেখানে থাকো, ('উর্বশী')

বিশ শতকের পৃথিবীতে পুরূরবার প্রেম অকল্পনীয়, এ-যুগের প্রেম ইন্দ্র-ধনুর মতোই ক্ষণিক অলৌকিক দীপ্তি ছড়িয়ে যায় জীবনে। উর্বশীকেও এই জগতের পার্থিব রাহুগ্রাসে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ক'রে উর্বশী-সম্পর্কিত রোমাণ্টিক ঐতিহ্যকেও গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আর রাত্রি, রবে কি উর্বশী,
আকাশের নক্ষত্র আভায়, রজনীর শব্দহীনতায়
রাহুগ্রস্ত হয়ে রবে বাহুবন্ধে পৃথিবীর নারী
পরশ-কম্পিত দেহ সলজ্জ উৎসুক ? (ঐ)

'সাগর উত্থিতা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী-কল্পনার রোমাণ্টিক চেতনাটুকু বস্তুবাদী চেতনায় রূপান্তরিত করার প্রবণতা দেখা যায় বিজয়িনীকে মদনের সম্মুখে এগিয়ে না দিয়ে বাস্তবের নায়কের রূঢ় দৃষ্টির গোচরে উপস্থাপিত করার মধ্যে.

অগুণ্ঠিত নারী—
শরতের সূর্য সে যে—সে তো নয় কোজাগরী শশী.
কুণ্ঠাহীন দৃষ্টি তার আমাকে সে দিলে দৃষ্টি ভ'রে,
আমি তাই একা তটে বসি,
আর ভাবি রৌদ্রময়
ভাষা তার কিবা বলে—ডায়ানা ? উর্বশী ? ('সাগর উত্থিতা')

'অর্ধেক কল্পনা' এবং 'অর্ধনারীশ্বর' কবিতা দুটিতেও রবীন্দ্র-রোমাণ্টিক ঐতিহ্য অতিক্রমণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রোমাণ্টিক ভাবাবেগের ফেনিলোচ্ছ্বাস বিষ্ণু দে-র কবিতায় সংহত হয়ে বস্তুবাদী নিটোল রূপ পেয়েছে। 'অর্ধেক কল্পনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার এবং 'অর্ধনারীশ্বর' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুপারে' কবিতার রোমাণ্টিক ভাবকল্পনা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। 'সিন্ধুপারে'-র বধূরূপিনী জীবন-দেবতা বিষ্ণু দে-র কবিতায় বাস্তবের সহচরীরূপে কল্পিত। রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক স্বপ্নময় অলৌকিক পরিবেশের ছায়া তাঁর উত্তরসূরীর কবিতাতেও বিদ্যমান, কিন্তু উভয়ের উপসংহার অভিন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের উপসংহারে একটা

অপ্রচ্ছন্ন কৌতুক স্বতঃই ছাপিয়ে উঠেছে, বিষ্ণু দে অতখানি হাল্কা হতে পারেন নি ঠিকই, তবে তার উপসংহার অর্ধনারীশ্বর পূজনের আকস্মিকতায় পর্যবসিত। অর্ধনারীশ্বর কল্পনার মধ্যে বস্তুবাদী ইঙ্গিতবাহী প্রতীক-কল্পনার অস্তিত্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়, আবার এর পশ্চাতে কবি এলিঅটের 'Tiresias, though blind, throbbing between two lives/Old man with wrinkled female breasts',-এর একটা ক্ষীণ অনুপ্রেরণা থাকাও একান্ত অনভিপ্রেত নয়। 'অর্ধেক কল্পনা'য় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চেতনাকে এলিঅটীয় উর্বরতা চেতনায় রূপান্তরিত করেছেন বিষ্ণু দে।

সেদিন তোমারই স্বপ্ন দেখেনি কি গর্ভস্থ নিখিল ?
পুরুষের সৃষ্টিস্বপ্নে ছিল নাকি তোমারই বৈভব ?...
তোমাকে তর্পণে দেখি পুরুষের কম্পিত হৃদয়,
যে হৃদয়ে কেঁপেছিল আদি স্বপ্নে সৃষ্টির বিস্ময়।

রোমান্টিক ভাবাবেশের অস্বীকৃতি কিম্বা স্বপ্নময় জগৎ অতিক্রমণই নয়, অভীপ্সিত উত্তরণের বস্তুবাদী জগতের ক্ষীণ এবং বিক্ষিপ্ত আভাসও দিয়েছেন কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে। কবির বস্তুবাদী এই জগতের আভাস আছে 'প্রত্যক্ষ' কবিতায়, স্পষ্ট উল্লেখ আছে 'পর্যাপ্ত' ও 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কবিতায়। এই জগৎ জনতার ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে আসা নাগরিক সভ্যতার জগৎ, আকাশ বাতাস জীবনীশক্তি ক্ষয়কারী ধূলি ও ধোঁয়ায় মলিন এবং সবোপরি মরুভূর মতো অনুবর, কুৎসিত পাশবিকতার নিরন্ধ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বলা বাহুল্য, এলিঅটীয় বস্তুবাদী জগতের প্রতিচ্ছবিই প্রতিবিম্বিত বিষ্ণু দে-র জগতে। 'প্রত্যক্ষ' কবিতায় এই জগতের উল্লেখ উদ্দিষ্ট নায়িকাকে দেখার পরিবেশ বর্ণনা-প্রসঙ্গে অত্যন্ত সংক্ষেপে,

সেইদিন দেখেছি তোমাকে,
কোলাহল-কুৎসিত এ নগরের ভিড়ে
দুষ্টশ্বাস জনতা-আঁধারে...

'উর্বশী ও আর্টেমিস' কবিতায়ও অনুরূপ জগতের সন্ধান পাওয়া যায়, যে-জগতের সঙ্গে এলিঅটের প্রুফ্রক কিম্বা ওয়েস্ট ল্যাণ্ডীয় জগতের নিঃসন্দেহে নিকট সাদৃশ্য।

আজো তবু গোধূলি মলিন
ধোঁয়ায় মলিন এই শব্দখর কুৎসিত নগরে
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নামে নবীন ধরার মায়া

ধ'রে তার দুই স্নিগ্ধ করে

এই চরণগুলির সঙ্গে ভাবে ভাষায় বক্তব্যে ও বিষয়বস্তুতে নৈকট্য আছে এমন কতকগুলি চরণ এলিঅটের কবিতা থেকে সহজেই উদ্ধার করা যায়।

১. And indeed there will be time
For the yellow smoke that slides along the street…
(Prufrock)

২. Among the smoke and fog of a December afternoon…
(Portrait of a Lady)

৩. Afternoon grey and smoky, evening yellow and rose
(Ibid)

৪. Unreal City.
Under the brown fog of a winter dawn,… (The Waste Land)

৫. Unreal city
Under the brown fog of a winter noon…(Ibid)

রোমান্টিক ঐতিহ্য অতিক্রমণের মধ্যে এলিঅটীয় প্রেরণা থাকাই স্বাভাবিক এরকম সিদ্ধান্তের পুঁজি নিয়েই বিষ্ণু দে-র 'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স' কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া। বিশ্লেষণের গভীরতায় তলিয়ে না গিয়েও বলা চলে যে এলিঅটীয় কাব্যরীতি, কাব্যস্বভাব, এবং কোথাও-কোথাও বক্তব্যেও এলিঅটের কাব্যের ছায়া ব্যাপক না হলেও, গভীর না হলেও পড়েছে যে সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে লক্ষ্যণীয় এই যে রীতিগত কিম্বা তত্ত্বগত যে-সাদৃশ্যই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে এলিঅটের ছায়া পড়েছিল এমন কবিতার নিদর্শন পাওয়া দুষ্কর। ব্যতিক্রম 'আলোক ছড়াও' কবিতাটি। এই কবিতার উপস্থাপনা, প্রতীক এবং চিত্ররূপের ওপর এলিঅটের'La Figlia Che Piange' কবিতাটির ব্যাপকতর ছায়া পড়েছে। তবে ব্যাপকতর রূপে এই ছায়া অনুভূত হওয়ার পক্ষে বাধা 'আলোক ছড়াও' কবিতাটি 'La Figlia Che Piange'-র মতো আয়তনের কবিতা নয়, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। এলিঅটের কবিতার মূল চিত্র-রূপটুকুই বিষ্ণু দে নিয়েছেন, রৌদ্রালোকস্নাত নারীমূর্তির সৌন্দর্য দ্রষ্টার ভাববিহ্বলতাই মূল আলম্বন। উভয় কবিতাই ভাষা পেয়েছে উত্তম পুরুষের জবানিতে, তবে এলিঅটের কবিতায় লক্ষ্য মধ্যম পুরুষ (উদ্দিষ্টা কিন্তু নারী উভয় ক্ষেত্রেই), পক্ষান্তরে বিষ্ণু দে-র কবিতায় লক্ষ্য প্রথম পুরুষ। তাহলেও

বক্তব্যের নৈকট্য অননুভূত নয়। কতকগুলো সদৃশ চরণ যেন নৈকট্যের রেশটুকু ধরিয়ে দেয়।

শীতের উন্মুক্ত রৌদ্র কালো তার কেশে

কিম্বা,

ঢালো রৌদ্র
আলোক ছড়াও
কৃষ্ণ কেশে,...

অথবা,

আলোক সোনাটা আমাকে করেছে বিচলিত, মূক.
দুজনে দাঁড়িয়ে বারান্দায়।

এদের সমধর্মা চরণগুলো এলিঅটের কবিতা থেকে সহজেই উদ্ধার করা যায়।

Weave, weave the sunlight in your hair··
I should have lost a gesture and a pose.
Sometimes these cogitations still amaze
The troubled midnight and the noon's repose.

'অতিক্রম' কবিতার 'বিনিদ্র আমার ভয় অরণ্যের বিদেশী নিশ্বাসে' চরণটির মধ্যে কিম্বা 'সোহহিবেভেত্তস্মাদে কাকী বিভেতি' কবিতায় 'বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে' ও 'প্রকৃতির দুয়োয়ারে এসে পড়ি বিদেশী বর্বর' চরণদুটি থেকে বিষ্ণু দে-র কাব্য ও কবিতায় বিদেশী প্রভাবের সিদ্ধান্তে সোজাসুজি উপনীত হওয়া অযৌক্তিক, কিম্বা এরই সূত্র ধ'রে এলিঅটের প্রভাব নিরূপণ করতে যাওয়াও ততোধিক মূঢ়তা, একথা মানি; কিন্তু বারবার ঘুরে ফিরে আসা 'বিদেশী' শব্দটি কবির কাব্যরীতি কিম্বা কাব্যচর্চা বিষয়ে কোনো ইঙ্গিতই বহন করছে না এমন যুক্তি সম্ভবতঃ নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া চলে না।

মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,
মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে অটল প্রাচীর।
বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
পৃথিবীর সভাগৃহে, বুঝি নাকো ভাষা যে এদের।

এই নৈঃসঙ্গ্যবোধই আমাদের সাহায্য করে কবির বৈদগ্ধ্যের উৎসমূলে উপনীত হতে। কবির বৈদগ্ধ্য কবিকে সাধারণের ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছে, ব্যবধানও সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যবধানের নৈঃসঙ্গ্য-

বোধ রবীন্দ্রনাথকেও পীড়িত করেছিল। বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রজন্মের মননশীল শরিক। শুধু তাঁর ব্যাপক আয়াসে অর্জিত শিক্ষা-দীক্ষা, বৈদগ্ধ্য কিম্বা অভিজাত রুচি ও সভ্যতাই নয়, সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল চিন্তাধারাও তাঁকে সর্বাংশে নিঃসঙ্গ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। আরো অনেকের মতোই বিষ্ণু দে সমসাময়িক মার্ক্সীয় ও ফ্রয়েডীয় সর্বাধুনিক চিন্তাধারায় প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন, গভীরভাবে আয়ত্ত করে-ছিলেন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অত্যাধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পতত্ত্ব। এমন মানুষের সামাজিক জীবন যথার্থই নিঃসঙ্গ হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বোপরি আর একটা দিকও আছে। পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল কাব্যধারার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বাংলা কাব্যের ধারা পরিবর্তনের প্রয়াসও অনেকাংশে কবি বিষ্ণু দে-র নিঃসঙ্গ অভিযান এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি নিঃসঙ্গতাবোধ। এ-পথে বাধাও কিছু কম ছিল না – বিরোধীপন্থীরা, সমালোচকেরা, রক্ষণশীলেরা, রোমাণ্টি-কতাবাদীরা এবং সর্বোপরি নিন্দুকেরা নানাভাবে নানাদিক থেকে প্রতি আক্রমণে জর্জরিত করতে কার্পণ্য দেখান নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সোঽহবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি' কবিতার উপযুক্ত চরণগুলি প্রতীকাত্মক মনে হওয়াই স্বাভাবিক এবং প্রতীক ব্যঞ্জনাতেই 'মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক'-এর পশ্চাৎপটে ফুটে ওঠে বিদেশী ঐতিহ্যপুষ্ট এক কবির চরিত্র যাঁর নিঃসঙ্গ সাধন। বাংলা কাব্যের ধারা পরিবর্তনে সর্বাংশে নিয়োজিত। বাস্তব সত্য এই যে কবি বিষ্ণু দে বিদেশী কাব্য ঐতিহ্যে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং উ র্ব শী ও আ র্টে মি স্' কাব্যগ্রন্থের সর্বাঙ্গে সে-চিহ্ন সুপরিস্ফুট। এই বক্তব্যের সমর্থনে পূর্বোদ্ধৃত (পৃ. ১৪২) 'উর্বশী ও আর্টেমিস্' কবিতার স্তবকটি এখানে আবার স্মরণ করছি।

কাব্যের রীতি ও প্রকৃতিতে 'বিদেশী নিশ্বাসের' অবিসংবাদিত ছোবল থাকলেও 'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স' কাব্যগ্রন্থে বিদেশী সাহিত্য-সংগীত-শিল্প-সংস্কৃতি তথা পুরা-প্রসঙ্গের সনিষ্ঠ অবতারণা সামূহিক বিচারে তত ব্যাপক নয়। ব্যাপকতা আছে কেবল একটি কবিতায়—'উর্বশী ও আর্টেমিস্'এ : বিক্ষিপ্ত এবং অনুল্লেখ্য অবতারণা রয়েছে 'সাগর উত্থিতা', 'পয় াপ্তি', 'সন্ধ্যা', 'ভয়', 'এপ্রিল' প্রভৃতি কবিতায়। বিদেশী নিশ্বাসের অ-পর্যাপ্ততার জন্য বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থটি বিদেশী উপাদান স্বীকরণ তথা এলিঅট-অভিঘাতের উপোদঘাত মাত্র। পূর্ণতা (ব্যাপকার্থেই) পরবর্তী 'চো রা বা লি' কাব্যগ্রন্থেই।

ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর প্রখ্যাত 'বাঙগালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বিষ্ণু দে-র কবিকৃতি আলোচনার প্রারম্ভেই লিখেছেন, 'জীবনানন্দ দাশ অনেকটা অন্তরের তাগিদেই "নূতন কবিতা-"র পথ ধরিয়া ছিলেন শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে (জন্ম ১৯০৯) কিন্তু গোড়া হইতেই আটঘাট বাঁধিয়া সে পথে নামিয়া ছিলেন। বিষ্ণুবাবুর কবিপ্রকৃতি বিদ্যার বন্ধুরপথবাহী বুদ্ধিরই অনুসরণ করিয়াছে। সেই জন্য বিষ্ণুবাবুর কবিতায় এলিঅটের কৌশল স্পষ্টভাবে অনুকৃত।'[৩২] এই আলোচনার অনন্যসুলভ বাক্‌সংযম লক্ষ্যণীয়, বিষ্ণু দে কিভাবে আটঘাট বেঁধে 'নূতন কবিতা'-র পথে নেমেছিলেন সে-সম্পর্কে যথাযথ আলোকপাতে আলোচকের ঔদাসীন্য নানারকম অনুমানের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে। 'বিদ্যার বন্ধুরপথবাহী বুদ্ধির অনুসরণকে'ই এলিঅটের কৌশল অনুকরণের একমাত্র পন্থারূপে নির্দেশ করে কবি বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুচারণার একটা বিশিষ্ট দিকমাত্র দেখনো হয়েছে। এতদ্ সত্ত্বেও অর্থাৎ উপর্যুক্ত আলোচনার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও বক্তব্যের সারবত্তা সম্পর্কে সংশয় থাকে না। তবে অনুরূপ মন্তব্য বিষ্ণু দে-র 'উ র্ ব শী ও আ র্টে মি স-'এর পশ্চাৎপটে যতখানি না সমর্থনীয়, তার চেয়ে বেশি প্রযোজ্য 'চো রা বা লি' সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় যে এই কাব্যের রসগ্রাহী আলোচনা কালেই সতীর্থ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে-কে নির্দ্বিধায় 'এলিঅট্-ভক্ত' ব'লে চিহ্নিত করেছেন।[৩৩] উপর্যুক্ত বক্তব্য দুটির তথ্যগত নৈকট্য কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক। এলিঅট এবং বিষ্ণু দে-র কাব্যিক সমধর্মিতার উভয়েই মোটামুটি একই লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। ডক্টর সেন-এর মতে 'বিষ্ণুবাবুর কবিপ্রকৃতি বিদ্যার বন্ধুর পথবাহী বুদ্ধিরই' অনুসারী ব'লেই এলিঅটীয় কাব্য-কৌশলের অনুকারী। সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুজু। তিনি বলেন, বিষ্ণু দে 'এলিয়ট্-ভক্ত' ব'লেই 'কখনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিগ্বিদিক বেড়িয়ে আসেন।' এর স্পষ্টীকরণে এ কথাটাই প্রাধান্য পায় যে বিষ্ণু দে-র কবিপ্রকৃতিতে রোমান্টিকতা প্রশ্রয় পায় না, প্রশ্রয় পায় নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বিশ্ববিদ্যা ও বিশ্বসংস্কৃতির অনেক কিছুকেই কাব্যের অঙ্গীভূত করার জন্য আন্তরিক লোলুপতা প্রকাশ করে। ঐতিহ্য সম্পর্কিত এলিঅটীয় ব্যাখ্যার সার্থক কাব্যরূপায়ণ লক্ষ্য করেই এলিঅট ও বিষ্ণু দে-র কবিপ্রকৃতির সমধর্মিতা সম্পর্কে অনুরূপ ঐক্যমত্যে উপনীত হয়েছেন ঐ দুই বিদগ্ধ সমালোচক।

কাব্যের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজতে যাওয়া কিম্বা কোনোও তত্ত্বের আধারে কাব্যের

ব্যাখ্যা করতে যাওয়া সব সময় নিরাপদ নয় ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাবৎ মহৎ কাব্য কিম্বা কবিতা থেকে তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা সম্ভব হয় নি, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও অপাংক্তেয় ঘোষিত হয় নি। তত্ত্বের ব্যাখ্যা ছাড়া এলিঅটের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'এর ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। বিষ্ণু দে-র 'চো রা বা লি'র ব্যাখ্যার সম্পূর্ণতাও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

এলিঅটের যুগান্তকারী সৃষ্টি 'দি. ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর[৩৪] পরিকল্পনা মূলতঃ উর্বরতা তত্ত্বের ওপরই কেন্দ্রায়িত, এ কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য। ঐতিহ্যের প্রবক্তা এলিঅট ঐতিহ্যানুসন্ধানী এবং একথাও তাঁর অবিদিত ছিল না যে মৌলিকত্বই কবির ধর্ম।[৩৫] বহু ব্যবহৃত পুরাতন বিষয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে কাব্যের জগতে অভিনবত্বের আমদানির উদ্দেশ্যেই তিনি পুরা-প্রসঙ্গ ও নৃ-তত্ত্বের জগৎ হাতড়ে গ্রেল কাহিনীকে উদ্ধার করেছিলেন। উর্বরতা তত্ত্বভিত্তিক কাহিনী-বৈশিষ্ট্যই কবিকে অনুপ্রেরিত করেছিল। কাব্যের নামকরণেও উর্বরতা-তত্ত্ব আভাসিত।[৩৬] সংযোজিত টীকা থেকে এ কথা জানা যায় যে উপাদান সংগ্রহে মিস্ জেসী. এল. ওয়েস্টন-এর 'ফ্ র ম রি চু য়া ল টু রো মা ন্স'এবং নৃ-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ 'দি গো ল্ডে-ন বাউ' কবিকে প্রভৃত সাহায্য করেছিল। কাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গ যে উর্বরতা উৎসবেরই (vegetation ceremony) ইঙ্গিতবাহী, সে কথাও কবি অকপটে স্বীকার করেছেন। কবি বিষ্ণু দে-র 'চো রা বা লি' কাব্যগ্রন্থের নামকরণ এবং কাব্যের প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা 'ঘোড়সওয়ার' এলিঅটীয় উর্বরতা তত্ত্বেরই পটভূমিকায় পরিকল্পিত। যদিও কাব্যের নামকরণ এবং কাব্যের প্রথম (তথা মুখ্য) কবিতার নামকরণ এক নয়, তাহলেও কাব্যগ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্য বহন করছে ব'লেই 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় এই কাব্যের নাম কবিতার মর্যাদা অনায়াসেই আরোপ করা চলে। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনায় অনুরূপ আরোপ করেছেনও। তিনি 'ঘোড়সওয়ারকেই' 'চোরাবালি' কবিতা ব'লে উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

'চোরাবালি' শব্দটি নিঃসন্দেহে কবির এক বিশিষ্ট প্রবণতা তথা দৃষ্টিভঙ্গির দ্যোতক। কবির বক্তব্য অনুসরণ ক'রে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতা থেকে চোরাবালির একটা সুস্পষ্ট ভাষ্য উদ্ধার করা যায়।

চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?

অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার ?

চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?

কবির এই ভাষ্যে চোরাবালির বন্ধ্যা রূপটাই বড় হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি এলিঅটের 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর বন্ধ্যা রূপটা সহজেই তুলনীয় ঃ

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock···
Here one can neither stand nor lie nor sit
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain

বিষ্ণু দে-র বক্তব্যের আলম্বন চোরাবালি, এলিঅটের আলম্বন পাহাড় ; কিন্তু চোরাবালি এবং পাহাড় উভয়ই অনুর্বর ভূমি, আর সে কারণেই বালি ও পাথর যা যথাক্রমে চোরাবালি ও পাহাড়ের উপাদান তা বন্ধ্যাত্বেরই প্রতীক হিসেবে উভয় কবি ব্যবহার করেছেন। এর থেকে এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয় যে বিষ্ণু দে-র চোরাবালি এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যাণ্ডেরই যথার্থ বিকল্প।

উর্বরতা তত্ত্ব ও বন্ধ্যাত্ব দ্যোতিত হয় এমন কিছু পুরা প্রসঙ্গ ও প্রতীকের সন্ধান পেয়েই 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, এলিঅট সে কথা কাব্যগ্রন্থের টীকায় অকপটে স্বীকার করেছেন। লক্ষ্যণীয় উর্বরতা তত্ত্বের যে-সমস্ত পুরা-প্রসঙ্গ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন এবং যে-সমস্ত উপাদান উর্বরতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন, সে-সমস্তই সংগ্রহ করেছেন আদিম কালের এবং জাতির কাহিনী থেকে। কবি বিষ্ণু দে-ও 'চো রা বা লি' কাব্যগ্রন্থের 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে উর্বরতা তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সে অনুপ্রেরণা এসেছিল কয়েকটি পুরা-প্রসঙ্গবিষয়ক গ্রন্থ থেকেই, এরকম অনুমানের কিছু সঙ্গত কারণ আছে। অনুমানের সূত্রপাত কবি সুধীন্দ্র

নাথের সেই প্রথম আলোচনা ও কাব্য-আস্বাদন (appreciation) থেকেই। যথার্থ মূল্যনির্ধারণ প্রয়াসে 'কু লা য় ও কা ল পু রু ষ' গ্র ন্থে র 'শ্রদ্ধা ও সম্ভাব' সমন্বিত আলোচনা 'চোরাবালি'-তে একটা ক্ষীণ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন : '…এবং যাঁদের কাছে য়ুং-প্রমুখ পুরাণবিদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়…।'[৩৮] এই ইঙ্গিত থেকে এ বিষয়ে সংশয় থাকে না যে 'চোরাবালি' কবিতাটি য়ুং-এর 'রিরংসার রূপক' ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রচিত। তাই এর রূপকার্থ উদ্ধার য়ুং-অধ্যয়ন সাপেক্ষ; কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের একথা স্পষ্ট নয় যে বিষ্ণু দে তাঁর উপর্যুক্ত কবিতায় য়ুং-এর কোন গ্রন্থ-অধীত অভিজ্ঞতার আরোপ করেছিলেন। সম্প্রতি এই অনুদ্দিষ্ট গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া গেছে। রিচার্ড উইলহেল্‌ম কর্তৃক চীনা থেকে অনুবাদিত এবং য়ুং-এর টীকা-টিপ্পনী সহযোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির নাম 'দি সি ক্রে ট অ ফ দি গো ল্ডে ন ফ্লা ও য়া র (লণ্ডন, ১৯৩১)', একটি গূঢ় মনস্তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ।[৩৯]

'ঘোড়সওয়ার' কবিতার পটভূমিকায় আদিম উপজাতীয়দের মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছায়াপাত ঘটেছে, এরকম অনুমানও করা হয়েছে।[৪০] ওয়াটসাণ্ডিস আদিম উপজাতীয়রা মাটির বন্ধ্যাত্ব নিরাকরণ এবং উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় বসন্তকালে একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত। মূল অনুষ্ঠানই ছিল, মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ে তাকে ঝোপঝাড় দিয়ে আবৃতকরণ এবং উদ্যত বর্শা হাতে এই গর্তটি ঘিরে সকলের সমবেত নৃত্য। গর্তটিতে শুধু স্ত্রী-অঙ্গের অনুকৃতিই থাকত না, এই অনুষ্ঠানে মাটির গর্ত ও বর্শা যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষাঙ্গের প্রতীকরূপে পরিগণিত হত। বিষ্ণু দে-র কবিতায় চোরাবালি এবং বল্লমের প্রতীক গ্রহণের পশ্চাতে এই আদিম এবং উপজাতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রকৃতই অনুপ্রেরণা যদি নাও থাকে তাহলেও কবিতা-টিকে উর্বরতা তত্ত্ব বা ফার্টিলিটি কাল্ট-এর একটি সার্থক কবিতারূপে মেনে নিতে কোথাও বাধা নেই। কবিতাটিকে উর্বরতা তত্ত্বের একটি উৎকৃষ্ট রূপক কবিতারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে কবি পুরা-প্রসঙ্গ, জনশ্রুতি, রূপকথা, নৃ-তত্ত্ব অধীত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সমস্ত কিছুই কাজে লাগিয়েছেন। ঘোড়সওয়ার প্রতীক গ্রহণ ক'রে রূপকথার চিরন্তন ব্যঞ্জনাটুকু সুন্দরভাবে কবিতায় সঞ্চারিত করেছেন, নির্বাচনে এবং প্রয়োগে চিত্রকল্পটিও যথার্থ সার্থকতার অনন্য মর্যাদা লাভ করেছে; কিন্তু ঘোড়সওয়ারের আবেদন এখানেই শেষ হয়ে যায় নি, এর আবেদন আমাদের ফার্টিলিটি কাল্ট বা উর্বরতা তত্ত্বের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। তাই ঘোড়সওয়ার প্রতীকটির একটু বিশদ তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাঙালী

সংস্কৃতিতে ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা রোমাণ্টিক কল্পনা, শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে ওঠে একটা রূপকথার জগৎ। অশ্বারোহণ বাঙালীর জীবনে নিত্য-বাস্তব ঘটনা নয়, সম্ভবতঃ সে কারণেই অশ্বারোহী সম্পর্কে এই রোমাণ্টিক দুর্বলতা। অশ্বারোহীর সঙ্গে তার বাস্তব ব্যবধান থাকলেও মানস-জগতে কোনো ব্যবধান নেই। অশ্বারোহী সম্পর্কে বাঙালী তার একটা নিজস্ব কাল্পনিক রূপকথার জগৎ গড়ে নিয়েছে। বাঙালীর কল্পনার অশ্বারোহী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ী নায়ক, দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। পরিচয় তার গৌরবের, হয় রাজপুত্র, না হয় ঐ জাতীয় কিছু। দেশভ্রমণে কিম্বা অভিযানে বেরিয়ে দেখা যায় এই অশ্বারোহী রাজপুত্র এমন এক দেশে উপনীত হয় যেখানে সব থেকেও যেন কিছুই নেই। বিরাট শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে সে রাজ্যে, না হয় রাজ্য জুড়ে ঘুমের অভিশাপ, কিম্বা রাজকন্যা দৈত্যাপহৃতা ও বন্দিনী। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, এই শূন্যতা কিম্বা ঘুম অথবা দৈত্য ইত্যাদির যদি কোনো রূপকার্থ থেকেই থাকে তাহলে সে অর্থ অবশ্যই বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কিত। এই রাজ্য বন্ধ্যাত্বের মুখোমুখি হয়েই অমন নৈরাশ্যের দিন গোণে আর অপেক্ষা করতে থাকে উর্বরতার সোনার কাঠির স্পর্শের। অশ্বারোহীই সে উর্বরতা, রাজপুত্রই নিয়ে আসে সে উর্বরতার যাদুস্পর্শ, যার ফলে রাজকন্যা ও রাজ্যের ঘুম ভাঙে, কিম্বা বন্ধ্যাত্ব-দৈত্যের কবল থেকে বন্দীনীর মুক্তি ঘটে। উর্বরতা ফিরে পেয়ে রাজ্য বা রাজপুরী আবার আনন্দে ভরে ওঠে। বিষ্ণু দে ঘোড়সওয়ার রূপকে বাঙালীর এই রোমাণ্টিক দুর্বলতাটিকে ভাঙিয়ে কাজে লাগিয়েছেন। 'দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার' রূপকথারই ছটা বিকিরণ করেছে, অশ্বারোহী রাজপুত্রের ছবিই ফুটিয়ে তুলেছে ; চোরাবালির উর্বরতা প্রার্থনার মধ্যেও ফুটে উঠেছে বন্ধ্যাত্ব কবলিতা রাজকন্যার ঘুম, কিম্বা বন্ধনদশা থেকে চিরতরে মুক্তির কামনা :

হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাতসমুদ্র চৌদ্দনদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।…
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার ?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

সৃষ্টি-সম্ভাবনায় চোরাবালির অক্ষমতার ইঙ্গিত রয়েছে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায়।

এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া?

মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি?

কিন্তু এই কবিতার প্রতীক দ্যোতনা থেকে আধুনিক যুগের বন্ধ্যাত্ব কিম্বা আধুনিক সভ্যতার অনুর্বরতা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে নি। এলিঅট 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ আদিম জনশ্রুতি-কাহিনী তথা অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে বন্ধ্যাত্বের দ্যোতনা সৃষ্টি ক'রে আধুনিক যুগ ও সভ্যতার বন্ধ্যাত্বই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আধুনিক সভ্যতায় নরনারীর জীবনচর্যা, পরিবেশ, প্রণয়-সম্পর্ক প্রভৃতির টুকরো-টুকরো ছবির পাশাপাশি বিশেষ-বিশেষ ব্যঞ্জনাধর্মী প্রতীক অবলম্বনে আধুনিক সভ্যতার অনুর্বর রূপ এবং নরনারীর প্রেম, প্রণয়, দাম্পত্য, প্রজননের বন্ধ্যারূপ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিষ্ণু দে-র কবিতায় এই দিকটা সম্পূর্ণই অনুল্লিখিত থেকে গেছে। এলিঅটের 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর উপসংহারে উর্বরতা ও সৃষ্টির প্রতীকরূপে জল-এর ব্যবহারে আশার বাণী শোনা গেছে, তাও 'ঘোড়সওয়ার'-এ একান্তই অনুপস্থিত। ঐ সমস্ত বিশ্বাস এবং প্রতীক বিষ্ণু দে-র এই কবিতায় না থাকলেও প্রথমটি 'চো রা বা লি'রই অন্য কয়েকটি কবিতায় এবং দ্বিতীয়টি 'অ ন্বি ষ্ট' এবং 'ই তি হা সে ট্রা জি ক উ ল্লা সে' কাব্যগ্রন্থে ভাষারূপ পেয়েছে। যথাস্থানে সে-বিষয়ে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হবে।

এলিঅটের উপলব্ধিতে একটা বিশেষ যুগের স্থান-কাল-পাত্র সর্বক্ষেত্রেই যে বন্ধ্যাত্ব ধরা দিয়েছে তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ। সমসাময়িক ইয়োরোপ (তথা ইংলন্ড), বিশ শতকের নাগর-সভ্যতা এবং নগর জীবনের মানুষেরা ভাষারূপ পেয়েছে এই যুগ-ভাষ্যকারের হাতে—এলিজাবেথ লেস্টার,হাউস এজেন্টস্ ক্লার্ক-টাইপিস্ট তরুণী,সুইনি-মিসেস পোর্টার,আলবার্ট-লিলি প্রভৃতি যুগ-প্রতিভু চরিত্র সমসাময়িক যুগ, সভ্যতা এবং নরনারীর প্রেম-প্রণয়-দাম্পত্য-প্রজনন-সম্পর্কের অর্থহীনত্ব ও অনুর্বরতার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে। 'চো রা বা লি' কাব্যগ্রন্থের 'গার্হস্থ্যাশ্রম', 'কবিকিশোর', 'মন-দেওয়া-নেওয়া', 'শিখণ্ডীর গান', 'উন্মনা' প্রভৃতি কবিতায় মুখ্য প্রতিপাদ্য আলম্বনরূপে গৃহীত হয়েছে বিশ শতকীয় নরনারীর প্রণয় ও যৌন-সম্পর্কের নিরর্থক বন্ধ্যাত্ব। সে-কথা ঘোষণায় কবির কোনো দ্বিধা বা কুণ্ঠা নেই। এলিঅটের মতোই বিশ শতকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন কতকগুলি চরিত্র ঘিরে বিষ্ণু দে-ও নরনারী সম্পর্কের বন্ধ্যাত্ব দেখিয়েছেন। এই সমস্ত চরিত্রের

কয়েকটি হল অলকা (কিম্বা অলকা বসু), লিলি, ডলু ওরফে মৈত্রেয়ী ঘোষ, সুরেশ, নবনীকান্ত, অমল, মোহিত, অনিরুদ্ধ রায়, সুবর্ণ প্রমুখেরা। চরিত্র উপস্থাপনে বিষ্ণু দে ও এলিঅটে একটা পার্থক্য আছে। এলিঅট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বন্ধ্যাত্ব দেখিয়েছেন বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে, আর বিষ্ণু দে দেখিয়েছেন অবিবাহিতের পূর্বরাগের জীবনে ক্লাব-ঘেঁষা সম্পর্কের মধ্যে। সম্ভবতঃ সমসাময়িক বাঙালী জীবনে এই ছবিটাই ছিল সুলভ। তবে এলিঅট যে-সামাজিক সম্পর্কের ছবি এঁকেছেন তাতে একজন নারীর বিপরীতে একজন পুরুষের অস্তিত্ব অনিবার্য ছিল, কিন্তু বিষ্ণু দে-র পক্ষে অনুরূপ অনিবার্যতা ছিল না। এরকম সূক্ষ্ম বৈষম্য সত্ত্বেও নরনারীর বিশ শতকীয় সম্পর্কের বন্ধ্যাত্ব বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো বৈষম্য নেই। 'কবিকিশোর' কবিতায় বিষ্ণু দে বন্ধ্যা প্রেয়সীর স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন:

> বন্ধ্যা প্রিয়ার দীপ্তি তোমার দেহে ফুরে।
> নহ মাতা তুমি, প্রেয়সী তোমার স্তব করি।
> প্রিয়ার মূর্তি! প্রেমে কাঁপে তনু বল্লরী,
> স্তনধারা কভু বক্ষে তোমার নাহি ঝুরে,...

বুঝতে অসুবিধা নেই যে রবীন্দ্রনাথের উর্বশী তত্ত্ব অতিক্রমণের যে-প্রয়াস 'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স'-এর যুগে, এও তারই আর একটা স্তর। রবীন্দ্রনাথের নভশ্চারী তত্ত্বকে এখানে ধরার ধুলায় নামিয়ে এনে বিশ শতকীয় প্রেয়সী তত্ত্বের মধ্যে বিলীন ক'রে দিয়েছেন বিষ্ণু দে। স্বর্গীয় একনিষ্ঠ প্রেম এ-যুগে 'অলীক শশবিষাণ'। 'বহুনিষ্ঠা'-ই এ-যুগের মিসেস পোর্টার-অলকা বসু-লিলি-সুইনি-সুরেশদের আচরণীয়, জৈবধর্মই প্রেমের একমাত্র ভিত্তি এবং পালনীয় ধর্ম।

> আসল কথাটা আমি যা বুঝি
> প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আমরা নতুন খুঁজি।
> নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাই তো খোঁজে--
> তার ওপর তো সে জীবের ধর্ম উপ্‌রি আছে।
> এরি নাম 'প্রেম'।
>
> কিন্তু মানুষ কেমন ক'রে যে এই তে বাঁচে—
> মানে, এই প্রেমে কাব্য ক'রেই সারাটা জীবন কাটিয়ে যে দেয়!
> ('মন-দেওয়া-নেওয়া')

'জীবের ধর্ম'-এর কিছুটা আভাসও কবি দিয়েছেন:

কিন্তু ডলুর দেহ ও মনের অলিগলি যত সবই জানা,
(আগেই বলেছি, অজানাই হল প্রেমের নানা,
শারীর মানস, ভাবের বাণী)
ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি,
ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে
ডলুই নিজে। (ঐ)

'সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজেই' এলিঅটের সুইনিরা ঘোরে, বিষ্ণু দে-র সুবর্ণ, সুরেশ, অমল, মোহিতরাও ঘোরে। জৈব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতেই এলিঅটের নায়ক জনৈক 'স্মল হাউস এজেণ্টস্ ক্লার্ক' নিয়মিত আসে টাইপিস্ট মেয়েটির ঘরে, অভ্যাসের বশেই যন্ত্রচালিতবৎ জৈব-বিনোদনটুকু নিষ্পন্ন করে এবং ইন্দ্রিয়ের হর্ষ নয়, একটা অভ্যাসের ল্যাঠা চুকে যাওয়ায় স্বস্তি অনুভব করে। বিষ্ণু দে-র নায়কও বিশ শতকীয় যান্ত্রিকতার অভ্যাসের দাস। প্রেমের টানে তো নয়ই, এমনকি প্রবৃত্তির তাড়নায়ও নয়, কেবল অভ্যাসের যান্ত্রিক খোঁচায়ই নায়িকার সঙ্গে মেলামেশা করে। তার অকপট স্বীকারোক্তি :

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি, তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।
অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি ; ('গার্হস্থ্যাশ্রম')

অভ্যাসের তাড়নায় যে-ভালোবাসা সে-তো 'প্রাকৃতিক ভালোবাসা'-রই নামান্তর। এই 'জীবের ধর্মে' হৃদয়ের কিম্বা আন্তরিকতার তো কোনো ভূমিকাই নেই। দিন-যাপনের গ্লানি থেকে উদ্ধারের জন্য অবসর যাপনের যান্ত্রিকতা-টুকুই প্রশ্রয় পায়।

সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি ?
আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক, লিলি। (ঐ)

এলিঅটও এই প্রাকৃতিক ভালোবাসার ছবি এঁকেছেন, বরং তিনি আরো বেশি স্পষ্ট, আরো বেশি সোচ্চার।

…and think of poor Albert,
He's been in the army four years, he wants a good time,
And if you don't give it him, there's others will,…

অনুর্বরতার নিখুঁত ছবি ফোটাতে গর্ভপাতের উল্লেখেও এলিঅট দ্বিধাহীন।

I can't help it, she said, pulling a long face,
It's them pills I took, to bring it off, she said.…

The chemist said it would be all right, but I've
never been the same.…
what you get married for if you don't want children?

এলিঅটের মতো অতখানি এগুতে পারেন নি বিষ্ণু দে, ভারতীয় সমাজজীবনের ছবি নিয়ে অতখানি এগুনো সম্ভবও ছিল না। এলিঅটের অনুসরণে বিশ শতকীয় যে-সমাজের ছবি এঁকেছেন বিষ্ণু দে, সেখানেও নায়কেরা বলতে পারে—

'একাধিক ওষ্ঠাধর ঠেকেছে এ কানে';

আর নায়িকারা, 'বহুনিষ্ঠা প্রেয়সী অপ্সরী'। কিন্তু বিষ্ণু দে এগিয়েছেন অন্যদিকে, এই সমাজের জীবনচর্যাকেই চরম বলে মেনে না নিয়ে তার ঊর্ধ্বলোক-বাসী এক নারীর স্বপ্ন দেখেছেন তিনি :

মৃত্যুর রঞ্জনরশ্মি-দিব্যালোকে পুরুষহৃদয়
অবশেষে অপঘাতে এই সত্য মানে।
কফির পেয়ালা হাতে,
শহরের স্তব্ধ প্রান্তে,
বিস্বাদ হৃদয়ে
বিষণ্ণ আলোয় ব'সে বিহ্বল রাত্রির
স্মৃতি দেখি আর ভাবি মনে;
কোন্ ক্ষণে
মননের সমুদ্র মন্থনে
রূপ নেবে এক নারী
মনোময় প্রাণপদ্মে সংসারের কারা আর তপ্ত শয্যা ছাড়ি?

অনুরূপ নারী 'উ র্ব শী ও আ র্টে মি স'-এর যুগে প্রেমপুটে উর্বশী আর উমাকে পাওয়ার চিরন্তন ছবি কল্পনার মধ্যেও সুপ্ত ছিল। 'চো রা বা লি'-র 'শিখণ্ডীর গান' কবিতায় ডিয়োটিমা, ডরথি প্রসঙ্গেও এই নারীর কল্পনা কবির সমর্থন পেয়েছে। ডিয়োটিমা বা ডরথিরা বহুনিষ্ঠা প্রেয়সী অপ্সরী নয়, তারা সঞ্জীবনী দিয়ে বাঁচার পথ দেখায় প্রেমাস্পদকে, কিন্তু বিশ শতকের সমাজে লিলি-রমা-অলকাদেরই ভিড়, পরিবেশটাও এদেরই উপযোগী। কিন্তু তারই মাঝে কোনোদিন সত্যিই ডিয়োটিমা বা ডরথির দেখা পাওয়া যাবে না এমন নৈরাশ্যের মধ্যে কবি আত্মসমর্পণ করতে পারেন নি।[২০]

ডরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে,…
মেলে নাকো ডিয়োটিমা, তার কিছু আছে কি প্রমাণ?

ডরথি-ডিয়োটিমার সুপ্ত স্বপ্ন মনের গোপনে পোষণ করেন ব'লেই সমসাময়িক সমাজে যৌনাচারের প্রাবল্যে ব্যভিচারের ব্যাপকতায় (এলিঅটও এর রূপকার) আশাহত কবির আশাভঙ্গের খেদ কোথাও-কোথাও ঝরে পড়েছে :

ভস্ম অপমান শয্যা ছেড়ে, পুষ্পধনু !
দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও ডন্‌জুয়ানের বেশে !
গন্ধমাদন এনে দিলে বৃথায় কে সে হনু ?
হে অতনু, তনুবিহীন বেড়াও দেশে দেশে !

ডন্‌জুয়ানও গিয়েছে ম'রে হল অনেকদিন
ঊর্ধ্ববাহু সেকালের সে তপস্বীদের সাথে।
মরেছে বটে- স্বর্গ তথা নরকও নারীহীন
(শাস্ত্রে বলে)—ডনের নেই শান্তি আত্মাতে।

ডনের প্রেত শরীরহীন ঘুরে বেড়ায় আজও
ভুয়িংরুমে- হে অতনু ! বীরতনুতে সাজো।

ডন্‌জুয়ান তো মানুষই, তাই পশ্চাতের দৈবপ্রেরণাটুকুই কবির আক্রমণের লক্ষ্য হতে দেরী হয় না, খেদের কথা অতনুর সঙ্গে তপস্বী শিবের প্রতিও জানিয়ে অনুযোগ করতে দেখা যায় কবিকে :

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ !
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে প্রশ্বাসি,
সুরেশ শুধু খায় দেখি প্লুকোজ !

'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড-'এর যে-দিকটি বেশি আকৃষ্ট করেছিল তা এই যে, কবিতাটি হয়ে উঠেছিল সমসাময়িক নগরজীবনের পুরাণ—লন্ডন শহরের জীবনচর্যার যুগোপযোগী পাঁচালী। কবিতাটি যেমন পাশ্চাত্যে তেমনি প্রাচ্যের বাংলা সাহিত্যেও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার রোমান্টিক আলম্বন থেকে দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য করেছিল, সেই সঙ্গে কবি-দৃষ্টিকে করেছিল শহরমুখী। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নাগর সভ্যতা, নাগরিক মানুষ, তাদের জীবনচর্যা ও সমস্যা কাব্যের ইতিহাসে কেবল একঘেয়েমি কাটাতেই সাহায্য করে নি, নতুন সম্ভাবনার পথও খুলে দিয়েছিল। এ কথা সত্য যে শহরকে কবিতার পটভূমি রূপে গ্রহণের পক্ষপাত এলিঅট কবিজীবনের গোড়া থেকেই দেখিয়েছেন। 'দি

লাভ সঙ্ অব্ জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক'-এর আরম্ভই সান্ধ্য শহরের অর্ধজনহ রাস্তার বর্ণনা দিয়ে।

Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells :

এরকম বিক্ষিপ্ত ছোটখাট শহুরে ছবি লন্ডনের হলুদ ধোঁয়া ও কুয়াশার মতোই এলিঅটের প্রাক্-ওয়েস্ট ল্যান্ড যুগের নানা কবিতাকে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সমস্তই সাধারণীকৃত ছবি ও বর্ণনা অর্থাৎ এই সব সাধারণভাবে যে-কোনো শহরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য. বিশেষরূপে লন্ডন শহরের ছবি ও বর্ণনা ব'লে চিহ্নিত করা যায় এমন মোক্ষম ছাপ সম্ভবতঃ এদের মধ্যে অনুপস্থিত। ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর জগতে পৌঁছেই প্রথম সাধারণীকরণের মোহ কাটিয়ে উঠলেন, লন্ডনকে একান্তই লন্ডন রূপে উপস্থাপিত করার ভূমিকা গ্রহণ করলেন ঃ

Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet.
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint Mary Woolnoth kept the hours
With a dead sound on the final stroke of nine.

বর্ণনাটি যে বিশেষভাবে লন্ডন শহরের সে কথা না বললেও চলে। কবির দিক থেকে সে কথা গোপন করার কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত তো হয়ই না, বরং লন্ডন ব্রিজ, তার পার্শ্ববর্তী একটি রাস্তা এবং একটি গির্জার উল্লেখ ক'রে কবি স্পষ্টতঃই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর পটভূমির শহরটিকে।

কলকাতা শহরকেন্দ্রিক অনুরূপ বর্ণনা বিষ্ণু দে-রও আছে ঃ

ট্রাফিক থমকে দাঁড়ায়, উঁচোট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের চোঙার ধোঁয়ায়
পল্টনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।

জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপন সঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে,
পিঁপড়ের সারি

গৌড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর।[৪১]

এলিঅট এবং বিষ্ণু দে-র উদ্ধৃত কাব্যাংশ দুটির প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য স্বতঃপ্রকাশিত। লণ্ডন ব্রিজ-এর তুল্যার্থক কলকাতার হাওড়া ব্রিজ, কবিকল্পনায় একই প্রতীক-দ্যোতনাও জাগিয়ে তোলে। লণ্ডন ব্রিজের ওপর বয়ে চলা চলমান জীবনের স্রোত আর হাওড়া ব্রিজের 'আশে আর পাশে, সামনে পিছনে/সারি সারি পিঁপড়ের সার'—উভয়েরই একটাই অর্থ 'death had undone so many' অর্থাৎ,

এত লোক জীবনের বলি,…
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপন সঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে…

উভয় কবিরই এ উপলব্ধি এই প্রথম। এলিঅট বলেন, 'I had not thought'; বিষ্ণু দে-ও স্বীকার করেন,

জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো…
মানিনি আগে…
জানিনি মানিনি আগে,…

কিন্তু এও বাহ্য। আসল কথা, লণ্ডনের পটভূমিকায় ব্রিজ এবং তার কাব্যিক ব্যবহার বিষ্ণু দে-র কাছে প্রতীক-ব্যঞ্জনাবহ। এই ব্যঞ্জনাই রূপ পায় হাওড়া ব্রিজের প্রসঙ্গে কলকাতা শহরের পটভূমিকায়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'জীবনের বলি'-র উপলব্ধি। তাই, প্রায় দু'-দশক পরে রচিত 'না ম রে খে ছি

'কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'হাওড়া ব্রিজ' কবিতায়ও অনুরূপ উপলব্ধি ভাষারূপ পেয়েছে :

এবং উপরে—উপরে তো সাঁকো শুধু
এপার-ওপার সারা দিনরাত করে
অবিরাম আনাগোনা
জীবনের স্রোত
যায় কোন্ মোহানায়, কোন্ ভরাটিতে ?
দেশবিদেশের স্রোত
প্রত্যহের সপ্তাহের পালাপার্বণের
জীবনের মরণের, নাকি বুঝি মরণের জীবনের,
জীবিকার, জীবিকাহীনের, উদ্বাস্তুর বুভুক্ষুর,
উন্নাসিকেরও, কদাচিৎ আমীর ওমরার —
সর্বদাই হাওয়ায় কে যায়—
জনস্রোত চলে, কাজে বা অকাজে, ঘরে,
প্রত্যাশী সকালে, মধ্যাহ্নে শোথে, সান্ধ্য ব্যর্থতায়,—

'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতার উদ্ধৃত অংশের মূল প্রতিপাদ্য কিন্তু হাওড়া ব্রিজ নয়, 'জীবিকার পথে পথে এত লোক'-ও নয় ; এর মূল প্রতিপাদ্য কলকাতা শহরের শ্লেষমাখানো প্রশস্তি—'গৌড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর !' শহর পুরোপুরি বিংশ শতাব্দীর না হলেও আধুনিক মানব সভ্যতারই ফসল। মৌমাছিদের মধুচক্র গ'ড়ে তোলার মতোই অধুনিক মানুষ শহর গড়ে। সভ্যতার এই মধুচক্র থেকে শহুরে মানুষের কপালে মধু জোটে কিনা কে জানে, কিন্তু শহর যে হাজারো মানুষকে ঘুরিয়ে মারে, এমনকি পথেও বসায়, এলিঅটের মতোই বিষ্ণু দে-ও এই উপলব্ধিই ব্যক্ত করেছেন নাগর সভ্যতা প্রসঙ্গে।

স্পষ্টতঃই নগরচেতনায় এলিঅট এবং বিষ্ণু দে-র নৈকট্য আছে। অনুমিত হয়, কবিতার আলম্বন ও পটভূমি বিষয়ে এলিঅটের সাফল্যের দৃষ্টান্ত বিষ্ণু দে প্রমুখের সামনে বিরাট সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিল। এঁরাও এলিঅটের অনুসরণে কবিতার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ালেন শহর কলকাতাকে। জীবনানন্দের মতো রোমাণ্টিক 'রূপসী বাংলা'-র কবিও কলকাতার যুগোপযোগী আবেদন উপেক্ষা করতে পারলেন না। ফলে একদিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির কবিতার পশ্চাদপসরণ হল ত্বরান্বিত ;

অন্যদিকে পটভূমির ক্ষেত্রে ক্রমেই শহরের প্রাধান্য হল অবিসংবাদিত, কোণঠাসা হল গ্রাম আর তার মাঠ-ঘাট। কলকাতা অর্বাচীন কালের সৃষ্টি হলেও প্রশাসনিক গুরুত্ব এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে অত্যল্পকালের মধ্যেই ছাপিয়ে উঠেছিল আর সকলকে। উনিশ শতকের শেষ থেকে এই শহরের ক্রমবর্ধমান মানুষের ভিড়, ক্রমেই পর্যুদস্ত জনজীবন, তার নিত্যনূতন সমস্যা খুব বেশি গুরুত্ব পেতে সুরু করল। প্রশাসনের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা শিল্পসাহিত্যেরও কেন্দ্রভূমিরূপে কলকাতা অবিসম্বাদী স্বীকৃতি পেল। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্যের জগতে কলকাতাকে আর অপাংক্তেয় ক'রে রাখা গেল না। কল্লোল-গোষ্ঠীর কবিরা কলকাতার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন। অবশ্য রবীন্দ্র ঐতিহ্যের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে এই শহরকেন্দ্রিক কাব্যসৃষ্টিকেই তাঁদের মনে হয়েছিল অনন্য সহায়। বাংলা কবিতার ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত নিঃসন্দেহে ছিলেন ব্যতিক্রম, তিনিই প্রথম কবিতালক্ষ্মীকে শহরমুখী করার প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে-প্রয়াস স্থায়ী স্বাক্ষর এঁকে যেতে পারেনি কেবল তাঁর হাল্কা চটুল কৌতুকের দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই। এলিঅটের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিল কল্লোল-গোষ্ঠীর কবিদের চোখের সামনে, তাই তাঁদের চোখেও কৌতুক এবং মুখে শ্লেষ থাকলেও কলকাতা চর্চায় তাঁদের যথার্থ নিষ্ঠা ছিল, নাগর সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিই ঠাঁই পেয়েছিল তাঁদের কবিতায়, আর পরিণামে ইংরেজীর মতোই বাংলা কবিতারও স্থায়ী মোড় ফিরেছিল।

এলিঅটকে কোনো সমালোচক 'নাগরিক কবি' আখ্যা দিয়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে অনুরূপ আখ্যা খুব একটা অশোভন নয়। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও 'নাগরিক কবি' আখ্যা খুবই সঙ্গত। নাগর সভ্যতার মানুষ (বলা বাহুল্য, বিষ্ণু দে-র কাছে নগরের অর্থই হল কলকাতা), তার জনজীবন, দৈনন্দিন জীবনচর্যা, নিত্যদিনের সমস্যা, দমবন্ধ হয়ে আসা অসুস্থ পরিবেশ, বিকৃত নাগরিক সভ্যতা সংস্কৃতি প্রভৃতির একনিষ্ঠ রূপকার তিনি। কবি বিষ্ণু দে জন্মসূত্রেই নাগরিক, অর্থনৈতিক ভাঙনের মুখে শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের দিনযাপনের গ্লানিটাই বেশি চোখে পড়েছিল তাঁর। তিনিও এলিঅটের মতে এই দিকটাই কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু তা হলেও বিষ্ণু দে-র উপস্থাপন এলিঅটের অনুকরণ নয়, আপন বৈশিষ্ট্যে প্রতিভায় তথা প্রাতিস্বিকতার ভাস্বর। (এখানে স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথও জন্মসূত্রে নাগরিক; কিন্তু শহর নয় গ্রাম বাংলাই তাঁর চোখে মোহাঞ্জন মাখিয়েছিল। সে-যুগটাই ছিল

রোমাণ্টিক, জীবনচর্যা এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিটাও। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে-সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জীবনচর্যা এবং রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেল। এই যুগেই বিষ্ণু দে-রা এলেন, এঁদের চোখে প্লানিটাই একান্ত সত্য।) যদিচ লণ্ডন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে এলিঅট জীবনের যে-মিছিল দেখেছেন এবং যে-উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন, হাওড়া ব্রিজের ওপর বিষ্ণু দে-ও জীবনের অনুরূপ মিছিলই দেখেছেন এবং প্রায় সেই একই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন।

বিষ্ণু দে-র কাছেও নগরচেতনা কোনো বিক্ষিপ্ত চেতনা নয়, বন্ধ্যাত্বচেতনারই নামান্তর। এলিঅট নগরজীবনে বন্ধ্যাত্ব দেখেছেন, বিষ্ণু দে-ও। চোরাবালিতে যে-বন্ধ্যাত্বের ছায়া দেখেছিলেন, নগরজীবনেও সেই একই বন্ধ্যাত্বের ছায়া দেখেছেন।

নগরের ভিড়, ব্যর্থ দিনের জ্বালা!
অসহায় ভীরু? শুধু তার পথ চলা?
বন্ধুর ভ্রূ-ও কুটিল—ঋণের ভীতি?
অগণন লোক—তবু জ্বলা, শুধু জ্বলা। ('উভচর')

নাগর সভ্যতা বিশ শতকীয় মানুষের জীবনে অভিশাপ—প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিন ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে মানুষের জীবন, জীবনের স্বাদ তিক্ততায় ভরিয়ে তুলছে। 'এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস', এ উপলব্ধি বিষ্ণু দে-র মতো তিরিশের দশকের কবিদেরই।

প্রতিটি মুহূর্তে মোর মূর্তি পায় তিক্ত রসহীন
দুর্বাসা বিশ্বের ক্রূর সর্পফণা অশান্ত কৌতুক।
সূর্য দেয় অর্থহীন স্বচ্ছ তার বিদ্রূপ যৌতুক,
রাত্রিশেষে নিদ্রাহীন চুম্বনের জ্বালা হানে দিন।
ভুলে গেছি কিবা ভুল—দিনগুলি ক্লান্ত হতাশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো।
প্রত্যহ প্রভাতে জানি দীপ্ত দিন ব্যর্থতায় হত
মিলাবে রাত্রিতে বৃথা,—এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস। ('কবিকিশোর')

অনুরূপ দিনরাত্রির নির্মম উপলব্ধি বর্ণনা অন্যত্রও আছে। অসুস্থ পরিবেশের সে ইতর জীবনযাত্রা কোটরবাসের মতোই অস্তিত্বহীন।

শহরের ভিড়ে হাড়ে হাড়ে চেনা পাহাড়ী হাওয়ায় রোজ
শেষ করি প্রত্যহ,
আমাদের ঘিরে তনুমানসার দুরন্ত জীবাণুরা

মরিয়া সাহসে ঘুরে মরে অহরহ।...
ছিন্ন ভিন্ন চাঁদের আলোতে নিদ্রার অধিকার
আমাদের রাত ক'রে দেয় সমতল।
কেটে যায় দিন, জীবনযাত্রা মুখর ইতরতায়—
কম্প্র কোটরে বাস। ('দ্বিধা-দম্পতি')

জীবনের সমস্ত কিছুই যেখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সেই অনুর্বরতার বিচরণভূমি শহরে মন বাসা বাঁধতে চেয়ে বিফল হয়, ত্রিশঙ্কুর মতো নিরালম্ব হয়ে অস্তিত্বই বিপন্ন হয়।

অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা ?
এ মরা শহরে নীড় সন্ধানী মন
হারাল চতুর উভচর দিশা তার।
চিরকাল কাকতালীয়ের যাওয়া-আসা!
কোন প্রারব্ধে করেছে সমর্পণ
বহুধাভক্ত ত্রিশঙ্কু তার ভার। ('বেকারবিহঙ্গ')

এরকম নাগর পরিবেশের মাঝেও কিন্তু কবি প্রেমের নীড় রচনার স্বপ্ন দেখেছেন, কবিহৃদয়ের এবং কবিকল্পনার এখানেই জিত।

স্তব্ধ শহরে করুণ আলোয় নিরালা কোণায়
সুরের মতোই উতল অথই বিধুর হিয়ায়
বসব দুজনে --মুখ ও কপোল ঠেকবে মোহে।[২]

প্রেমের ওপর ভর ক'রেই দৈনন্দিন নাগরিক ভিড়ের গ্লানি গোলমালের নরকের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস, নিরালায় মধুচক্র গড়ে তোলার স্বপ্ন ঃ

শহরের বুকে পাঁচতলায়
নেব সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট্!
ট্রাম বাস্ ভিড় নিত্য যায়—
উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে দোঁহায়
ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায়!
গোলমাল যেন পায়ের ম্যাট্!
শহরের বুকে পাঁচতলায়
মধুচক্র সে ছোট্ট ফ্ল্যাট্। ('কবিকিশোর')

হতে পারে এ নীড় বন্ধ্যা, এ প্রেম অনুর্বরতারই প্রতীক ; কিন্তু এ স্বপ্ন সম্ভবতঃ এলিঅটে নেই, বিষ্ণু দে-র কবিতায় আছে। ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-এর কৈশোর

স্মৃতি ধূ ধূ মরুর মধ্যে ওয়েসিস, তবে বন্ধ্যাত্বই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেও।

প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী ইয়োরোপ, ইয়োরোপীয় সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই অস্তিত্বহীন (unreal) মনে হয়েছিল এলিঅটের, সমস্ত কিছুর বন্ধ্যা ও অনুর্বর রূপটাই বড় হয়ে চোখে ধরা দিয়েছিল। ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তিত মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপ তথা তার ইতিহাস সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাঁর স্পষ্টতঃই মনে হয়েছিল :

A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock,

কালের পটে নামমাত্র আঁচড়টুকু রেখে প্রাচীন ঐতিহ্য সব মুছে গেছে, মিলিয়ে গেছে অতীতের গৌরবময় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মানুষের ইতিহাসের গগনচুম্বী মিনার সব ভেঙে পড়ছে, নাগরিক সভ্যতাও অবাস্তব মনে হয়েছে এলিঅটের।

What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Viena London
Unreal

কালের বিবর্তনে প্রাচীন গৌরব লুপ্ত হয়, প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ ভূমিসাৎ হয়, এ বোধের উপলব্ধি কবি বিষ্ণু দে-রও। কিন্তু এর জন্য ক্ষোভ নয়, স্বস্তিই অনুভব করেন তিনি।

ওরে যাত্রী, গেছে কেটে যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি।
কারণ

যে প্রাচীরে উঠেছিল হেলেন, সে প্রাচীর তো ধূলিসাৎ কোন্ কালে ধূলোয়
ধূলোয়। অরফিউস্ ফিরে গেছে বাঁচা গেছে গীতশূন্য বৈতরণী তীরে পুনরায়।
পেনেলোপি লুপ্ত হল কবেকার ভূগোলের কোন্ ইথাকায়।···
ব্রুন্‌হিল্ডের স্বেচ্ছাচিতা বয়ে আনে অলকায় অক্রিম গোধূলি।
ভাল্‌হালায় লেগে গেল কল্কিজ্বালাদাবদাহ, ব্রুন্‌হিল্ডের বিরিক্ত অঙ্গুলি।
সর্বভুকে শেষ হল বেশ হল সীগ্‌ফ্রীডের দেবদেবীগুলি।
সেকালের প্রেমগাথা রক্তাক্ত সন্ধ্যায় গাঁথা চিত্তঝঞ্ঝা-রাশি।
ফ্রান্‌চেস্‌কার আর্তনাদ—বিধাতাকে ধন্যবাদ! আজকাল হয়ে গেছে বাসি।

বিষ্ণু দে-র স্বাস্তিবোধেব কারণ স্পষ্ট। প্রাচীন যুগে জীবনের পরিধি ছিল ব্যাপকতায় ভরা, স্থূলতায় ঠাসা; সে-জীবনে আধুনিক কালের মতো সঙ্কীর্ণতা বা সূক্ষ্মত্বের ঠাঁই ছিল না। 'তাদের যাত্রা সংক্ষেপ জানে না, মাত্রা মানে না, তাদের হাসি মৃদু নয়, বর্বরের হাসি।' শুধু কি তাই! 'সেকালের চিত্তঝঞ্ঝা সেকালের স্থূলপেশীস্নায়ুরই পোষাত।' আজকালকার দুর্বলপেশী-স্নায়ুতে প্রাচীন কালের বিরাট মাপের কীর্তি ও ঐতিহ্যের ভার বহন করার ক্ষমতা কোথায়! তাছাড়া এলিঅটের মতো বিষ্ণু দে-ও বর্তমান যুগের উত্তরাধিকারকে বন্ধ্যাত্ব এবং অনুর্বরত্বের উত্তরাধিকার ব'লে গ্রহণ করেছেন:

কোনো বিচিত্রবীর্য কি
পূর্বজ কোনো দশরথ
রাজযক্ষ্মার ক্ষয়ভার,
জায়ুজ রণের ক্ষয়পথ,
দায়ভাগে নির্লজ্জ কি
রেখে গেছে পিছে উপহার?

তাই কি ঘুমের নীলিমা
বৈতরণীতে চেয়েছে?
পলে পলে প্রাণ-পরাভব?
মরীচিকা-ফাঁকা ত্রিসীমা?

তাই কি রক্তে চেয়েছে
রসাতলব্যাপী নীল হিম
অপস্মারেরই বিপ্লব ? ('অপস্মার')

এলিঅটসুলভ একঘেয়ে হতাশাময় অবসাদগ্রস্ত মানসিকতার (limbo of boredom) প্রকাশ ঘটেছে বিষ্ণু দে-র 'চো রা বা লি র' কয়েকটি কবিতায় : এই একঘেয়ে অবসাদই আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞান, বিংশ শতাব্দী সুরু হওয়ার আগে থেকেই এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, বাংলা সাহিত্যে এল তিরিশের দশকের কাছাকাছি সময়ে। 'ক্লান্ত দেহ শ্রান্ত মনের' কথা বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থেও ছিল, সেই সঙ্গে সেই পরিবেশের কথাও বলা হয়েছে কোথাও-কোথাও যা মানুষের মনের গভীরে অবসাদের সঞ্চার করে :

পশ্চিমে নিভন্ত আজ আলোকের চুম্বনের জ্বালা
কালো হয়ে গেল তার ওষ্ঠাধররক্তিম আবেগ,
পীড়িত চাঁদের মুখ—বর্ণহীন কুণ্ঠিত করুণ,
তারারা অস্পষ্ট আজ মৃত্যু-কুয়াশায়,
ধূসর মেঘের স্রোতে আজ
ভেসে চলে প্রাণহীন প্রিয়ার শরীর। ('পর্যাপ্তি')

কিম্বা,

পরিপক্ক ফল আজ পড়তে তো পারে না মাটিতে
গরমে যে নিরেট বাতাস।
এ গুমোট দেয় না ছিন্ন ছিন্ন ক'রে দুই হাতে
চিরে চিরে।
বাতাস গিয়েছে দূর সমুদ্র বীজনস্নিগ্ধ
নারিকেলমর্মরিত প্রবালের দ্বীপে। ('গ্রীষ্ম')

এই পরিবেশে জীবনে অবসাদ আসাই স্বাভাবিক, এ উপলব্ধিই আকাঙ্ক্ষিত :

অবসন্ন ব'সে দুইজনে।
কর্মহীন অবকাশ কর্কশ কঠিন গুমোটে
কাটে রৌদ্রতাপে। (ঐ)

কিম্বা,

আকাশে নেইকো আলো, পৃথিবীর নিভে গেছে আলো।
অরণ্যের অন্ধকারে ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে।

অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে আমি ডুবে আছি একা।
কন্টকিত অন্ধকারে চেতনায় অবসাদ ক্ষরে। ('অতিক্রম')

'উর্বশী ও আর্টেমিস্'-এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থরূপে 'চোরাবালি-' তে যতখানি আকাঙ্ক্ষিত ততখানি ব্যাপকতা নেই অবসাদগ্রস্ত মানসিকতার, বিভিন্ন কবিতায় মাঝে-মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে এরকম প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত হলেও 'চিত্ত হল মৃতপ্রায়, অসাড় নীরব অন্ধকারে' এ উপলব্ধির প্রগাঢ়তা অনস্বীকার্য।

স্নায়ুতে ছন্দ কাঁপে
নাচুনি ধানের
ক্লান্তি ছড়ায় তার
শান্ত প্রলেপ।
প্রেমেই দিয়েছে মন
ঘুম-অবলেপ।...
চাঁদের চাহনি নেই,
মন নিঃঝুম।
আজ আর প্রেম নয়
আজ শুধু ঘুম। ('গার্হস্থ্যাশ্রম')

কিম্বা,

নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক!
দুপাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ। ('উভচর')

অথবা,

বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে!—
কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর
পাব নাকি আমি
জীবনের শেষ দিনের আগে?
ক্লান্ত লাগে। ('মন-দেওয়া-নেওয়া')

এরকম অভিব্যক্তি বিক্ষিপ্তভাবে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে, তবে অবসাদগ্রস্ত মানসিকতার প্রগাঢ়তা পাওয়া যায় 'দ্বিধা-দম্পতি' কবিতায়ঃ

অবসর হয় আমাদের কাছে বিলাসী দ্বিধান্বিত,
কীর্তিও পায় ভয়,
অন্তরঙ্গ অবসাদ শুধু আমাদের পাশে ঘেঁষে,

আমাদের কাজ ছোট জয়পরাজয়।
মৃত্যু দিয়েছে আমার হৃদয়ে মৈত্রীর বিষটীকা
উদ্ধত উজ্জ্বল। (ঐ)

মার্কস্ ও ফ্রয়েডীয় দর্শনে বিষ্ণু দে-র গভীর আস্থা এবং তাঁর কাব্যে ঘটেছে এর রূপায়ণ, এলিঅটের সঙ্গে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় অমিল এখানেই। সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা, মার্কসবাদের প্রভাব বিষ্ণু দে-র 'পূর্ব লেখ' কাব্যেই প্রথম। এ ধারণা সত্য নয়।[৪৩] 'চোরাবালি'-র যুগ থেকেই কবি মার্কস্ তথা ফ্রয়েডীয় দর্শনে পীড়িত।

১. ···আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়?

২. আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মন্থিত ক'রে।

৩. কবে ভেসে যাবে সম্বিৎ···
ডুববে অহম্ কশ্চিৎ

৪. মরিয়া লিবিডো আজও কাউন্সিলের প্রবল গলায়

৫. সে শিখা অথবা সাবলিমেশনে দেয়ালি প্রেমে,···

মার্কসীয় তথা ফ্রয়েডীয় পরিভাষার অনুরূপ যথেচ্ছ ব্যবহারের দুর্বলতা 'চোরাবালি'-র যুগ থেকেই অনুভূত হয়। এটাই স্বাভাবিক। তিরিশের দশকে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কস্ এবং ফ্রয়েড-চর্চার ব্যাপকতা দেখা যায়। 'ইয়োরোপীয় কবি'-র মানসিকতার অনুসারী বিষ্ণু দে-ও সমসাময়িক প্রগতিশীল মতবাদকে কাব্যের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন।

এলিঅটের মধ্যে অনুরূপ প্রবণতার একান্ত অভাব বিস্ময়াবহ। এলিঅটের জন্মের বহু পূর্বেই মার্কস্ ও এঙ্গেলস্-এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিপ্লবাত্মক সাম্যবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪৪] ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যার তত্ত্বাদিও ইয়োরোপে প্রচারিত হয়েছিল এলিঅটের কাব্যচর্চার অব্যবহিত পূর্বেই।[৪৫] তথাপি ঐ দুই তত্ত্বে এলিঅট প্রভাবিত হন নি। অথচ তাঁর সমসাময়িক জেমস্ জয়েস্, ডি.এইচ.লরেন্স প্রমুখ ফ্রয়েডীয় দর্শনে গভীরভাবে প্রভাবিত।[৪৬] অবশ্য ইংরেজী কাব্যেও মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব দেখা যায় তিরিশের দশকেই। সিসিল ডে লুইস, ডব্লু. এইচ. অডেন, লুইস ম্যাকনীস্ প্রভৃতি মার্কস্বাদে গভীরভাবে আক্রান্ত। মনে হয় ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক একটা আবরণ এলিঅটের অন্তরে ছিল ব'লেই ফ্রয়েডীয় বা মার্কস্বাদ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। বিশ শতকীয় ওয়েস্ট ল্যান্ড কিম্বা

নগর জীবনের বন্ধ্যাত্বের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন তিনি ঔপনিষদিক আধ্যাত্মিকতায়। পক্ষান্তরে বিষ্ণু দে-র মনে আধ্যাত্মিকতা প্রশ্রয় পায় নি ব'লেই নাগরিক সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব-চেতনার নিরালম্ব শূন্যতার সমাধান খুঁজতেই তাঁকে কখনো শরণাপন্ন হতে হয়েছে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার, কখনো বা অনিবার্য পরিণতিরূপে গ্রহণ করতে হয়েছে মার্কসবাদকে।

একথা স্বীকার্য, যে 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থে ফ্রয়েড তথা মার্কসবাদের প্রাধান্য এলিঅটীয় প্রভাবের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। 'চোরাবালি'-তে ছিল এলিঅটীয় প্রভাবের প্রাধান্য, ফ্রয়েড্ বা মার্কসবাদ নিতান্ত অন্তঃস্রোত। এখানে উভয়েই তুল্যমূল্য। কবির মনোজগতের বিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব দিলে বলতে হয় মার্কসবাদ তথা ফ্রয়েডীয় মনোদর্শন প্রাধান্য পেতে-পেতে ক্রমেই এলিঅটীয় প্রভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে। 'পূর্বলেখ'-পরবর্তী পর্যায়ের 'সন্দ্বীপের চর', 'সাত ভাই চম্পা', 'অন্বিষ্ট' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে মার্কসবাদের উচ্চরাবের পাশাপাশি এলিঅটীয় প্রভাব নেহাতই ক্ষীণ এবং অনুল্লেখ্য। সে-বিচারে 'পূর্বলেখ'-ই এলিঅটীয় প্রভাবের পরাকাষ্ঠা ঘটেছে একথা স্বীকার করতে হয়। এলিঅটীয় কাব্যরীতি ও কাব্যপ্রকরণের প্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গে এলিঅটীয় কাব্যবিশ্বাস,কাব্য-প্রতীক এবং কাব্য-উপাদানগুলি এই কাব্যেরও বিভিন্ন কবিতায় কাব্য-আলম্বনরূপে ব্যবহৃত। বন্ধ্যাত্ব, নাগর সভ্যতা, নাগরিক প্রেম, নাগরিক জীবনের অবসাদ, বৃষ্টির মধ্যে জীবন-সঞ্জীবনী লাভের গভীর বিশ্বাস এই কাব্যেও বর্তমান। 'আবির্ভাব', 'ভাংচি', 'পদধ্বনি', 'জন্মাষ্টমী' প্রভৃতি কবিতায় এবং 'চতুর্দশপদী' ও 'বৈকালী' সনেটগুচ্ছের কয়েকটি সনেটে এলিঅটীয় প্রভাব তথা উপাদান ব্যবহারের প্রভূত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

'চতুর্দশপদী' কবিতাগুচ্ছ (বা সনেটগুচ্ছ) সম্পর্কে মূল্যবান্ তথ্যটি হল, এই কবিতাগুলি (বা সনেটগুলি) সর্বাংশে নগর জীবনের কবিতা। এলিঅটের 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'যদি লণ্ডন শহরের কাব্য হয় তাহলে বিষ্ণু দে-র 'চতুর্দশপদী' সনেটগুচ্ছও কলকাতা শহরের কবিতা। এলিঅটের মতোই বিষ্ণু দে-ও কলকাতা-কেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতা, পরিবেশ, জীবনচর্চা তথা দিনযাপনের গ্লানির একটা সামগ্রিক রূপ তুলে ধরেছেন। এই সনেটগুলির নামকরণে কলকাতার বিভিন্ন এলাকার নাম গৃহীত হয়েছে। এর থেকে অনুমিত হয় যে বিভিন্ন অংশের কলকাতার ছবি আঁকতে চেয়েছেন কবি। প্রদত্ত নামের তালিকা থেকে এই সনেট-গুলিতে বিধৃত কলকাতার একটা চৌহদ্দিও টানা যায়—যা উত্তরে ও পূর্বে

মানিকতলা খাল, দক্ষিণে খিদিরপুর এবং পশ্চিমে হাওড়া পর্যন্ত প্রসারিত ; কিন্তু সামগ্রিক রূপটা চৌরঙ্গি, লায়ন্স্ রেঞ্জ,ডালহৌসি, হাইকোর্ট পাড়ার কলকাতারই রূপ।

চারিধারে সরীসৃপ ধূর্ত নাগরিক
অর্থকামস্বর্গ-ছিদ্র খোঁজে ঘুরে ফিরে।
ধর্মরাজ্য লণ্ডভণ্ড, সহস্র শরিক।
অধিকার-ভেদে আর ভেজে নাকো চিঁড়ে !
দিকে দিকে বক্রগতি উদ্ধত কৌরব
চলে সূর্য-বিতাড়িত অন্ধকার ঘরে।
নীরন্ধ্র অবীচি আর দুর্গন্ধ রৌরব
মর্ত্যে এ কে কালকেতু জনতায় ভরে !

বিষ্ণু দে-র এই কাব্যাংশ থেকে মার্কস্বাদের বিশেষ প্রবণতাটুকু নিংড়ে ফেললে নাগর সভ্যতার যে-রূপ অবশিষ্ট থাকে তাকে এলিঅটবর্ণিত নাগর সভ্যতার ছবির সমগোত্রীয় বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। হাওড়া ব্রিজ ঘিরে এলিঅটের সমধর্মা চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করেছি 'চো রা বা লি র' 'টপ্পা-ঠুংরি' এবং 'না ম রে খে ছি কো ম ল গা ন্ধা র' কাব্যগ্রন্থের 'হাওড়া ব্রিজ' কবিতায়। 'চতুর্দশপদী' সনেটগুচ্ছের 'হাওড়ায়' সনেটেও হাওড়া ব্রিজ সম্পর্কে অনুরূপ চিন্তার আভাস সূচিত হয়েছে ঃ

বৈরাগিনী চলে নিচে চঞ্চল জোয়ারে ;
পন্টুনের দিকে দিকে দুরন্ত স্টীমার।
সেতু টলোমলো বাসে, পদাতিকে, কারে,
দলে দলে চলে, যেন পালায় সওয়ার।

'খিদিরপুর' সনেটে ভাগীরথী নদী সম্পর্কে চাঁদ সদাগরের সমুদ্রযাত্রার কথা মনে পড়েছে কবির, মনে পড়ছে পাল-যুগের গৌরবময় স্থলূপের কথা ; কিন্তু রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে এ স্বপ্নচারণার কোথাও মিল নেই। বাস্তবের ছবি তো শুধুই ঃ

আলকাৎরা, কয়লাকুচি, ধোঁয়া আর তেল !

টেমস্ নদী প্রসঙ্গে এলিজাবেথ ও লেস্টারের প্রমোদ-বিহারের কথা মনে পড়ে ; কিন্তু রূঢ় বাস্তবের ছবি সেখানেও ভেসে ওঠে ঃ

The river sweats
Oil and tar…

৮-সংখ্যক সনেটে ('চৌরিঙ্গী') আধুনিক নগরজীবনের লক্ষ লক্ষ ক্ষীণপ্রাণ মানুষদের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে :

সন্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছত্রভঙ্গ যারা—
চৌরিঙ্গীর গোষ্ঠ হতে ধেনু, আত্মহারা
কর্মবীর কেরানি ও পেরাম্বুলেটরে
শিশুকে মায়ের বুকে।…

উদ্‌ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।
সহে না দুর্বহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর।
স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন।
সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি-মোড়ে
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদৈব ছিন্নভিন্ন একতা আতুর—
বুঝিবা ভূকম্পে আসে কংসের স্যন্দন।

অনুরূপ জীবনের শরিক যারা, নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরের অবসাদে যাদের জীবনচর্যা ছিন্নভিন্ন, তারাই 'ভ্রূকুটি কুটিল শূন্য সময়ের ভয়ে'-ই নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণা এড়াতেই কোনোরকম ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় না দিয়েও ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরে, পরকীয়া প্রেমে সান্ত্বনা খোঁজে, একঘেয়েমির ক্লান্তি অপনোদনে প্রয়াসী হয় :

বিরাট নীলিমা চিরে' খুঁজে ফিরি প্রিয়া।
ভ্রূকুটি কুটিল শূন্য সময়ের ভয়ে
নিঃসঙ্গের অনুচর স্বপ্ন জাগানিয়া
ঈশ্বর পাকড়ি, যদি পাই পাপক্ষয়ে।
ইতিহাস পথ জোড়ে, দ্বাপরের লয়ে
ঈশ্বর মুণ্ডিত শির, মাৎস্য হিস্টিরিয়া।
সন্ধ্যার স্বপ্নালু নীলে, উদাস মলয়ে
পরশপাথর তাই খুঁজি পরকীয়া।[৪৭]

বলা বাহুল্য, নাগরিক জীবনের একঘেয়ে অবসাদ অপনোদনের জন্যেই অনুরূপ পরকীয়া প্রেমের কবলে আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত এলিঅটের কাব্যের পাত্র-

পাত্রীরাও। সম্ভবতঃ তারাও পরকীয়ার মধ্যেই একঘেয়ে ক্লান্তিকর দিনচর্যার অবসাদমুক্তির পরশপাথর খোঁজে।

'আবির্ভাব' কবিতার আঙ্গিক, উপস্থাপনরীতি এবং অংশত বক্তব্যের সঙ্গে এলিঅটের 'কোরিওলান' পর্যায়ের প্রথম কবিতা 'ট্রায়াম্ফ্যাল মার্চ'-এর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে মিছিলের পটভূমিকায়, এলিঅট এবং বিষ্ণু দে উভয় কবিই মিছিলের একটা যথাযথ পরিসংখ্যান সরবরাহ ক'রে আঙ্গিকের দিক দিয়ে অভিনবত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন। (সম্ভবতঃ পরিসংখ্যানের মতো নীরস সংখ্যাতত্ত্বকেও কাব্যের অঙ্গীভূতকরণে এলিঅট এবং বিষ্ণু দে উভয়েরই স্ব-স্ব কাব্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থক এবং প্রশংসনীয় প্রয়াস সন্দেহ নেই।) বিষ্ণু দে 'আবির্ভাব' কবিতায় মিছিলের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

ভোলো, ভোলো ভয়।
বলে মৃদুস্বরে।
চলে আর চলে টলমল টলমল পদভরে
যত যাত্রী, শতশত যাত্রী
কিষাণ ঈশান
দিবারাত্রি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ে পায়ে ফেলে,
আলোর তরঙ্গে ঠেলে লক্ষ পদক্ষেপে
ঘোড়া, রথ, মোটর আর লরি,
ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান,
জাগো জাগো সীতা,
ঊনপঞ্চাশ পবনে পঞ্চভূতের ঐকতানে
নব সাম নব্য সংহিতা।
চলে রথ, চলে ঘোড়া,
বায়ান্ন জোড়া হাতী আর ঘোড়া, পাঁচশো আর পঁয়ত্রিশ হাজার
পদাতিক আর রাজদূত, চলে উট, ট্রাক্‌টার্, অর্গ্যানাইসার্,
এঞ্জিনিআর্, ডাক্তার, সমবায়-সর্দার
পাঞ্জাব সিন্ধু উৎকল মারাঠা দলে দলে চলে বুঝি জাঠা

এর পাশাপাশি এলিঅটের 'ট্রায়াম্ফ্যাল মার্চ' কবিতার তুলনীয় চরণগুলি :

Stone, bronze, stone, steel, stone, oakleaves, horses heels
Over the paving.

And the flags, And the trumpets. And so many eagles.
How many? Count them. And such a press of people.
We hardly knew ourselves that day, or knew the city.
This is the way to the temple and we so many crowding the way.
So many waiting, how many waiting? what did it matter, on such a day?
Are they coming? No, not yet. You can see some eagles. And hear the trumpets.
Here they come. Is he coming?
The natural wakeful life of our Ego is a perceiving.
We can wait with our stools and our sausages.
What comes first? Can you see? Tell us. It is
5,800,000 rifles and carbines,
102,000 machine guns,
28,000 trench mortars,
53,000 field and heavy guns,
I cannot tell how many projectiles, mines and fuses,
13,000 aeroplanes,
24,000 aeroplane engines,
50,000 ammunition waggons,
now 55,000 army waggons,
11,000 field kitchens,
1,150 field bakeries.

What a time that took. Will it be he now? No,
Those are the golf club Captains, these are Scouts,
And now the societe gymnastique de poissy
And now come the Mayor and the Liverymen…

উদ্ধৃত অংশ দুটির তৌলন-বিচারে একথা সহজেই ধরা পড়ে যে বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান প্রাসঙ্গিক উল্লেখের বেশি কিছু নয়, পক্ষান্তরে

এলিঅটের কবিতায় পরিসংখ্যান একটা বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। এই পার্থক্যের কারণ বক্তব্যের বিভিন্নতার মধ্যেই নিহিত। বিষ্ণু দে-র কবিতার মিছিল মার্কসবাদী আন্দোলনের মিছিল (অবশ্য একে বিশেষভাবে মার্কসবাদী না ব'লে সাধারণভাবে গণআন্দোলনের মিছিল বললেও খুব একটা প্রতিপাদ্যের তারতম্য ঘটে না); এখানে মিছিলের আয়তনটাই বড় কথা, চুলচেরা পরিসংখ্যান অবান্তর। কিন্তু এলিঅটের কবিতার মিছিল বিজয়ী সৈন্যদলের প্রত্যাবর্তন মিছিল. সৈন্যবাহিনীর ব্যাপার ব'লেই সেখানে নিভুল পরিসংখ্যান কেবল প্রয়োজনীয়ই নয়, অপরিহার্য। অনুরূপ মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্বেও লক্ষ্যের সাদৃশ্য অবহেলার নয়। শোভাযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হলেও এলিঅটের কবিতায় দর্শকদের লক্ষ্য এবং কৌতূহলী দৃষ্টি নিবন্ধ, কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ কিম্বা বিজয়ী বীরের প্রতি (রাজতন্ত্রে আস্থাবান্ এলিঅটের ক্ষেত্রে এই বিজয়ী বীরের রাজা হওয়াতেও কোনো বাধা নেই)।

Here they come. Is he coming ?··· .
What a time that took. Will it be he now ? No,···
··· ··· ··· . ··· ··· Look
There he is now, look :
There is no interrogation in his eyes···

মিছিলের অন্তরালে এক নিয়ন্তা সত্তার প্রতি কবি বিষ্ণু দে-রও কৌতূহলী দৃষ্টি নিবন্ধ :

দেশ দেশ নন্দিত করি
অবতার সাক্ষাৎ
সবিতুর্বরেণ্যম্
ধীমহি প্রচোদয়াৎ ··

অবতার সাক্ষাৎ
করে দিলে মাৎ !
দূরবীণে দেখি আর কানে কানে শুনি জনগণমনে ওঠে ঢেউ।
আর দিন গুণি !

গীতায় আছে, ধর্মের গ্লানি থেকে ভারতকে (জগৎকে) মুক্ত করতে অবতার আসেন বারে-বারে; কিন্তু অনুরূপ ধর্মীয় চিন্তা মার্কসবাদে দীক্ষিত কবির প্রশ্রয় পাবে এমনটা আশা করাও বাতুলতা। বরং পরিণত বয়সে আধ্যাত্মিকতার জগতে আত্মসমর্পণ করেছেন ব'লেই টি. এস. এলিঅটের ক্ষেত্রে অনুরূপ ধর্মীয়

চিন্তা মোটেই অনপেক্ষিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এলিঅটের 'তিনি' কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের সমর্থনপুষ্ট পরিত্রাতাই, যাঁকে সহজেই ভারতীয় কল্পনার অবতার-এর বিকল্প বলা চলে। 'ট্রায়াম্ফ্যাল মার্চ" কবিতায় সম্ভবতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের সদ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ বন্ধ্যা সমরায়োজন ও নিষ্ফলা আত্মহনন থেকে মানুষ উদ্ধার পেতে পারে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়েই, তিনিই অর্থাৎ পরিত্রাতাই বিপথগামী মানব সমাজকে আলোর সন্ধান দিতে পারেন। সম্ভবতঃ সে কারণেই এলিঅটের কবিতার মিছিল অন্তিমে মন্দিরের সোপনাভিমুখী অর্ঘ্যদানোদ্যত ঃ

Now they go up to the temple. Then the sacrifice

Now come the virgins bearing urns,···

এলিঅটের কবিতার অন্ত্যে আলোর জন্য ব্যাকুল আকুতিটাই বড় হয়ে উঠেছে ঃ

··· ···He's artful. Please, will you

Give us a light ?

Light

Light···

অনুরূপ আধ্যাত্মিক আকুতি বিষ্ণু দে-র আবির্ভাব কবিতায় অনুপস্থিত, কিন্তু তাঁর কবিতার গায়ত্রী মন্ত্রে অর্চনীয় 'সবিতুর্বরেণ্যম্ ধীমহি প্রচোদয়াৎ'[৪৮] অবতার কল্পনা উপেক্ষণীয় নয়। সম্ভবতঃ মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিতে তিনি শ্রেণী-বিহীন সাম্যবাদী বিশ্বের প্রোলেতারিয়েৎ সমাজের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠাতাকেই অবতারের ভূমিকায় বসিয়েছেন। আলোর প্রার্থনা বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও আছে, তবে সে ব্যাকুলতা এলিঅটের মতো তীব্রও নয়, স্পষ্টও নয়। বিষ্ণু দে-র কবিতার উপোদ্ঘাতেই আলোর প্রার্থনা তুলে ধরা হয়েছে ঃ

তিমির দুয়ার খোলো হে জ্যোতির্ময় !

'পদধ্বনি' কবিতার তাত্ত্বিক ভাষ্যে মতানৈক্য আছে। কোনো-কোনো ভাষ্যকারের মতে কবিতাটির মার্কসবাদী ভাষ্যই যথার্থ[৪৯], আবার কোনো-কোনো ভাষ্যকার এই কবিতার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার পক্ষপাতী।[৫০] 'পূর্বলেখ' কাব্যে এলিঅটীয় প্রভাব বিশ্লেষণের গোড়াতেই লক্ষ্য করেছি এই কাব্যের পূর্ব থেকেই বিষ্ণু দে মার্কস্ ও ফ্রয়েডীয় দর্শনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন এবং 'পূর্বলেখ'-র রচনাকালে উভয় তত্ত্বই গভীরভাবে তাঁর কবিসত্তায় ক্রিয়াশীল। এও লক্ষ্য করেছি যে মার্কসবাদের মতো উৎকটরূপে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব 'পূর্বলেখ'-তে ধরা পড়ে নি। রচনাকালীন কবিপ্রবণতার বিচারে 'পদধ্বনি'

কবিতায় মার্কস্ এবং ফ্রয়েডীয় উভয় দর্শনেরই প্রভাব থাকার সম্ভাবনা অস্বাভাবিক নয়, তবে যেহেতু সে সময় কবিসত্তার ওপর মার্কস্‌বাদের প্রভাব অধিকতর ক্রিয়াশীল, তাই মার্কস্‌বাদকে উপেক্ষা ক'রে ফ্রয়েডীয় দর্শনের ভিত্তিতেই কবিতাটির ভাষ্য প্রতিষ্ঠিত করতে যাওয়া ।বভ্রান্তিক.:। তাছাড়া কবিতাটির মধ্যে কবির মার্কস্‌বাদী অনুরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট :

…কার পদধ্বনি আসে ? কার ?
এ কি হল যুগান্তর ! নবঅবতার !
এ যে দস্যুদল !
হে ভদ্রা আমার !
লুব্ধ যাযাবর ! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার,
চায় সোনাজ্বালা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?

মার্কস্‌বাদের সঙ্গে মিছিল, শ্রমিক, কৃষাণ, খেত, খামার, কাস্তে, বুর্জোয়া প্রভৃতি শব্দের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে ; ঠিক তেমনি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সঙ্গে অবদমন, মগ্নচৈতন্য, লিবিডো, সাবলিমেশন, অবচেতন প্রভৃতি শব্দেরও অন্যোন্য সম্পর্ক রয়েছে। বিষ্ণু দে-র কবিসত্তায় যেখানে মার্কস্‌বাদ বেশি ক্রিয়াশীল সেখানে কোনো না কোনো সম্পর্কে মার্কস্‌বাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত শব্দাবলী এসেছে, পক্ষান্তরে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ক্রিয়াশীল থাকা কালে রচিত কবিতায় তৎ-অনুযায়ী শব্দাবলী স্থান পেয়েছে। 'পদধ্বনি' কবিতায় 'মিছিল', 'খেত', 'খামার' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার মার্কস্‌বাদী প্রবণতার ধারণাকেই সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু অনুরূপ ফ্রয়েডীয় দর্শনে ব্যবহৃত জনপ্রিয় শব্দাবলীর অভাব কবিতাটির ফ্রয়েডীয় ভাষ্যের প্রতি অসমর্থন সূচিত করে। প্রতীকী কবিতার একাধিক ভাষ্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়, সেখানেই তার সার্থকতাও। আবার প্রতীকী কবিতার ভাষ্যরচনাতেই ভাষ্যকারের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও অধিক। অর্জুনের কীর্তিময় জীবন এবং কীর্তির উজ্জ্বল স্মৃতির প্রতীকেই 'পদধ্বনি'-পরিকল্পনা। বিগত গৌরবের

দিনে জরিষ্ণু বার্ধক্যের অবসরে কীর্তিমান অর্জুন অবচেতন মনে এক অচেনা পদধ্বনি অনুভব করছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না এই পদধ্বনিতে কিসের আগমন বার্তা সূচিত হচ্ছে, কেবল নানা সম্ভাবনার কথাই চিন্তা করছেন এবং নিজের স্মরণীয় কীর্তিসমূহের বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তগুলির সঙ্গে এই পদধ্বনির তুলনা করেছেন। পদধ্বনির প্রতীক ভাষ্যে মার্কসবাদী প্রোলেতারিয়েৎ সমাজের ইঙ্গিত খুঁজতে যাওয়া কবির প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই অসঙ্গত নয়। ভদ্রা এবং উলূপীর প্রেমের মধ্যে সামাজিক ও অসামাজিক প্রেমের কিম্বা জীবনের প্রতীক খুঁজতে যাওয়া অসঙ্গতই নয় বিভ্রান্তিকর, অবচেতন মনের কবিতা ব'লেই ফ্রয়েডীয় দর্শন আরোপ করাও অসঙ্গত। মনে হয় মার্কসবাদী কিম্বা ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার গভীরে প্রবিষ্ট হবার পূর্বে এই কবিতার পশ্চাতে যে এলিঅটীয় ইঙ্গিতটুকু নিহিত রয়েছে তার খোঁজ নিলে কবিতাটির মূল সুরটি ধরা সহজ হবে। আধুনিক মানব নিয়তই এক অজানা আশঙ্কায় আন্দোলিত হচ্ছে। সে-আশঙ্কার স্বরূপ সে জানে না, কেবল নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নানা কাল্পনিক স্বরূপে চেনার চেষ্টা করে। এ রকমই একটা প্রতীকী আভাস এলিঅট দিয়েছেন তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্যে:

'What is that noise ?
The wind under the door
'What is that noise now ' What is the wind doing ?'
Nothing again nothing.
'Do
You know nothing ? Do you see nothing ? Do you remember
'Nothing ?'

অনুরূপ আশঙ্কার প্রতীকী আভাস কাব্যের অন্যত্রও আছে, যদিচ আশঙ্কার স্বরূপটা স্বতন্ত্র:

Who is the third who walks always beside you ?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
-But who is that on the other side of you ?

বিভিন্ন প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করা সত্ত্বেও উদ্ধৃত দুটি অংশের মধ্যে মূল আশঙ্কার ব্যঞ্জনাটুকু অবিকৃত আছে। বিষ্ণু দে সম্ভবতঃ এই প্র[illegible]ভাসের ইঙ্গিতটুকু তাঁর কবিতায় কাজে লাগিয়েছেন। উপস্থাপনের সাদৃশ্যটুকুও লক্ষ্যণীয়।

পদধ্বনি ?
কার পদধ্বনি
শোনা যায় ?
মদির হাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃতআধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্য বাসরে ?

এলিঅটের প্রথম উদ্ধৃতিতে আশংকার প্রতীকটি এক নৈর্ব্যক্তিক শব্দমাত্র, পরবর্তী উদ্ধৃতিতে স্পষ্টতঃই ব্যক্তিক প্রতীক গ্রহণ করা হয়েছে; বিষ্ণু দে-র প্রতীকটিও শব্দভিত্তিক, কিন্তু সর্বাংশে নৈর্ব্যক্তিক নয়, গোড়ায় যেটুকু বা সংশয় ঘনীভূত হয় পরমুহূর্তেই কবি নিজেই তার নিরসন ঘটান ব্যক্তিক প্রতীকের আভাস দিয়ে।

এই কবিতার আভীর দস্যুদের যাদব রমণীকুল আক্রমণ প্রসঙ্গে লিখিত চরণগুলির সঙ্গেও এলিঅটের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর কয়েকটি চরণের আংশিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বিষ্ণু দে-র কবিতার চরণগুলি ঃ

··· ··· আচম্বিতে কাঁপায়ে' ধমনী
কার পদধ্বনি আসে ? কার ?···
এ যে দস্যুদল !···
লুব্ধ যাযাবর ! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে···
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বালা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর···

এখানে লক্ষ্যণীয় মহাভারতীয় আখ্যান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছে। মহাভারতোক্ত কাহিনীতে আছে, অর্জুন যখন অন্ধক, শৈনেয়, বৃষ্ণি ও ভোজ-বংশীয় শিশু, বৃদ্ধ ও রমণীদের রক্ষা ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে হস্তিনার পথে

নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই আভীর দস্যুদল আক্রমণ করেছিল। আক্রমণস্থল দ্বারকার অঙ্গন নয়, দ্বারকা তখন সমুদ্রে গ্রাস করেছে। আরো লক্ষ্যণীয়, আভীর দস্যুদের যাযাবর ব'লে মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই, যতদূর অনুমিত হয় ওরা পঞ্চনদ দেশের অধিবাসী। বিষ্ণু দে-র কবিতায় তাদের যাযাবরে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং তারা যাযাবর ব'লেই 'চায় স্থিতি, অবসর'। এই রূপান্তর কি এলিঅটীয় চিত্রকল্পের সঙ্গে নৈকট্যসাধনের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (অথবা কম্যুনিজম্ অভিযানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে)? এলিয়টীয় কবিতায় যাযাবরের চিত্রকল্পই গৃহীত হয়েছে :

What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only…

বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী' এলিঅটের 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর মতো এক দীর্ঘ কবিতা ('জন্মাষ্টমীর' চরণসংখ্যা 'দি ওয়েস্ট ল্যা'ন্ড'-এর চরণসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে) এবং সর্বাধিক এলিঅট প্রভাবিত কবিতা সে কথা অকপটেই বলা চলে। এলিঅটীয় বিন্যাস, নাটকীয় বেদ্যতা, কাব্যরীতি এবং প্রকরণের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে এই সার্ধচারশো চরণে দীর্ঘায়িত কবিতাটিতে। যদিচ এই বিশিষ্ট কবিতাটি 'পূ র্ব লে খ' কাব্যগ্রন্থের অন্তিম কবিতা, কিন্তু রচনাকালের বিচারে এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই 'জন্মাষ্টমী'-র পরবর্তীকালে রচিত এবং সে কারণেই 'জন্মাষ্টমী' গভীরভাবে এলিঅট প্রভাবিত হলেও কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই এলিঅটীয় প্রভাব থেকে এক নিরাপদ ব্যবধানে বিরাজ করছে। প্রকৃত প্রস্তাবের 'জন্মাষ্টমী'-র পরবর্তীকালে এলিঅট-প্রভাবে অনুরূপ আত্মসমর্পণ করেছেন এমনটি আর পরিলক্ষিত হয় না। পরবর্তীকালে মার্কস্-বাদ কবিমানসকে গভীরভাবে অধিকার করেছে, সেইসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনা ও মধ্যবিত্ত সমাজের সামূহিক যুগান্তকারী বিপর্যয় কবিসত্তায় আমূল আলোড়ন তুলেছে। এর প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে বিষ্ণু দে-র কাব্যধারায় এসেছে এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন, বিষয়ানুগ আঙ্গিক এবং প্রকাশভঙ্গি হয়েছে স্বতঃই উদ্ভাবিত। আর অপ্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে এলিঅট ও ফ্রয়েডীয় প্রভাব যা বিষ্ণু দে-র কাব্যে পূর্বে ছিল পরিদৃশ্যমান মুখ্য বহিঃস্রোত তা পরিণত

হয়েছে অদৃশ্য অন্তঃস্রোতরূপে। এদিক দিয়ে 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটিকে যথার্থই এলিঅটীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট সীমারেখা ব'লে চিহ্নিত করতে দ্বিধা আসে না। কালের বিচারে এই সীমারেখার কাল ব'লে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ১৯৩৬— 'জন্মাষ্টমীর' রচনাকাল।

'জন্মাষ্টমী' কবিতাটি কিন্তু অধিকাংশ আলোচক ও গবেষকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। যে কবিতাটি কবির এক দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল, আঙ্গিকবিন্যাস ও প্রকরণের সযত্ন তথা সনিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে-কবিতায় বিধৃত এবং সর্বোপরি কাব্যরীতিতেই নয়, বিষয়বিন্যাস ও কাব্যস্বভাবের বিশাল ব্যাপকতায় যে-কবিতা কবির কাব্যের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, সেই কবিতার যথাযথ বিশ্লেষণ ও ভাষ্যরচনায় কোনো গবেষক প্রবৃত্ত হয়েছেন এমনটা চোখে পড়ে নি। গবেষকদের অনীহার কারণ অননুমেয় নয়। কবিতাটির ভাষ্যরচনা আদৌ সহজসাধ্য নয়। যে অপরিমেয় কাব্যানুভূতি, গভীর প্রকরণবোধ এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যাপক অনুশীলনের প্রস্তুতি 'জন্মাষ্টমী'র ভাষ্যরচনায় প্রয়োজন তাও সহজলভ্য নয়। সম্ভবতঃ তাই এই দুঃসাহসিক প্রয়াসের অভাব। অনুরূপ কারণেই এলিঅট অনুবাদে সিদ্ধহস্ত হয়েও এবং সংশয়াতীত সাফল্যলাভ ক'রেও বিষ্ণু দে 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর অনুবাদে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পান নি।[৫১]

কোনো-কোনো সমালোচকের মতে 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটি আঙ্গিকের নিরিখেই মূল্যবান। তাঁদের মতে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের টেকনিকে এই কবিতাটি রচিত এবং উল্লিখিত সংগীতে অভ্যস্ত না হলে কবিতাটি বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়।[৫২] কবি নিজেই এই কবিতার শিরোদ্ধারণ (epigraph) রূপে ব্যবহার করেছেন বেঠোফেন-এর[৫৩] ডি-মাইনর-এ রচিত নবম সিম্ফনির একটি চরণ। বিষ্ণু দে-র কাব্যস্বভাবে ইয়োরোপীয় কবির ধর্ম ব'লেই কাব্য ছাড়াও সংগীত, চিত্রকলা, সমাজবাদ, মনোবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ, বেঠোফেন-এর নবম সিম্ফনি সম্পর্কে কবির বিশেষ দুর্বলতাও ছিল।[৫৪] কবিতার মূল বক্তব্য শিরোদ্ধারণে আভাসিত হবে এটাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু বেঠোফেনের নবম সিম্ফনির চরণ কবিতার শিরোভূষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে ব'লেই কবিতাটিও সাংগীতিক আঙ্গিকে রচিত হয়েছে এমন দাবীর পশ্চাতে বোধহয় তেমন কোনো সবল যুক্তি নেই। তাছাড়া কবিতার সমস্ত কিছু উপেক্ষা ক'রে কেবলমাত্র তার আঙ্গিকটুকুকেই গুরুত্ব দিলে কবিতাটির প্রতিও সর্বাংশে অবিচার করা হয়।

সে কারণেই 'জন্মাষ্টমী' কবিতার কাব্যমূল্যায়নে কেউ-কেউ আঙ্গিকের সঙ্গে বক্তব্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।[৫৫]

এই আলোচনায় 'জন্মাষ্টমী'র বক্তব্য এবং আঙ্গিক উভয় দিকই বিচার্য, কারণ উভয় দিকেই এলিঅটের ব্যাপক প্রভাব একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। কবিতাটির সংক্ষিপ্ত মূল ভাব এইরকম ঃ শরৎ-আকাশে প্রকৃতির অকৃপণ আয়োজন করুণার স্নিগ্ধতার সৌন্দর্যের। এই পরিবেশের আবেশে প্রকৃতির মনও হতে চায় উর্ধ্বগামী বিচরণমুখী।

অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঝরে কৈলাসের হৈমবতী কণা।
পারিজাত কুরুবকশাখা
মৃদুপর্ণ হাত নাড়ে সমস্বরে হাজারে হাজারে
পাখা ঝাড়ে শতশত মানসবলাকা।

পরিবেশটাই অনাবিল আনন্দের, প্রকৃতির সমগ্র চৈতন্যেই পুলক শিহরণ।

আনন্দ, আনন্দ বুঝি। আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য
লঘিমায় স্পন্দমান
মর্মভেদী বাতাসের কায়াহীন বেগে।

কিন্তু নাগরিক সভ্যতার অভিশাপগ্রস্ত জীবনে এ আনন্দের কোনো স্থান নেই। সেখানে চিত্তবিনোদনের এবং চিত্তহরণের হাজারো আয়োজন। সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যায় যারা 'জীবনের বলি' তাদের কাছে।

মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।

কারণ এই সমস্ত মানুষের জীবন ব্যর্থতার হতাশায় ভরা। সংসারের কচঙ্গনে তাদের জীবন দাবদাহে দগ্ধমরুর মতো।

দাবদাহে জগ্ধতৃণ দগ্ধমরু প্রদীপ্ত বাতাসে
যৌবনের গান ঝরে, সিরোক্কোর একঘেয়ে কলি।
ভঙ্গুর জীবনলোভী শ্বাসে
ব্যর্থতার গ্লানি বয় মৌন মন
অনুতাপে পরিম্লান মৌল নিরাশায়,
অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবিষু সগর সন্তান।

এরই মাঝে 'অগণন ভিড়াক্রান্ত এ শহরে নিঃসঙ্গ বিধুর স্বপ্নভারাতুর' বাঙালী

মধ্যবিত্ত সমাজের নাগরিক সভ্যতার অভিশাপগ্রস্ত মানুষেরা দিনগত অঘমর্ষণ করে। কোনোক্রমে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণটুকুকে বাঁচিয়ে রাখে, জরাজীর্ণ সংসারটাকে টেনে চলে, গতানুগতিক জীবনযাত্রার দায়ও সারে জন্ম বিবাহ বংশবৃদ্ধি ও মৃত্যুর চক্রে। একঘেয়ে জীবনের অবসাদ কাটিয়ে উঠতে মাঝে-মাঝে ফুটবল মাঠে উত্তেজনার আঁচ পোয়ায়, কখনো বা সময় কাটাতে,

তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজই ভালো, না হয় তো ফ্লাশ্।
ঘোরতর উত্তেজনা. ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।
তারপরে বাড়ি
অম্লশূল আর সর্দিকাশি
এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁষি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল

এই ভাবেই অদৃষ্টের পরিহাসে অগণন ভিড়াক্রান্ত শহরে প্রচ্ছন্ন করাল মহাকালের রথের চাকায় মধ্যবিত্তের সমস্ত স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়, সম্ভাবনাময় যৌবন জরাকবলিত হয়।

যৌবন সঙ্গীন
নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক
যৌথজতু ঘরে।
প্রারম্ভের পারিজাত ধুতুরায় পরিণতি পায়,
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য আর কার্যকারণের
পালিত কুক্কুরবৎ পটু বশ্যতায়
দেখে যাই অকাতরে
অনাচার, অত্যাচার, অপচয়, অকালে, অকালে।

অবশেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কেবল পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা আর স্তূপীকৃত বঞ্চনার আয়তনটাই সর্বহারা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

তারপরে,
জরিষ্ণু প্রহরে
সন্তানের ফর্দ করি আজীবন বঞ্চনার পাইকারী আত্মত্যাগী
অর্থগৃধ্নুতায়,
কিংবা হায়
দরিদ্র বৃদ্ধের তিক্ত সর্বহারা ভবিতব্যহীন
ব্যর্থতার একান্ত ব্যথায়।

স্বভাবতঃই অনুরূপ নাগরিক জীবনে আনন্দ অভিনন্দনীয় নয়, আনন্দ সংগীতও গ্রহণীয় নয়।

হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এ সঙ্গীত আমাদের আর নাহি সাজে।
আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে
সাযুজ্যসঙ্গীতে,
অণিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয় সোদর,
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই,
কুম্ভীরক তাই।

'জন্মাষ্টমী' কবিতার এই মূল ভাবের সঙ্গে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর মূল ভাবের সার্বিক সাদৃশ্য সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, লক্ষ্যের মধ্যেও অনৈক্য বিদ্যমান; প্রবল সাদৃশ্য রয়েছে অবতারণায়। 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' উর্বরতা তত্ত্বের ওপর আধারিত; ফিসার কিঙ, টাইরেসিয়স প্রভৃতি পুরাণ-প্রসঙ্গ এই কাব্যের প্রতীক ভিত্তি রচনা করেছে। অনুরূপ কোনো তত্ত্বের উপস্থাপনা করা হয় নি 'জন্মাষ্টমী' কবিতায়; পার্থ, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন, ইন্দ্রপ্রস্থ কিম্বা য়ুলিসিস, হেকটর, ডিয়োটিমা, গ্যালাহাড প্রভৃতি পুরাণ-প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলেও এরা কবিতাটির ভিত্তি রচনা করে নি প্রতীক ব্যঞ্জনা দিয়ে। কবিতার উপসংহারে এলিঅট উপনিষদিক মন্ত্র ও বক্তব্যের অবতারণা ক'রে আধ্যাত্মিকতার মহনীয় (sublime) জগতে উপনীত হয়েছেন. কবিতাটিও সার্থক ব্যঞ্জনা পেয়েছে দৈনন্দিন সাংসারিক রৌরব থেকে শান্তির রাজ্যে আধ্যাত্মিকতার জগতে ঊর্ধ্বায়নের প্রেরণার মধ্যে। বিষ্ণু দে-র কবিতার উপসংহার এলিঅটের উপসংহারের বিপরীত মেরুর অভিমুখী। কোনো আধ্যাত্মিক বুভুক্ষা 'জন্মাষ্টমী'র উপসংহারে ধরা পড়ে নি। কবিতাটির মধ্যস্থলে উপনিষদিক আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ দেখা দিয়েছিল:

ক্ষান্ত করো, ক্ষান্ত করো এই অন্ধ ধৃষ্ট বিদ্বেষণ
তুলে দাও হিরণ্ময় ঢাকা
হে যম, হে সূর্য, হে পূষণ!

এলিঅটের আধ্যাত্মিক সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ারও উপক্রম দেখা দিয়েছে :

হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্ন মুমূর্ষা ক্ষুব্ধ আমার পাতাল
ধুয়ে দিক্, বজ্রযোগে বিদ্যুৎ অঙ্গারে
উড়ায়ে পুড়ায়ে দিক্ বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীক সম্পূরণে
বেঁধে দিক্ হে সুশ্রুত, উদ্গীতির হিরণ্ময় জালে।

উপসংহারে কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা প্রশ্রয় পায় নি।

'জন্মাষ্টমী' ও 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর সাদৃশ্যটা প্রধানতঃ উপস্থাপনা, আঙ্গিক ও প্রকরণগত। লণ্ডন শহরকেন্দ্রিক নাগর সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য বন্ধ্যারূপের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা থেকেই এলিঅট উর্বরতার প্রার্থনায় উপনীত হয়েছেন। বিষ্ণু দে-ও অভিমানক্ষুব্ধ আনন্দবিমুখতায় পেঁছেছেন কলকাতা-কেন্দ্রিক নাগর সভ্যতায় জীবনীশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব বর্ণনার মধ্য দিয়েই। তবে নাগর সভ্যতার যে ছবি এলিঅট এঁকেছেন তার মধ্যে বর্তমান যুগের ছবির পাশাপাশি মধ্যযুগীয় ছবিও আছে, এলবার্ট-লিলির পরমুহূর্তে'ই ভেসে উঠেছে এলিজাবেথ-লেস্টারের ছবি ; বিষ্ণু দে-র কবিতায় পরিবেশিত ছবিতে অমন যুগব্যাপকতা নেই ; তাঁর কোনো ছবিই অগণন ভিড়াক্রান্ত শহরের সমসাময়িক যুগের গণ্ডি অতিক্রম করে নি। অবশ্য তিনি ব্যাপকতায় এলিঅটের মতোই নগরজীবনের অনেকগুলো দিক ছুঁয়ে গেছেন। লক্ষণীয় যে এলিঅটের কবিতায় বর্ণনার পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময়ধর্মী হলেও সমস্ত কবিতাটিই কেন্দ্রীয় চরিত্র টাইরেসিঅসের চোখ দিয়ে দেখা ব'লে তন্ময়ধর্মীতার ওপর এক মন্ময় অবলেপ বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ; তেমনি 'জন্মাষ্টমী'র সমগ্র বর্ণনাটাই বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময়ধর্মী, কিন্তু সমগ্র কবিতাটিতে ছাপিয়ে ওঠা উত্তমপুরুষের দৃষ্টিটা তন্ময়ধর্মীতার ওপর প্রকৃতই একটা মন্ময় অবলেপ ছড়িয়েছে।

'জন্মাষ্টমী' কবিতার গোড়ায় সন্ধ্যার ছবি এলিঅটের ছবিকে মনে করিয়ে
দেয়; এলিঅটের এ ছবি 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর নয়, প্রুফ্রক কবিতার। যে নাগরিক পরিবেশের বর্ণনা বিষ্ণু দে দিয়েছেন কবিতাটির গোড়ায় তাও অনেকাংশে প্রুফ্রক কবিতারই অনুরূপ।

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিশ্বাসপ্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পন্জ্-হাতে।

পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে
ঘরে ঘরে বিবর্ণ ছায়াতে
পরবশ বিশ্রামের গন্ধবায়ু, কল্মষবিলাস।

এলিঅটের প্রুফ্রক কবিতার সন্ধ্যার বর্ণনা আরো ব্যাপক। পীত কুয়াশা এবং পীত ধোঁয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি জন্তুর চিত্রকল্প আশ্রয় করা হয়েছে, বিষ্ণু দে-র কবিতায় একটি চরণেই এই চিত্রকল্পটি আরো সংহতরূপ পেয়েছে। স্পনজ্-হাতে বাষ্পগন্ধ নিশ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করার বর্ণনা এলিঅটের আকাশে ছড়ানো সন্ধ্যাকে ঈথারের গন্ধে অচৈতন্য টেবিলে শায়িত রোগীর চিত্রকল্পে দেখাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table , ··
The yellow fog that rubs its back upon the windowpanes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the windowpanes
Licked its tongue into the corners of the evening,
Lingered upon the pools that stand in drains,
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,
Slipped by the terrace, made a sudden leap,
And seeing that it was a soft October night,
Curled once about the house, and fell asleep.

সন্ধ্যার বর্ণনার পর অগণন ভিড়াক্রান্ত শহরের জীবনের বলি অগণন নাগরিক সভ্যতার মানুষকে জীবন কিভাবে পথে বসিয়েছে তারই একটা আভাস ; এ ছবি এলিঅটের লণ্ডনের অনুরূপ ছবির সঙ্গে অনেকাংশে মেলে, 'বরন্ট্ নরটন্'-এর অনুরূপ ছবির সঙ্গেও মেলে। বিষ্ণু দে 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতায়ও অনুরূপ ছবি দিয়েছেন।

নাগরিক সভ্যতার ছবি আঁকতে গিয়ে কবি এলিঅটের মতো বিষ্ণু দে-ও নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিকের ছবি এঁকেছেন। একঘেয়ে গতানুগতিক জীবনযাত্রার ছবি দিয়েছেন এলিঅট অত্যন্ত সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র চরণে,

··· ···What shall we do tomorrow ?
What shall we ever do ?
The hot water at ten.
And if it rains, a closed car at four.

And we shall play a game of chess,
Pressing lidless eyes and waiting for a knock
upon the door.

বিষ্ণু দে-ও গতানুগতিক অবসাদময় দিনযাপনের আভাস দিয়েছেন সংক্ষেপেই।

তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজই ভালো, না হয় তো ফ্লাশ্‌।
ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।
তারপরে বাড়ি
অম্লশূল আর সর্দিকাশি
এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁষি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল
তবু হায়
প্রচ্ছন্ন করাল
মহাকাল, ধূর্ত মহাকাল!
দিন আর রাত্রি কাটে, রাত্রি আর দিন।

গতানুগতিক জীবনযাত্রার ফলে উদ্ভূত জীবনের একঘেয়ে অবসাদের (limbo of boredom) কথাও এসেছে বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী'তে এলিঅটের 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-'এর মতোই। বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় একাধিকবার সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। একটি উদ্ধৃতি (দাবদাহে দগ্ধতৃণ দগ্ধমরু ... ... জিজীবিষু সগরসন্তান) ইতিপূর্বেই প্রসঙ্গান্তরে উল্লিখিত হয়েছে, এখানে অনুরূপ আর একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ

মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।

এলিঅটের 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর মতো বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী'-তেও নাগরিক সভ্যতা তথা নাগরিক জীবনের ব্যাপক পটভূমি ধরা পড়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী কালে যে প্রাচীন ঐতিহ্য ভেঙে পড়ছিল, ভেঙে পড়ছিল প্রেম সামাজিক সম্বন্ধ মানবিকতা যৌনসম্পর্ক এমনকি সামগ্রিক জীবনযাত্রা সম্পর্কিত প্রাচীন মূল্যবোধগুলি তার একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন উভয় কবিই। এই পরিবর্তিত মূল্যবোধের পরিচয়ে প্রেম ও সামাজিক সম্পর্কই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। একনিষ্ঠ প্রেম, সতীত্ব প্রভৃতি যে আধুনিক নাগর সভ্যতায় হাস্যকর সে কথাই এলিঅট

বোঝাতে চেয়েছেন লিলি, মিসেস পোর্টার প্রভৃতি চরিত্রের প্রসঙ্গ অবতারণা ক'রে। বিষ্ণু দে-ও অনুরূপ উদ্দেশ্যেই রুমা অলকা লিলি প্রভৃতির প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। 'চো রা বা লি' কাব্যগ্রন্থ থেকেই কবির অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করেছি এবং 'গার্হস্থ্যাশ্রম', 'প্রথম পার্টি', 'শিখণ্ডীর গান' প্রভৃতি কবিতা-প্রসঙ্গে এলিঅটীয় প্রবণতার সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে কেবল দু-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় এই প্রবণতাটুকুর প্রতি ইঙ্গিত করছি।

জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
চরণতলে
আমি অভাগ্য মানি,
বোসোই না, ওরা কেউই শুনছে না, এ দীন বলে
হয়তো আমিও উঠব ফুটে, এ দীন বলে
তোমার হাতের বাঙায় চাপে, রঙীন ঠোঁটের এককথায়,
রেশমী মেঘের একটুকু জলে
যেন কাকটুস্ গ্রাণ্ডিফ্লোরা।

এই অংশে বহুপ্রায় এবং প্রণয়ের ব্যাপারে নাগরিক মুখোস-আঁটা মানুষের ছবি এঁকেছেন কবি। আবার এলিঅটীয় ধরনেও বলেছেন স্বগতঃ ভাষণের ভঙ্গিতে এক-আধটি চরণ জুড়ে দিয়ে।

এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন ?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস্ পেগ্।

'জন্মাষ্টমী' কবিতায় এলিঅটের যে-সমস্ত কবিতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাদের রচনাকালের ব্যাপকতা বিস্ময়াবহ। এই কবিতায় যেমন এলিঅটের প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রুফ্রক কবিতার প্রভাব আছে, তেমনি 'জন্মাষ্টমী' রচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালে রচিত কাব্যনাট্য 'দি রক'-এরও প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। প্রুফ্রক কবিতার প্রকাশকাল ১৯১৭, আর 'দি রক'-এর ১৯৩৪ ; অর্থাৎ ঐ কালসীমার মধ্যে রচিত এলিঅটের প্রায় সব কটি রচনাই বিষ্ণু দে-র জন্মাষ্টমী রচনাকালে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। 'দি রক'-এর নিম্নলিখিত চরণগুলির

সঙ্গে 'জন্মাষ্টমী'র কয়েকটি চরণের সাদৃশ্য দেখা যায় :

The Eagle soars in the summit of Heaven,
The Hunter with his dogs pursues his circuit.
O perpetual revolution of configured stars,
O perpetual recurrence of determined seasons,
O world of spring and autumn, birth and dying!
The endless invention, endless experiment,
Brings knowledge of motion, but not of stillness;

বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী'-র সংশ্লিষ্ট চরণগুলি :

ভুলেছ কি নব নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয় না কো শেষ
পড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকণ্টকিত রুক্ষ দেশ ?
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব খর কৃষ্ণ তমিস্রাকে ঠেলে,
দূরে দূরে ফেলে কাংস্যনিনাদে সাগরে
—শ্যেন-কপোতের প্রেম-কূজনে মধুর কোনো
নব অলকায় নয়—
নিয়ে যাবে বলো কোনো সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে !

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অর্থাৎ উপাদান, বক্তব্য ও তাত্ত্বিক সাদৃশ্য যতই ব্যাপক হোক না কেন মুখ্যতঃ আঙ্গিক এবং প্রকরণ সাদৃশ্যই 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটিকে এলিঅটীয় বৈশিষ্ট্যের কবিতা ব'লে চিহ্নিত করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। আঙ্গিকে এবং প্রকরণে এই কবিতায় বিষ্ণু দে এলিঅটের 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর এমনই গভীর নৈকট্যে উপনীত যে কবিতাটিকে সহজেই ওয়েস্ট ল্যাণ্ডীয় আঙ্গিকের কবিতা ব'লে চিহ্নিত করা চলে। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডীয় আঙ্গিকের মূল কথাই হল প্রাঞ্জলতা নয় জটিলতা এবং মুখ্য উপাদান নিঃসন্দেহে নাটকীয় বেদ্যতা। দূরান্বয়ী পরস্পর নিরপেক্ষ ঘটনা ও বক্তব্য এই আঙ্গিকে একই স্তবকে বা স্তবকান্তরে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করা হয়। এদের মধ্যেকার যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। বিভিন্ন ঘটনা বা প্রসঙ্গ অথবা বক্তব্যের অন্তর্নিহিত এই ক্ষীণ যোগসূত্রটুকুর আবিষ্কার রীতিমতো অনুরূপ কাব্যানুশীলন ও গভীর অভিনিবেশ সাপেক্ষ। প্রসঙ্গক্রমে 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর 'দি ফায়ার সার্মন' পরিচ্ছেদের টাইপিস্ট মেয়ে ও রানী এলিজাবেথের কাহিনী দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাবৈশিষ্ট্য এবং কালগত ব্যবধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে

প্রসঙ্গ দুটির মধ্যে কোনো আপাত যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু বন্ধ্যাপ্রণয়ের ব্যঞ্জনায় এলিঅট প্রসঙ্গদুটিকে একসূত্রে গেঁথেছেন। কবিতাটিতে সর্বত্র অনুরূপ আঙ্গিকরীতিই অনুসৃত হয়েছে। 'জন্মাষ্টমী' কবিতাতেও বিষ্ণু দে স্তবক থেকে স্তবকান্তরে বিভিন্ন ঘটনা, প্রসঙ্গ বা বক্তব্য সন্নিবিষ্ট করেছেন। সন্নিবেশ অনেকাংশে নাটকীয়—স্তবক থেকে স্তবকান্তরে বিভিন্ন ঘটনা, প্রসঙ্গ বা বক্তব্যের আপাত যোগসূত্রশূন্য দৃশ্যবিবর্তন। এই বিশিষ্ট আঙ্গিক যা 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় একান্তই এলিঅটীয় উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তাকে কোনো-কোনো সমালোচক ইয়োরোপীয় সাঙ্গীতিক পদ্ধতি,[৫৬] আবার কেউ কেউ এই রীতির কবিতায় চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে দৃশ্যের পর দৃশ্য সমাবেশ লক্ষ্য ক'রে কবিতাটিকেই সিনেমা বা ফিল্মের আঙ্গিক রীতির কবিতা রূপে অভিহিত করার পক্ষপাতী।[৫৭]

'জন্মাষ্টমী' কবিতায় অনেকগুলি জনপ্রিয় এলিঅটীয় প্রকরণ সচেতনভাবেই বিষ্ণু দে ব্যবহার করেছেন। শিরোধারণ (epigraph), স্বগতভাষণ, নাটকীয় একক সংলাপ (dramatic monologue), অন্যপূর্বা চিত্রকল্প অর্থাৎ চিত্রকল্প রূপে পূর্বসূরীর বিখ্যাত চরণ বিকৃত কিম্বা অবিকৃতভাবে স্বীয় কবিতায় ব্যবহার, মন্ত্রের কার্যকারিতা কবিতায় সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে ধ্রুবপদকল্প চরণের ব্যবহার, গ্রীক-ল্যাটিনের বিকল্পরূপে বাংলা কবিতায় তৎসম চরণের ব্যবহার, বাঁধাধরা তথা নিয়মিত ছন্দের পরিবর্তে অনিয়মিত ছন্দের ব্যবহার প্রভৃতি প্রকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে সোজাসুজিই এলিঅটকে অনুসরণ করেছেন।

এলিঅটের কাব্যবিশ্বাস সম্পর্কিত বিশিষ্ট প্রবণতাগুলিও বিষ্ণু দে-র কবিতাটিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এলিঅটসুলভ ইতিহাসচেতনা, ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও তার উপাদান বিষয় ও বক্তব্যকে বিশ্বব্যাপী পরিধির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, নাগর সভ্যতা প্রভাবিত আধুনিক সমাজের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে বিশেষভাবে সুপ্রকট।

পূর্বেই বলেছি 'জন্মাষ্টমী' বিষ্ণু দে-র এলিঅট প্রভাবিত কবিতাবলীর মধ্যে এক বিশেষ স্তম্ভস্বরূপই নয়, এলিঅট অনুচারণারও একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা। 'পূ র্ব লে খ' পরবর্তী পর্যায়ে বিষ্ণু দে কাব্যানুশীলনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ধারা থেকে সরে এসেছেন। 'পূ র্ব লে খ' পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র কবিতায় নান্দনিক মূল্য যথোচিত মর্যাদা পেয়েছে, কিন্তু এর পর থেকে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলিতে মার্কসবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর বা বঙ্গের দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনাবলী অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার ক'রে কাব্যের নান্দনিক মূল্যকে

বিপর্যস্ত করেছে। 'সাত ভাই চম্পা' কাব্যে ঐ সমস্ত সমসাময়িক ঘটনার যে-গভীর ছায়াপাত ঘটেছে তার আভাস আছে নাম-কবিতাটিতেই।[৫৮]

আবিশ্ব সমরে

অসহার কলকতোর মধ্যবিত্ত কুরুক্ষেত্রে করুণা কুড়ায়।...

...   .   তবু চীন, রুশ—

দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ

স্বার্থের বর্ধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদীর বনিয়াদে, মুমূর্ষু অস্থির

জলে স্থলে যুদ্ধ চলে, ভারতেরও ভিৎ টলে, ...

এই কাব্যের উৎসর্গ পত্রেও মার্কসবাদের প্রতি সমর্থনের ইঙ্গিত। সমসাময়িক কালে নব নাট্য আন্দোলনের যুগ্ম শরিক শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য 'ন বা ন্ন' নাটকে মার্কস্‌বাদী বক্তব্যকে তুলে ধ'রে প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন বুদ্ধিজীবী মহলে। এঁদেরই নামে কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয়, কবি বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রত্যাশায় প্রগতিশীল চিন্তাধারা কিম্বা মার্কস্‌বাদের বুলি কপচান নি, গভীর আস্থা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আজকের বঞ্চিতরাই একদিন জয়ী হবে, কালের চাকা ঘোরাবে এরাই, ভবিষ্যতের স্বদেশের স্বর্ণসম্ভাবনার চাবিকাঠিও এদেরই হাতে।

দুর্ভিক্ষের বঞ্চিত হাতে বানাব বিজয়ী বেশ

লক্ষ দুস্থ মুমূর্ষু হাড়ে নরকের ভিড় ভেঙে,

আমাদেরই ক্ষীণ হাতে বলবান নাড়াব কালের চাকা,

অমৃতের ঢাকা খুলবে মুক্ত হিরণ্ময় স্বদেশ। ('চতুর্দশপদী')

মার্কস্‌বাদের পথেই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে।

অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,

ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,

তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে

ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য। ('প্রতিরোধ')

কবির বিশ্বাস বিশ্বব্যাপী ভেদহীন সমাজের পথেই এগিয়েছে রুশ জনগণ, তাঁদের পথিকৃৎ লেনিনই বিশ্বের মুক্তিকামী সমগ্র মানব সমাজেরই নব ভগীরথ।

স্বাধিকারে মুক্তি আজ, ন্যায়মুক্তি-প্রতিষ্ঠ জীবন!

এবারে আরম্ভ হল মনুষ্যত্বে প্রাণের মনের

ক্ষুরধার স্বন্দ্ব আর সমাধা-সাধনা, ভেদহীন

সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়। শ্রমিকজনের
সাগরসঙ্গমে আজ উৎসর্জিত রুশ জনগণ!
তোমাদের ভগীরথ—বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন। ('৭ই নভেম্বর')

'স ন্দ্বী পে র চ র' কাব্যগ্রন্থে কবির সামাজিক সচেতনতা তুঙ্গে উঠেছে। কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলীর রচনাকালে (১৯৪৪-৪৭) বঙ্গে ও কলকাতায় নানা সামাজিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ঝড় বয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভুক্তভোগী কবি ব্যক্তিগত বাস্তব অভিজ্ঞতা উজাড় ক'রে দিয়েছেন তাঁর এই সময়কার বিভিন্ন কবিতায়ঃ

> The poems range over a period of wide and various experience imparted by our struggle for national independence, the menace of fascism and the glorious resistance by forces of progress all over the world, that terrible man-made calamity of the Bengal famine in 1942-43, the gruesome communal riots and finally the happiness of political independence mixed up with the pain of the partition of the country.[৬৯]

এই সমস্ত জ্বলন্ত প্রসঙ্গ এবং তজ্জনিত সমস্যাবলী প্রাধান্য পেয়েছে ব'লেই এলিঅটীয় প্রভাব এবং চিন্তাধারা 'স ন্দ্বী পে র চ র' কাব্যগ্রন্থে তেমন সুপ্রকট নয়। তবে 'সা ত ভা ই চ ম্পা' কাব্যগ্রন্থের মতো একেবারে প্রভাব লক্ষণবর্জিত নয়। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দাঙ্গা বিধ্বস্ত যুদ্ধের কালো ছায়া কবলিত কলকাতার চেহারা কবির ওয়েস্ট ল্যান্ড সচেতনতা মাঝে-মাঝেই জাগিয়ে তুলেছে।

নিশ্চিন্ত এ ফাল্গুন সন্ধ্যা
নেমে আসে দক্ষিণা হাওয়ায়,
রাঙা মেয়ে মায়ার খেলায়
ছুটে যায় রঙের মেলায়
আকাশে বাতাসে পাখি গায়,
ভুলে যাই এ মাটিই বন্ধ্যা। ('বন্ধ্যা সন্ধ্যা')

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সন্দ্বীপের চরে উপনীত হয়েও কবির মনে চোরাবালি-চেতনা অনির্বাণ অম্লান। 'শালবন' কবিতায় মহাযুদ্ধ পরবর্তী ভূখণ্ড যার গায়ে যুদ্ধের নানা চিহ্ন তার যে ছবি এঁকেছেন সে-ছবির সঙ্গে 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড-'এর 'দি ফায়ার সার্মন' অধ্যায়ের আনন্দ-বিহারের ছাপ বয়ে

বেড়ানো পরিত্যক্ত টেমস্‌ নদীর তটভূমির ছবি অনেকাংশে মেলে। বিষ্ণু দে-র বর্ণনায়,

সে বন্য উৎসব শেষ, পড়ে আছে ভুক্ত অবশেষ
ছেঁড়া তাঁবু, ভাঙা খাট, কারখানার পাত কয়খানা,
জীবনমৃত্যুর মদে আজ আর দেয় নাকো হানা,
গ্রামগ্রামান্তের ঘরে, গেছে সব যে যার স্বদেশ,
রেখে গেছে আয়োজন প্রশস্ত পথের দীন বেশ,
বাঁকা টিন, কব্জা, কাঠ, চূর্ণ বোতলের কাচ, নানা
হাওয়াই জাহাজ-দীর্ণ টুকরা, কিছু সিনেমাশোয়ানা
যুবতীর ছাপা ছবি, রেখে গেছে বিশ্বব্যাপী রেশ
আবিশ্ব সমরে অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণ।

এলিঅট প্রদত্ত ছবিটাও 'শালবন'-এর অনুরূপ :

The river's tent is broken , the last fingers of leaf
Clutch and sink into the wet bank. The wind
crosses the brown land, unheard. The nymphs are deperted.
Sweet Thames, run softly, till I end my song.
The river bears no empty bottles, sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights.

নাগরিক সভ্যতার নরকও কোনো-কোনো কবিতায় উঁকিঝুঁকি দিয়েছে।

মরিয়া শহরে জাগে পৃথিবীর মুমূর্ষু বাতাসে
মরা বাড়ি, মরা পথ,
কোন নরকের ত্রাসে জেগে থাকে ছাদে ছাদে
বারাণ্ডায়, জানালায় বিনিদ্র প্রহরে টহলায় পাড়ায় পাড়ায়
মহল্লায় ইসারায় ইঁটে বাঁশে চোরা ডাকে নকল সেনার ফিস ফাসে
ভয় আর সন্দেহের জিঘাংসু হৃদয়। ('কঙ্কালীতলা')

বন্ধ্যা মাটিতে, দেশে এবং জীবনে বৃষ্টিই জীবনীশক্তি সঞ্চার করে। এক-আধটি কবিতায় বৃষ্টির অনুরূপ প্রতীকাত্মক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বৃষ্টি পড়ে
পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলা পিচে ইঁটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে

মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
ভিটেয় মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে
বাংলায় ভারতেও বুঝি
দগ্ধদিনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে
ঈশান হাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শাস্তিতে পড়ে
বৃষ্টি পড়ে জলস্রোতে খানায় ডোবায়
বৃষ্টি পড়ে ('চৈতে-বৈশাখে')

কিংবা,

তবু অশান্ত সেই পাপে
বৃষ্টি পড়ে
সারাজীবনের মাঠে
জীবনের পথে ঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে
প্রাণের ফোয়ারা
শহরে সদরে অফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে
সমুদ্রের মন্দারে মন্দারে ঝড়ের দাক্ষিণ্যভারে
মানসের কুরুবকে হৈমবতী করকায়
ট্রামে বাসে কলের চোঙায়
আগুনে ধোঁয়ায় মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
বন্দরের ডকে। ('চৈতে-বৈশাখে')

'সন্দ্বীপের চর' কাব্যগ্রন্থে এলিঅটীয় প্রভাবের মতোই মার্কসবাদও গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করায় স্পষ্টভাষায় নয় প্রতীক ব্যঞ্জনা আশ্রয় ক'রেই প্রকাশিত হয়েছে।

কবি বিষ্ণু দে-র অন্তর্জীবন 'অন্বিষ্ট' কাব্যের যুগে (রচনাকাল ১৯৪৭-৪৮) এসে একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফিরল। ভারতের রাজনৈতিক আকাশেও তখন উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন ; কিন্তু তার কোনো কাব্যিক প্রকাশ ঘটতে দেখা গেল না 'অন্বিষ্টে'। বরং পূর্ববর্তী কাব্যদ্বয় 'সাত ভাই চম্পা' এবং 'সন্দ্বীপের চরে' সমসাময়িক জ্বলন্ত সমস্যা অনেক বেশি পরিমাণে স্থান ক'রে নিয়েছিল। সে-সময় মার্কসবাদ কবিমনীষাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ; সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাও কবির মনকে ক'রে রেখেছিল ভারাক্রান্ত। অবাক হতে হয়, কবি 'সাত ভাই চম্পা' ও 'সন্দ্বীপের চর'-এর জগতের সমস্যা ও মতবাদ শুধু অতিক্রম ক'রেই নয়,

মোড় ফিরে অনায়াসেই অস্বিষ্টের খোঁজে এমন এক জগতে উপনীত হলেন যার সঙ্গে পূর্ববর্তী জগতের কোনো আত্মিক যোগ একান্তই দুর্নিরীক্ষ্য। অবশ্য অনুরূপ মন্তব্যে কিঞ্চিৎ সত্যের অপলাপ হয়, পূর্ববর্তী কাব্য 'পূর্বলেখ'-র 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় অস্বিষ্টের বীজ নিহিত ছিল। ঐ কবিতায় কবি এ-প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন যে দ্যুলোক তথা নিসর্গ আনন্দের উৎস।

আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বাবেগে।

কিন্তু বাস্তবের জীবনে নাগরিক সভ্যতার দিনচর্যায় এই আনন্দের প্রকাশ না দেখে কবির অন্তঃকরণ গভীর হতাশায় পীড়িত হয়েছে। অস্বিষ্টের জগতে এসে আবার কবি মুক্তি-আনন্দতত্ত্বকেই আঁকড়ে ধরেছেন।

আমারও অস্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই। ('অস্বিষ্ট')

কিন্তু 'জন্মাষ্টমী'-র আনন্দচেতনার সঙ্গে বর্তমান আনন্দচেতনার মৌলিক পার্থক্য আছে।' 'অস্বিষ্ট'-র যুগে কবি আকাশের মঙ্গলালোকে যে-আনন্দ-লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন তাকেই গ্রাম-নিসর্গে খেত-খামারে নাগরিক সভ্যতা থেকে দূরে পথে প্রান্তরে বিচ্ছুরিত হতে দেখেছেন। কবির অন্তরে এই সত্যোপলব্ধি ঘটেছে নাগর সভ্যতার নারকীয় দিনচর্যার অবসাদ (limbo of boredom) থেকেই।

দেখেছি অনেক পাপ অনাচার মূঢ় ক্ষীত লুব্ধ অত্যাচার
জেনেছি অনেক গ্লানি আমাদের বর্তমানে
প্রতিযোগী জীবনের জীবিকার কুটিল বিন্যাসে।
শিশুর প্রত্যুষ থেকে আনন্দের কণা
দেখেছি কেমন মরে তিলে তিলে প্রতিদিন
নির্মম নির্বোধ চক্রান্ত অভ্যাসে
হাজার হাজার মন যে কেমন চক্রবৃদ্ধি অভ্যাসের ঘায়ে
ঘায়ে হয় ছারখার
হাজার হাজার আমি নিজেই দেখেছি ভুগেছিও (ঐ)

জীবনের অবসাদ অতিক্রম ক'রে ধনধান্যে পুষ্পেভরা গ্রাম-বসুন্ধরায় একাত্ম হয়েই কবি আনন্দলোকে উপনীত হতে পেরেছেন।

দিন দিন বছর বছর হিংস্র লোভ পলাতক বঞ্চনার নরকের
শেষের টিলায় নিঃসঙ্গ শ্রেণীর আপাতিক রৌরব কিনারে
ব্যক্তির বিন্যাসে নব স্বতন্ত্র আশায় মানুষের আনন্দের আয়ুষ্মান রেশে

এসেছি যাত্রার শেষে ধনধান্যে পুষ্পেভরা
আমাদের এ বসুন্ধরায় তোমাদের দেশে শান্তির ঝঞ্ঝায় নিঃসঙ্গ উধাও
মানুষের পরম্পরায়, প্রেমে, বন্ধুতায়, কর্মে, রচনায়।
এ দেশ আমারও দেশ, দুহাত মিলাও। (ঐ)

এরই মাঝে কবি তাঁর আদর্শের বাস্তব পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছেন মানুষের মধ্যেই, উন্মুক্ত প্রকৃতিতেই হিরন্ময় সত্যের মুখ দেখতে পেয়েছেন আর লাল কাঁকরের মাটির জীবনেই মুক্তি-আনন্দিত সুধার আস্বাদ পেয়েছেন।

স্নায়ুর ঘাঁটিতে
অম্লান পিপাসা আজও, হিরন্ময় সত্যের বাটীতে
উন্মুক্ত নির্ঝরে মুখ
অতন্দ্র জীবন ব্যেপে আনন্দিত সুধা
মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা। (ঐ)

নাগরিক কবি এলিঅট আধুনিক নাগর সভ্যতার বন্ধ্যা রূপ এবং নারকীয় পরিবেশ অন্তরে উপলব্ধি ক'রে নগরজীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আধ্যাত্মিকতায় আশ্রয় খুঁজেছিলেন ; বিষ্ণু দে-ও নাগরিক কবি, নাগরিক সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব তাঁরও দৃষ্টি এড়ায় নি। নাগরিক দিনচর্যার গ্লানি তাঁর জীবনেও ক্লান্তির অবসাদ এনে দিয়েছিল, তাই তিনিও নাগরিক সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তবে এলিঅটের মতো আধ্যাত্মিক জগতে আশ্রয় খোঁজেন নি সম্ভবতঃ দুটি কারণে। জন্মসূত্রেই নাগরিক চিন্তাভাবনা ও নাগরিক সভ্যতার দায়ভাগ নিয়ে এসেছিলেন বিষ্ণু দে। সমসাময়িক প্রগতিবাদী চিন্তাভাবনার শরিক হওয়ার কারণে নাগরিকবাদ থেকে মার্কস্‌বাদে উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল তাঁর জীবনে এবং কাব্যে উভয়তঃ। মার্কস্‌বাদ থেকে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ নাগরিক সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ কবি নাগরিক আবাস ছেড়ে গ্রামের আবাসে এসেছেন ; সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কবিসত্তা সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে, কর্মময় চৈতন্যে যে-অন্বেষায় প্রাতত তারও সন্ধান পেয়েছে গ্রামের প্রাকৃত এবং

মানবিক সম্পদের মধ্যেই। মার্কসবাদী চেতনার পথ মাড়িয়েই বিষ্ণু দে-র এই গ্রাম-চেতনায় উত্তরণ। আধ্যাত্মিকতার শেষ পর্যায়ে গ্রাম চতুষ্টয় নিয়ে 'ফো র কো য়া র্টে ট স্‌'-এর চারটি কবিতা লিখেছিলেন এলিঅট, কিন্তু সম্ভবত তাতে গ্রামচেতনা ধরা পড়ে নি।

একথা আজ স্বীকৃত সত্য যে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-বিরোধী বা কল্লোলগোষ্ঠীর কবিতার প্রধান পার্থক্যটাই ছিল আঙ্গিকগত। মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি কবিতার ভাষাকে নিয়ে আসাই ছিল পরবর্তীদের কাব্যসাধনার অন্যতম লক্ষ্য। 'অ ন্বি ষ্ট'-এর যুগে গ্রামচেতনায় ধরা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কবিতায় কথ্যরীতি আনয়নের বিষয়েও সচেতন হয়েছেন বিষ্ণু দে। তাঁর স্বাভাবিক দুর্বলতাই মাত্রাচ্ছন্দের প্রতি, কল্লোলগোষ্ঠীর আরো অনেকের মতোই বিষ্ণু দে-রও অবিসংবাদিত সিদ্ধি পয়ারজাতীয় ছন্দের প্রয়োগে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাত্রাচ্ছন্দের সঙ্গে কথ্যরীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে একটা নমনীয় আধুনিক কাব্যরীতি উদ্ভাবনে সনিষ্ঠ প্রয়াস তাঁর কাব্যধারায় মাঝে-মাঝেই পরিলক্ষিত হয়েছে। 'চো রা বা লি' কাব্যগ্রন্থের 'কবিকিশোর', 'মন-দেওয়া-নেওয়া', 'দ্বিধা-দম্পতি', 'শিখণ্ডীর গান', 'টপ্পা-ঠুংরি' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রয়াসের একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দেখা গেছে। তবে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে (অর্থাৎ 'পূ র্ব লে খ', 'সা ত ভা ই চ ম্পা', 'স ন্দ্বী পে র চ র' প্রভৃতি) প্রশ্রয় না পাওয়ায় কবির এই প্রবণতা বিশেষ একটা সংহত রূপ পায় নি। 'অ ন্বি ষ্ট' কাব্যগ্রন্থে এই প্রবণতা আবার নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। 'চো রা বা লি'-তে কথ্যরীতি প্রণয়নের প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল মুখ্যতঃ ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই—গদ্যকবিতার ছন্দকেই নানা কবিতায় নানাভাবে প্রয়োগ ক'রে একটা কথ্যরীতির আমেজ নিয়ে আসার চেষ্টা। পক্ষান্তরে 'অ ন্বি ষ্ট' কাব্যগ্রন্থে প্রয়াসটা ভাষাকে ঘিরে। মাত্রাচ্ছন্দ অবিকৃত রেখেও ভাষায় কথ্যধর্মিতা সঞ্চার ক'রে কথ্যরীতির একটা সুস্পষ্ট আমেজ নিয়ে আসা হয়েছে। 'না ম রে খে ছি কো ম ল গা ন্ধা র' এবং পরবর্তী কাব্যগ্রন্থাদিতে তা আরো উজ্জ্বল, আরো ব্যাপক। 'অ ন্বি ষ্ট'-এর যুগে এসে বক্তব্যে এবং প্রকরণে দূরে সরে গিয়েও কাব্যরীতিতে এইভাবেই বিষ্ণু দে এলিঅটের সঙ্গে সমরৈখিক অবস্থানে বিরাজ করছেন।

'অ ন্বি ষ্ট'-র যুগে এসে বিষ্ণু দে-র কবিপ্রতিভা একটা পূর্ণতার দিকে বাঁক নিয়েছে, মৃদু সুরভির মতো দার্শনিক প্রজ্ঞা তাঁর কবিতাকে আশ্রয় করতে সুরু করেছে।[৮০] পরিণতির যুগে অধিকাংশ কবির মতো এলিঅটও তত্ত্ব এবং

দার্শনিকতার আত্মসমর্পণ করেছেন, তবে স্বভাবতঃই সে-তত্ত্ব এবং দার্শনিকতার সঙ্গে বিষ্ণু দে-র তত্ত্ব ও দার্শনিকতার কোনো মিল নেই। পরিণত বয়সে আধ্যাত্মিকতা ও খৃষ্টধর্ম এলিঅটের তত্ত্ব ও দার্শনিকতার উৎসরূপে গৃহীত হয়েছিল, মার্কস্‌বাদে পোড় খাওয়া বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে এমন পরিণতি সম্ভবতঃ ছিল অনপেক্ষিত। তাছাড়া বিষ্ণু দে-র কাব্যে তত্ত্ব ও দার্শনিকতা মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্যও পায় নি।

'এল্‌ সিনোরে', 'জল দাও' প্রভৃতি কবিতায় কালের বাগানের প্রতীক ব্যবহার করেছেন কবি, এর সঙ্গে এলিঅটের 'বার্নট্‌ নর্টন' কবিতার গোলাপ বাগান প্রতীকের একটা দূর সাদৃশ্য একান্ত অননুভূত নয়। এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনা 'অন্বিষ্ট' কাব্যে একবারই দেখা গেছে 'শুশুনিয়া' কবিতার প্রথম অনুচ্ছেদে।

বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই, প্রাণ এক ছিটে ;
না জানি কী অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধ্রের মন্ত্রণা
স্বর্গহীন লুসিফর, বীলজেবব, ম্যামনেরা ; মাটির যন্ত্রণা
থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালিতে কাঁকরে অভ্রে লাইমে গ্রানিটে ঃ
নিরন্ন নীরস নগ্ন, শুষে খায় তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ ;
একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া, নেই কীটেরও আভাস,
শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আশ্বাস।

কবি-প্রতিভার পরিণতির সঙ্গে, বিশেষতঃ বিষ্ণু দে-র কাব্যসাধনার সঙ্গে, এ কথার সম্পর্ক নিতান্ত কাকতালীয় কিনা জানি না, 'পূর্বলেখ'-রা পরবর্তী পর্যায়ে, অবশ্যই 'জন্মাষ্টমী' উত্তর কালে, বিষ্ণু দে-র প্রতিভা যতই পরিণতিমুখী হয়েছে ততই তাঁর কাব্যে এলিঅটীয় কাব্যরীতি, আঙ্গিক, প্রকরণ প্রভৃতি যা উভয় কবির কাব্যকে বহির্লক্ষণে একটু আপাত নৈকট্য দিয়েছিল সেগুলি অনতিলক্ষ্য হয়ে উঠেছে ; আর তৃষ্ণা, জল, বৃষ্টি প্রভৃতির মতো এলিঅটীয় প্রতীক যা আদিতে ছিল অনতিলক্ষ্য তারা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা ও প্রাধান্য নিয়ে বিভিন্ন কবিতায় জাঁকিয়ে বসেছে। 'জল দাও' অনুরূপ একটি কবিতা। কবিতাটি 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাই নয়, তৃষ্ণা-জল-বৃষ্টি প্রভৃতি প্রতীক নিয়ে লেখা বিষ্ণু দে-র অন্যতম প্রধান কবিতা। এই কবিতাটিও 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর মতো উর্বরতা তত্ত্বেরই একটি কবিতা। এরও প্রেরণায় 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-সুলভ fertilitay ritul-এর অস্তিত্ব আছে এরকম সংশয়ও প্রকাশ করেছেন কেউ-কেউ।[৩১] বন্ধ্যাত্ব ও সৃষ্টি-

প্রসঙ্গ এর বিভিন্ন অংশে স্থান পেয়েছে। বন্ধ্যাত্বের ইঙ্গিত নিহিত আছে এই চরণগুলিতে :

অত্যাচারে অনাচারে উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শূন্যে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে,
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান

আবার সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায় এমন চরণও সহজলভ্য :

তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরোথরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল

উপসংহারে 'জল' এলিঅটীয় সঞ্জীবনী-প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে :

জল দাও আমার শিকড়ে।

'অন্বিষ্ট'-এর দার্শনিক প্রজ্ঞা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এও প্রসারিত। অবশ্য সে-প্রজ্ঞা, সে-আনন্দ, সে-প্রেমের গান, সে-মুক্তির স্বাদ আকাল ও বন্যা, উপবাসী মানুষের রোদন, কালোবাজারের গৃধ্নুতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতিতে বিড়ম্বিত।

আমার আনন্দে আজ আকাল ও বন্যা প্রতিরোধ,
আমার প্রেমের গানে দিকে দিকে দুস্থের মিছিল,
আমার মুক্তির স্বাদ জানে না কো গৃধ্নুরা নির্বোধ—
তাদেরই অন্তিমে বাঁধি জীবনের উচ্চকিত মিল।

নেকড়ের হন্যের দেশ ছিন্নভিন্ন, সন্দেহ ও ভয়
কলুষ ছড়ায় দুই হাতে, গায় শৃগালে বাহবা।
তবুও আকাশ ছায় আমাদের মুক্তি উচ্চৈশ্রবা,
মানুষ দুর্জয়। ('২২শে শ্রাবণ')

সাময়িক বিরতির পর সমসাময়িক সমস্যাবলী আবার বিষ্ণু দে-র কবিতায় ফিরে এসেছে, এলিঅটীয় চেতনাগুলিও ফিরে এসেছে ; কিন্তু 'সাত ভাই চম্পা, কিংবা 'সন্দ্বীপের চর'-এর যুগের দৃষ্টিভঙ্গি আর বিষ্ণু দে-র কাব্যে ফিরে আসে নি। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর যুগে

ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে। উপস্থাপন এবং কথনভঙ্গিও তীর্যক। সম্ভবতঃ দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন প্রতিভার পরিণতিরই ফলশ্রুতি। প্রথম বয়সের চাঞ্চল্য, উচ্ছলতা ও বিস্ময় স্থিতধী প্রৌঢ়ত্বে তির্যকতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রথম জীবনের প্রশ্রয়পুষ্ট চেতনা ও প্রবণতাগুলিও এযুগে নির্বিচারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কটাক্ষের প্রলেপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এলিঅটের প্রতি কটাক্ষ থেকে কবির তির্যক প্রবণতার গভীরতা সহজেই অনুমান করা যায়। বিষ্ণু দে-র কাব্যসাধনায় এলিঅটের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তাই এলিঅট সম্পর্কে শ্রদ্ধাভিভূত উক্তির অভাব নেই বিষ্ণু দে-র বিভিন্ন গদ্যরচনায়। সেই কবিসম্পর্কেই নিম্নরূপ কটাক্ষভরা কবিতা রচনা বিস্ময়োদ্রেক করে।

পোড়ো জমি চ'ষে শেষে স্বত্ব জমে লাট— কি বেলাট,
সে সন্ন্যাস তবে ছদ্মবেশ ?
পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অন্তিমে কি লর্ড এলিঅট
ওয়েস্ট ল্যান্ডে চ'ষে নেন আপন স্বদেশ ?
তাই তো বলেছে শাস্ত্রে সদা আছে ভয়
বিড়াল তপস্বী হোক্, নয় মহাশয়।[৮২]

এই তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি এলিঅটীয় ওয়েস্ট ল্যান্ড চেতনা সম্পর্কেও। পূর্ববর্তী কাব্যসমূহে এই চেতনা ছিল অবিকৃত এবং সম্পূর্ণ এলিঅটীয় ধ্যান-ধারণানুসারী। সে-যুগে ওয়েস্ট ল্যান্ড ছিল দেশের প্রতীক, তা পরিকল্পিত হয়েছে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক শ্মশানভূমির পটভূমিকায়। 'না ম রে খে ছি কো ম ল গা ন্ধা র' -এর যুগে ওয়েস্ট ল্যান্ড পরিকল্পিত হয়েছে সামাজিক পটভূমিকায় ও নাগরিক সভ্যতার দৈনন্দিন নারকীয় দিনচর্যার গ্লানির পরিপ্রেক্ষিতে।

বাসায় ভিটায় কত কত রাজভবনে ভবনে
কত ভোজ উৎসবের শামিয়ানা দেখে দেখে শেষে
আজ মনে হয় এই আমাদের শ্মশান স্বদেশে
বাসর নরক হল একাকার। ('রথযাত্রা ঈদমুবারকে')

বলা বাহুল্য, প্রতিভার পরিণতির যুগে উপনীত হয়ে কবি বিষ্ণু দে ওয়েস্ট ল্যান্ড সম্পর্কিত একটি নিজস্ব ধারণা গ'ড়ে তুলে এলিঅটকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতা ও গ্রামবাংলার মানুষেরা দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে, স্বার্থান্বেষী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে, রোগে-মড়কে যে-জীবন যাপন করেছে স্বাধীনতার সমসাময়িক যুগে তাই ওয়েস্ট ল্যান্ডের জীবনের ছবিরূপে প্রতিভাত হয়েছে তাঁর কবিদৃষ্টিতে।

শতাব্দীতে নয়, আজ মন্বন্তর বছর বছর,
প্রতিদিন দুর্ভিক্ষে বর্বর।
পোড়ো জমি, সুদে সুদে দেউলিয়া ক্ষেত,
অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি নদীর খালের মৃত্যুতে বন্যায় বছর বছর,
এখানে ওখানে, হাল লাঙল ভঙ্গুর, সার নেই, নেই বীজ-ধান,
পেশী নেই, রক্তে রক্তে আকালের কালি, রক্তহীন প্রাণ,
কামারের কুমোরের জেলের তাঁতির পঙ্গু হাত
আনন্দের লেশ নেই জীবনযাত্রায় জীবিকায়
প্রতিদিন ক্লান্ত পদক্ষেপ সুস্থের সাচ্ছল্য হল পার্বণের বা উৎসবের দিন,
দুস্থ রোগ দৈনন্দিন।
বর্তমান ছেয়ে গেল গৃধ্নু চতুরের ক্ষমতার বর্বরের মায়াবী শ্মশান।
('আষাঢ়েরই জয়গান')

কোথাও কোথাও এরকম ব্যাপক বর্ণনায় নয় সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতাত্মক উক্তিতেও ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনা অভিব্যক্ত হয়েছে।

সুরাহা নেই, আবার কলকাতা,
যেখানে চোরাগলিতে ঘোরে জাঁতা,
যেখানে শুধু শ্মশানে দেশমাতা,
হাড়ের হাতছানিই তাকে ডাকে। ('দিনগুলি রাতগুলি')

কিংবা,

হৃদয়ে বনানী রসাল সবুজ লাল
শাল পিয়ালের পিপুলের সমারোহে,
জীবন তবুও ঘৃণ্যের ভিড়, ঠগে ঠগে খাক্ ডাঙা,
শিকড়ে শিকড়ে প্রাণের গঙ্গা রাঙা,
অথচ রাতের কোরকে সদ্য দিনগুলি ঝরে যায়। (ঐ)

অগণন ভিড়াক্রান্ত শহরের অসহায় জীবনের আর জীবিকার বলি অজস্র নাগরিকের এলিঅটসুলভ ছবি একাধিকবার এসেছে এই কাব্যে। এসেছে 'বহুবড়বা ১৯৪৬-৪৭' কবিতায়, এসেছে 'হাওড়া ব্রিজ' এবং 'আমি তো গাঁয়ের লোক' কবিতায়।

তবুও অস্বিষ্ট কেন
অন্বেষার পথে পথে, লালদীঘিতে বিকেল পাঁচটার ভিড়ে
দিশাহারা, সপ্রতীক্ষ, ক্লান্ত, উদাসীন?
জানি না কোথায় শেষ এ প্রচণ্ড জোয়ার ভাটার

ঘাটে ভাঙা ট্রাফিকের, কিম্বা বুঝি শোভাযাত্রী ঢেউ।
এতো নয় সমুদ্র বা নদী কোনো প্রাকৃত উপমা
এই ব্যক্তিসমাজের সীমা পার থেকে অগোচর,
শোথমত্ত জলেরই গভীরে এই সাঁতারু হাতেই
সীমা বুঝি পরিমেয়
রুদ্ধশ্বাস জীবনের প্রচণ্ড আশায়
স্বপ্ন আর কর্ম যেথা একাকার ভ্রূণস্থ মাতৃত্ব যেন
জীবনমৃত্যুর ব্যষ্টি-সমষ্টির ঘূর্ণী কিম্বা বন্যা উন্মুখর স্রোতে
জীবনেরই আশা, শুধু আশাবাদ নয়,
জীব জগতের সুস্থ নিয়মে যা স্বাভাবিক
যেন কাঠ খড় কুটা কিম্বা উপড়ানো বট কিম্বা অশথের চারা
শূন্য আশাবাদে কিম্বা দুঃখের সন্ত্রাসে ভাসে তরল দ্বন্দ্বের ছন্দে
প্রাকৃতিক আত্মদানে যেন কোনো দামোদর অজয়ের বানে
সমষ্টির বৃত্তে ব্যক্তিহীন অনর্থক খাণ্ডবে নিঃশেষ—

'আমি তো গাঁয়ের লোক' কবিতায় প্রুফ্রক কবিতার মতো শীতসন্ধ্যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই 'বিষণ্ণ বন্ধ্যার সন্ধ্যা' ধোঁয়ায় ধুলোয় মৃত্যুই ছড়ায়।

কলকাতার শীতসন্ধ্যা দেখেছ কি টেনেছ কি ঘ্রাণে?...
এখানে তো চোখে কানে নিশ্বাসপ্রশ্বাসে ফুসফুসে হৃদয়ে
শুধু মৃত্যু আর মৃত্যুর প্রলাপ
আর কবন্ধ শবের কোটি জীবাণুর উন্মাদ-সংক্রাম
ভিড় গোলমাল এসপ্লানেড্ ডালহৌসিতে
ধোঁয়ায় ধুলোয় বিষণ্ণ বন্ধ্যার সন্ধ্যা

জীবনের বলি অগণন নাগরিক মানুষেরও দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন কবি। এলিঅটের বর্ণনা অবশ্য এরকম দীর্ঘ নয়, অনেকাংশে ইঙ্গিতাত্মক। বিষ্ণু দে-র কবিতাটি সে-তুলনায় অবশ্যই বর্ণনামূলক।

মুখচাপা বুকচাপা অর্থহীন জীবিকার ভিড় অবিরাম
অসহায় ক্লান্ত জীবনের অবাস্তব উদ্দেশ্যে উধাও
সারে সার সারে সারও নয় এলোমেলো
আকস্মিক অসহায়
অসম্বন্ধ পাশাপাশি নিঃসঙ্গের ভিড়
পায়ে পায়ে সারে সার ট্রামে বাসে

কাতারে কাতারে ভিড়

কেউবা সচল কেউবা অপেক্ষা করে…

স্বভাবতঃই এই ওয়েস্ট ল্যান্ড বা পোড়ো জমি-চেতনার ফলে এলিঅটের মতোই বৃষ্টি, মেঘ, জল প্রভৃতির প্রতীকে সঞ্জীবনী-চেতনাও দেখা দিয়েছে বিষ্ণু দে-র এই কাব্যগ্রন্থেও। 'আষাঢ়েরই জয়গান', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'মনে মনে' প্রভৃতি কবিতায় সঞ্জীবনী-প্রার্থনা প্রাধান্য পেয়েছে। 'আষাঢ়েরই জয়গান' কবিতায় আষাঢ় ও শ্রাবণের প্রতি প্রার্থনা পোড়ো জমি-প্রাণে উর্বরতা এনে দেওয়ার জন্য।

হে আষাঢ়, ধৈর্য দাও, বজ্রে বজ্রে সহিষ্ণু বিদ্যুতে

শ্রাবণে মুষলধারে ধুয়ে দাও পতিত হৃদয়,

বীজকম্প্র মেঘ দাও রৌদ্রে দাও জীবনের গানে

আশ্বিনের স্বচ্ছ জয় ছড়াও ছড়াও এই পোড়ো জমি লাখো লাখো প্রাণে।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে' কবিতায় 'গ্রীষ্মের গৃধ্নুতা' আর 'গলিত তাপের গ্লানি' ধুয়ে দেওয়ার প্রার্থনা জানানো হয়েছে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রতি। অনুরূপ আকুল আকুতি ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায়।

ধুয়ে দাও এই গ্লানি

বাষ্পের আড়ালে এই গ্রীষ্মের গৃধ্নুতা

ওড়াও ওড়াও এই কলকাতার শবে শবে গলিত তাপের গ্লানি

এই স্নায়ুর লড়াই স্বেদের আশ্রয়ে

ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে দাও গ্রীষ্মের গোয়েন্দা তাপে বেঘোর ক্লান্তিতে

আর অঝোর সন্তাপে এই কোকাকোলা গান

কবিতাটির শেষ স্তবকের 'হাওয়ার ঘোড়ার রথ সমুদ্রের ঘোড়া' চরণ 'চো রা বা লি'-র ঘোড়সওয়ার, সমুদ্র, ঢেউ প্রভৃতি প্রতীকের প্রতিই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। স্তবকটিতে কেবল 'কলকাতার গলিত সন্তাপ' ধুয়ে দেওয়ার প্রার্থনাই নয়, 'লবণাক্ত হিমশান্তি মুক্তি-স্নান', অবধি 'লবণাক্ত সঞ্জীবন স্বাদ', 'জীবনের মুক্তির আনন্দ' প্রভৃতিরও প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

ঢেউ দাও সমুদ্রের ঢেউ শুচি হিম উর্মিশুভ্র উত্তাল সবুজ

সবুজ সুনীল ঢেউ ভেঙে দাও নিয়ে চলো বিস্তীর্ণ দোলায়

দুলে দুলে ফুলে ফুলে ভেঙে দাও মালকোশে বা কানাড়ায়

ধুয়ে দাও জলে জলে পাণ্ডুর বালিতে আর স্বচ্ছ জলে
সবুজে ও নীলে দূর ফিরোজায়
ধুয়ে দাও কলকাতার গলিত সন্তাপ
হাওয়ায় হাওয়ায়
মনে দাও ঊর্মিল আছাড় ঢেউয়ে ঢেউয়ে গায়ে দাও
এই স্বেদের আশ্রয়ে কায়েমী নিষেধ
লবণাক্ত হিমশান্তি মুক্তি-স্নান
সঞ্জীবনস্বাদ সমুদ্র বাংলার সমুদ্র ভারতের ভাঙো বাধা
মুক্তি দাও জলে জলে হাওয়ায় হাওয়ায় কাটামারানের পালে পালে
শীতল হাওয়ায় লবণাক্ত সঞ্জীবন স্বাদে বিস্তীর্ণ অবাধ...

'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর উপসংহারে শান্তির স্বস্তিবাচন করেছেন এলিঅট। একে নিছক গতানুগতিক ঔপনিষদিক মন্ত্রোচ্চারণ ব'লে উপেক্ষা করা চলে না, প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই শান্তির স্বস্তিবাচনে তাঁর আন্তরিক সমর্থন থাকা অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণু দে-র শান্তির উদগ্র কামনাও অহেতুক নয়।

শান্তি যে চাই খর শান্তি,
রৌদ্রের শান্তি যা উজ্জ্বল,...

'অথচ সহজ খুঁজি' কবিতায় ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-এর 'In the mountains, there you feel free' এই চরণটির অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়।

মুক্তির সংরাগে
আর চোখে চোখে জাগে কানে বাজে
আসমুদ্র হিমালয় যেন
স্বচ্ছ ও নির্ভর সহজ হাওয়ায় উদ্ভাসিত

শিখর সহজ বটে শেষে, হালকা হাওয়ায়,
আজো সে দুর্গম, পায়ে পায়ে মৃত্যু প্রতিদিন
পেঁছলে সহজ লাগে জীবনের মতন সহজ
সেই তীব্র দেশে ··

বিষ্ণু দে-র 'টাইরেসিঅস' কবিতাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এলিঅট 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্যে টাইরেসিঅস-এর চোখ দিয়েই কবিতাটির মূল ভাবটি পাঠকের সম্মুখে মেলে ধরেছেন। বিষ্ণু দে-র 'টাইরেসিঅস' একটি প্রতীক কবিতা,

বিষয়বস্তু আধুনিক যুগোপযোগী মার্কসবাদী ও বুর্জোয়াবিরোধী, দৃষ্টিভঙ্গি তির্যক। সমগ্র কবিতাটিই উপস্থাপিত হয়েছে টাইরেসিঅসের চোখ দিয়ে দেখা সামাজিক ছবির স্বরূপে। উভয় কবিই সমসাময়িক সমাজের নগ্ন ও বাস্তব রূপ উদ্ঘাটনেই টাইরেসিঅস প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। চরিত্রটির পৌরাণিক স্বরূপ এবং ভূমিকা অবিকৃতভাবেই উভয় কবি স্ব স্ব কবিতায় গ্রহণ করেছেন। এলিঅটের টাইরেসিঅস-এর উৎস ওবিদ, বিষ্ণু দে-র 'টাইরেসিঅস'-এর উৎস এলিঅট নন এমন অনুমানের কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এলিঅটের টাইরেসিঅস-এর I, Tiresias, though blind,..., can see / At the violet hour,...' কিংবা 'I Tiresias,... / Perceived the scene, and foretold the rest—'এর অনুরূপ উক্তি বিষ্ণু দে-র টাইরেসিঅস-এর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে।

আমার দু'চোখ অন্ধ, আমি শুধু দেখি ইতিহাসে
আকর্ণ বিস্তৃত তিক্ত নাট্য পরিহাস এই সধবার একাদশী··

কিংবা,

আমার দু'চোখ অন্ধ অতীত ও ভবিষ্যৎ স্মৃতি শ্রুতি
তোমার উলঙ্গ রূপ তাই দেখি রোজ···

অথবা,

আমি জানি ইতিহাস টাইরেসিঅস্

আমার দু'চোখ অন্ধ, আমি শুধু অন্ধকারে দেখি
অতীতের ধুলো আর ভবিষ্যৎ রাবিশে কাদায়··

এলিঅটের টাইরেসিঅস-এর উক্তিতে 'I Tiresias, though blind' চরণটির আম্রেড়ন নেই। প্রতীচী পুরাণের এই বিশেষ চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ প্রাচ্য মানসে গেঁথে দিতেই কি আম্রেড়ন রীতি অনুসৃত হয়েছে বিষ্ণু দে-র কবিতায় ?

নামকরণ থেকে 'তু মি শু ধু প ঁ চি শে বৈ শা খ' কাব্যগ্রন্থটিকে রবীন্দ্র-প্রশস্তিমূলক কবিতাবলীর সংকলন ব'লে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, যদিচ এতে মাত্র দুটি প্রশস্তিমূলক কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রথমটি নাম কবিতা, প্রথম কবিতাও, অন্যটি 'রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল?' 'বামী' রবীন্দ্রনাথের 'প লা ত কা'-র 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতার উপসংহার কবিতা। রবীন্দ্র কাব্য-ঐতিহ্যের বিরোধিতা এবং এলিঅটীয় কাব্য-ঐতিহ্য আত্তীকরণের (assimilation) মধ্য দিয়েই আধুনিক বাংলা কবিতা তথা কবি বিষ্ণু দে আপন

কাব্যসাধনার পথ কেটে নিয়েছেন। এই বিচারে কবির এতদুভয় কাব্য-বৈশিষ্ট্যের সার্বিক না হলেও আংশিক কাব্যিক প্রকাশ এই কাব্যে অপেক্ষিত ছিল; কিন্তু তার কোনো অস্তিত্ব এই কাব্যে তেমন অনুভূত হয় না। এই কাব্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার উত্তুঙ্গতা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে এলিঅটীয় কাব্যবৈশিষ্ট্য অনুশীলন বিষয়েও তেমন কোনো উগ্রতা প্রকাশ পায় নি।

'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' এবং 'বাসী' কবিতা দুটিতে কবির ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। নাম কবিতাটিতে কবির মনে সসংশয় প্রশ্ন জেগেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ওয়েস্ট ল্যাণ্ড চেতনার দেশে ও কালে রবীন্দ্র কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা (relevance) নিয়ে।

অপঠিত, নির্মনন, নেই আর কোনোও আবেদন ?
সাবিত্রীর ক্ষিপ্রকর বিভা
আমাদের দুস্থ চির গোধূলিতে ম্রিয়মাণ ?
তোমারই কি ছিল এই নিরানন্দ ভঙ্গুর স্বদেশ
আলোহীন অন্ধকারহীন আপন সত্তার থেকে পলাতক
নিস্তব্ধ থাকার ভয়ে একার সংশয়ে জনতার অপমানে
নিত্য রুচি-ক্ষয়ে ক্ষয়ে অসুন্দর ?

'বাসী' কবিতাতেও অনুরূপ জিজ্ঞাসাই ভাষা পেয়েছে। নির্মলপ্রাণ নিষ্কলুষ সত্তারা এই কলুষিত যুগের পরিবেশে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে কি ক'রে, কি ক'রে বড়ো হবে এবং কি ক'রে যে জগতে বৈভব ছড়াবে সেই দুশ্চিন্তাই কবিকে অস্থির ক'রে তুলেছে।

ভয়াবহ হেয় জীবনের ঘেঁষাঘেঁষি
সেই অন্ধকারে ভাবি আমি
ছোট্ট মেয়ে বাসী কি ক'রে যে বড়ো হবে,
বাল্য থেকে কৈশোরের যৌবনের পারে
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি পাবে সম্পূর্ণ সংসারে,
আঁচল-আড়ালে দীপে ভাস্বর সত্তাটি
খাঁটি রেখে বর্তমান জীবনের অন্ধকারে কলুষিত দাবি
মেটাবে সে কি ক'রে যে, ভাবি
কি ক'রে সে অন্ধকার দীপান্বিত ক'রে দেবে,
আরেক বৈভবে।

'চিরঋণী' কবিতায় ব্যবহৃত একটি চিত্রকল্পের সঙ্গে 'প্রুফ্রক'-এর একটি চিত্রকল্পের ক্ষীণ সাদৃশ্য রয়েছে। চিত্রকল্প দুটি যথাক্রমে নিম্নরূপ :

অন্তরঙ্গ এক ডাকে গরাদের ফাঁকে দেখি
আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ একটি হরিণ আর একটি হরিণী
কাচে নাক ঘষে আর মানবিক চোখ মেলে দেয়
উদ্বাস্তু নির্ভরে উপহারে।

The yellow fog that rubs its back upon the windowpanes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the windowpanes...

'শত মুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়' কবিতার সাঙ্গীতিক ঐকতান বর্ণনার সংক্ষিপ্ত এই অংশটির সঙ্গে 'পোর্ট্রেট অব এ লেডি'-এর অনুরূপ অংশের বর্ণনাগত সাদৃশ্য থাকা নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়।

আর কানের গভীরে বাজে মনের অতলে
তূর্যে বাঁশরীতে আর নাকাড়ায়
বেহালার দীর্ঘ লয়ে ভিয়োলার অস্থির স্পন্দনে
চেলোর গম্ভীর ছন্দে সেদিনের সজল আলোয়
গ্রাৎসিয়ার লাবণ্যের সহিষ্ণু দূরতা।

'পূর্ব লেখ' পরবর্তী পর্যায়ে কবি বিষ্ণু দে ক্রমেই এলিঅটীয় কাব্যরীতি ও কাব্য-স্বভাবের আবেষ্টনী থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছেন, এই ব্যবধানটা বিশেষ-ভাবে অনুভূত হয় 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর পর থেকেই। 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থে ওয়েস্ট ল্যান্ড তথা সঞ্জীবনী-চেতনা কেবল 'সমুদ্র রেখা' কবিতায়ই স্থান পেয়েছে।

বৃষ্টি কোথা? রৌদ্রে ঝরে শিলা, কিংবা আগুনে তুষার,
প্রবল প্রপাতে ছুটি, অন্ধ চোখে বালি অবিরত,

পার্থের পৃথিবী নগ্ন দুঃশাসন দুর্বার মরুতে—
বালিতে ছুটেছি—ব্যর্থ বর্তমান জীবনের মতো।

ছায়া কোথা? শুধু সোনা পুড়ে পুড়ে বালিতে নিষ্ঠুর,
আমাদের জীবনের মতো ব্যর্থ, লবণাক্ত জলে।

হঠাৎ বালির যুগ শেষ হল ; মিলনে বিধুর
ডোবাই সমগ্র সত্তা নীলাম্বরী ঢেউয়ের আঁচলে।

'জন্মাষ্টমী ১৩৫৪' কবিতাটির সঙ্গে 'পূর্বলেখ'-র 'জন্মাষ্টমী' কবিতার আঙ্গিকে, রীতিতে, প্রকরণে, বিষয়বস্তুতে কিংবা বিন্যাসে কোনো দিক দিয়েই তেমন সাদৃশ্য চোখে পড়ে না ; সাদৃশ্য যেটুকু তা হল এই যে এলিঅটীয় কাব্যধারার সঙ্গে উভয় কবিতারই আত্মিক যোগাযোগটা উপেক্ষার নয়। তবে এই যোগাযোগের ধরণটা এক নয়। বলা যেতে পারে, 'জন্মাষ্টমীর' সঙ্গে এলিঅটীয় কাব্যধারার যোগাযোগটা প্রত্যক্ষ এবং 'জন্মাষ্টমী ১৩৫৪'-এর যোগাযোগটা অনেকাংশে পরোক্ষ।

'জন্মাষ্টমী ১৩৫৪' কবিতাটি গান্ধীজির প্রতীকাশ্রিত। কবিতাটির আঙ্গিক, বাচনভঙ্গি তথা বিষয়-বিশ্লেষণে যেন এলিঅটের 'জেরনশান'-এরই অনুরণন। বিষ্ণু দে 'জেরনশান'-এর অনুবাদ কালে কবিতাটিকে গান্ধীজির প্রতীকেই গ্রহণ করেছিলেন।[৬৩] 'জন্মাষ্টমী ১৩৫৪' কবিতাটিকেও গান্ধীজির প্রতীকে গ্রহণ করলে তবেই এর প্রতীকদ্যোতনা যথার্থ সার্থকতা পায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অতিক্রান্ত সাতচল্লিশে গান্ধীজির দীর্ঘজীবনের পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাটির প্রতীক পরিকল্পনা। অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় সে-রকম স্বীকারোক্তি কবিতাটিতে নেই ; তবে গান্ধীজির প্রতীক অনুমানের পশ্চাতে এই চরণগুলির ইঙ্গিতাত্মক সমর্থন উপেক্ষার নয় ঃ

'তবুও প্রবীণ কন, আমিই পুরোধা'
'শান্তি চাই, (মোটামুটি) শহর গ্রামের
চেয়েছি শৃঙ্খলা,
দেখেছি তো ভোটাভুটি, বিদেশী স্বদেশী হরেক শৃঙ্খল।
আমার রামের
রাজত্বের রামই নেই,
খেলেছে আমার এই স্থাবর স্বপ্নের রামরাজত্বেই।'
'আমার দধীচি দেহে যতদিন প্রাণ আছে—
অনুচরাবৃত তবু অনবগুণ্ঠিত সত্যেরই নিষ্ঠায়—
চলো সবে শান্তির সেনানী…'
'নিঃসঙ্গ অশীতি
আমার বিজয়বার্তা তাই আজ গোত্রহীন সত্যকাম মহাজনতায়
খুঁজে ফেরে দীর্ঘ জীবনের অর্ঘ্যে দুর্বিষহ স্মৃতি।'

লক্ষণীয় 'নিঃসঙ্গ অশীতি' বলতে গান্ধীজির আশী বছর বয়স বোঝাতে চান নি। ১৯৪৭ সালে তাঁর বয়স আশীতে পেঁছোয় নি। অথচ একই সময়ে রচিত 'গান্ধীজির জন্মদিনে' কবিতায়ও বলা হয়েছে 'অশীতি, তবু অমর এই মিতা'। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে 'অশীতি' শব্দে কবি 'আশীর কোঠা'-ই বোঝাতে চেয়েছেন। 'গান্ধীজির জন্মদিনে' কবিতা থেকে আর একটা সত্যও প্রতিষ্ঠিত হয় যে 'জন্মাষ্টমী ১৩৫৪' ও 'গান্ধীজির জন্মদিনে' কবিতাদ্বয় রচনাকালে কবির অন্তঃকরণ ও চিন্তা গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব ও মাহাত্ম্যে আচ্ছন্ন ছিল।

প্রতীক-সাদৃশ্য ছাড়া আঙ্গিকগত আর যে সমস্ত কারণে 'জন্মাষ্টমী ১৩৫৪' কবিতায় 'জেরনশান'-এর অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নরূপ :

ক. জটিল মানসিকতা তথা বহু ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি,

খ. পরিণত বয়সের হতাশা ও নৈরাশ্যজনিত উষ্মা, ক্ষোভ প্রভৃতির প্রকাশ,

গ. অসহায় পাপবোধ,

ঘ. আগাগোড়া উত্তমপুরুষের বাচনে নিঃসঙ্গ সংলাপ,

ঙ. স্বগত স্মৃতিচারণ

দার্শনিক প্রজ্ঞা বিষ্ণু দে-র কবিতায় ভর করতে শুরু করেছে 'অন্বিষ্ট'-এর যুগ থেকে এবং 'অন্বিষ্ট', 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' ও 'আলেখ্য'-এর কাল কেটেছে তাঁর মুখ্যতঃ অন্বিষ্টের অন্বীক্ষায়। কাব্যসাধনার একেবারে ঊষাকাল 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর যুগ থেকেই তাঁর মানবিক চেতনায় বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিতকরণের এক সনিষ্ঠ ও সচেতন প্রয়াস ধরা পড়েছে। অবদমিত রোমান্টিক চেতনা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ছাপিয়ে ওঠে নি তা নয়, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ চেতনাই কবিকে রবীন্দ্ররোমান্টিকতায় পতন থেকে রক্ষা ক'রে পেঁছে দিয়েছে এলিঅট-সমধর্মা চোরাবালি-চেতনায় এবং পরবর্তী কালে পূর্বলেখ-এর যুগে আনন্দ-চেতনায়। 'অন্বিষ্টের' যুগের আনন্দ ও মুক্তির দ্বৈতাদ্বৈতবোধে উপনীত হতে কবিকে 'সাত ভাই চম্পা' এবং 'সন্দ্বীপের চর' পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে কবিদৃষ্টির সঙ্গে দার্শনিক প্রজ্ঞাদৃষ্টিরও হরগৌরী মিলন ঘটেছে।

বহুখ্যাত ও সম্মানিত কাব্যগ্রন্থ 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর যুগে কবির দৃষ্টিভঙ্গী আংশিক আত্মমুখী হয়েছে, দার্শনিক প্রজ্ঞাও হয়েছে আত্মজিজ্ঞাসায় সমাহিত। দার্শনিক প্রজ্ঞা তাঁর 'কালের বাগানে' প্রসারিত। এই

কালের বাগান 'ব্যক্তিতে সমাজে দেশে' ছড়ানো স্বদূরে অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতে—অনাদ্যন্ত কালে। অতীত ইতিহাসের পাতাতেই বেঁচে থাকে, জেগে থাকে মানুষের স্মৃতিতেই। আমাদের দেশ যার 'সুজলা সুফলা এই মলয় শীতলা মাতা'-র ধ্যানরূপ আমাদের অন্তঃকরণে এবং যে দেশ লালনীলকমলের।

… …প্রাচীন পরিচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী
প্রজ্ঞায় সংহত স্মৃতির শিকড়ে ধন্য কালের বাগানে।

অথচ সেই দেশ আজ অর্থাৎ বর্তমানে

…বিচ্ছিন্ন ছারখার, হাজার দাগায় আহত বিকল
যেন বা দেহের সব আছে, শুধু স্নায়ু স্নায়ুকোষ
অভুক্ত, অসুস্থ, কাটা, পঙ্গু শতশত স্নায়ু স্নায়ুকোষ,
তাই আমাদের মনে, বাস্তবজীবনে কবন্ধের ছড়াছড়ি,
বাংলায় হাজার রূপের হাজার রাক্ষস, বহু ছল ক্ষমতার হরেক কৌশলে।

আর তারই পরিণামে,

তাই আত্মপরিচয় নেই, ব্যক্তি নেই, সত্তা নেই,
লালনীলকমলের দেশে আজ বর নেই,
বিধবার দেশে অরক্ষণীয়ার সুন্দরীর বর নেই, সত্তা নেই,

এ-সমস্যা আমাদের একলার নয়, কেবল আমাদের দেশেরই নয়; এ-সমস্যা আধুনিক সভ্যতায় সমগ্র মানবসমাজেরই, বর্তমান পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই ঃ

…আজ তাই দেখা যায় সত্তার সমস্যা,
সংহতির সীমিত সত্যের, সাম্যের সখ্যের মহাদেশে
এদেশে ওদেশে, দেশের দশের মধ্যে ব্যক্তির মুকুলে।

অথচ সত্তাই তো অস্তিত্ব এবং তাই তো বর্তমান। 'সত্তার সমস্যা' অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা তো শূন্যতারই নামান্তর। আর শূন্যতাই তো নরক। আমরা আধুনিক সভ্যতার মানুষেরা নাগরিক সভ্যতার দায়ভাগীরা এই নরকেরই অধিবাসী।

এ নরকে
মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,
যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
সেখানে মজুর নেই, চাষা নেই,

যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
বাঁচাবার আশা নেই, বাঁচবার ভাষা নেই,
সেখানে মড়ক অবিরত
সেখানে কান্নার সুর একঘেয়ে নির্জলা আকালে
মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
কারণ কারোই কোনো আশা নেই
অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই।
চৈতন্যে মড়ক।[৬৪]

স্বভাবতঃই এই নরক থেকে ভবিষ্যৎটাও নৈরাশ্যভরাই মনে হয়, ভবিষ্যৎকেও দুঃস্বপ্ন আর শূন্যতার নামান্তর ব'লে প্রতীয়মান হয়।

তাই রাত্রি যন্ত্রণাই, অবসর অস্থিরতা, ক্লান্তিকর,
রাত্রি আর দিন যেন সতীনেরা
সদাই উদ্যত, ভবিষ্যত দুঃস্বপ্নে শূন্যতা,
স্মৃতি শুধু শোক।
প্রতিদিন প্রতিরাত্রে
ঘরে ঘরে-বাইরেও কাতরায় শূন্যতার সেই একই রোখ।

('চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা')

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর নরক-চেতনার সঙ্গে এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনার সাদৃশ্য অবশ্যই অস্বীকার্য নয়, কিন্তু বিষ্ণু দে-র ঐ নাম-কবিতার সঙ্গে এলিঅটের 'বরনট্ নরটন্' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্যটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত-চেতনার সঙ্গে এলিঅটের ক্ষণিক এবং অনন্তের সমন্বয়-চেতনার গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। কালচেতনার গণ্ডিতে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন এলিঅট তাঁর 'বরনট্ নরটন্' কবিতায়।

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility

Only in a world of speculation.

What might have been and what has been

Point to one end, which is always present.

বিষ্ণু দে-র কবিদৃষ্টিতে অতীত কালের প্রতীক স্মৃতি আর বর্তমানের প্রতীক সত্তা। কেবল 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কবিতাতেই নয়, অন্যান্য আরো কয়েকটি কবিতায় দৃষ্টিকে বর্তমান থেকে অতীতে ও ভবিষ্যতে প্রসারিত করার প্রবণতা ধরা পড়েছে। 'পাকে'' কবিতায় শিশুর মেলা দেখতে গিয়ে অনুরূপ কালচেতনা জেগেছে কবির মনে।

সবাই প্রজ্ঞায় স্বচ্ছ, যেন ভারতের জীর্ণ দীর্ঘ ইতিহাসে
এরাই একাল থেকে সেকালের মোগলপাঠান মৌর্য বা কুশন
বহু মৃত্যু দেখে দেখে চলে যায় অনাহত খেলার প্রত্যয়ে
ভবিষ্যতে, যা এদের বর্তমান, এরা যার পুষ্টি ও পুষণ।

'মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে' কবিতায়ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালচেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

জীবনে বহু পেয়েছি স্বাদ, তাই জীবনচিত্র
ব্যাপ্ত দেখি দূর অতীতে আর ভবিষ্যতে।
সাধ মেটেনি, জ্বালাও ঢের, আহিতাগ্নি আশা
আজও অমর, তাই তাকাই আরেক পানিপথে—
নিশ্চয় শেষ শান্তি হবে, পৌত্র বা দৌহিত্র
আমারও তাই হবার সাধ,...

আমার তাই মনটা ছোটে আরেক স্পুৎনিক,
শূন্যে নয়, মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে ?

এলিঅটের 'the rose garden' কিংবা 'through the first gate into our frist world' প্রভৃতি প্রতীকের অনুসারীবিষ্ণু দে-র 'কালের বাগান' 'গোলাপ বাগান' কিংবা 'অলৌকিক বাগান'-এর প্রতীক এসেছে আলেখ্যর যুগ থেকেই। তবে এলিঅটের মতো এই সমস্ত প্রতীকের পশ্চাতে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে বিষ্ণু দে-র অনীহা সুস্পষ্ট। এলিঅটের 'দি রোজ গার্ডেন' শুধুই গোলাপ বাগান কিংবা জীবনের এক বিশিষ্ট গূঢ় দিকই নয়, তা অনেকাংশে দি গার্ডেন অব ঈডেন-এরই নামান্তর ; পক্ষান্তরে বিষ্ণু দে-র কালের বাগান কিংবা অলৌকিক বাগান সম্ভবতঃ নিছক অন্তর্জগৎ ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরাও জানি তা, ভাবিও তাই যে,
তাই মনে রং ধরে সুগন্ধে ঘনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে
নন্দিত জীবনে নির্ভিক অজস্র রঙে ফুল ফোটে
সার্থক জন্মের মাগো শিকড় ছড়ায় বাহিরে ও ঘরে
সর্বত্র বাস্তব,
অলৌকিক বাগানে অন্দরে অন্ধকারে পাথরে কাদায় ভিজে
অন্তরে অন্তরে গানে গানে মাটিতে কাঁকরে জীবনের ভিতে।
('সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে')

বিক্ষিপ্তভাবে এই কাব্যগ্রন্থেও কয়েকটি কবিতায় ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনা স্থান পেয়েছে। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' ছাড়াও এই সমস্ত কবিতাগুলি হল 'চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা', 'নিজস্ব সংবাদদাতা', 'গাছ মরে,' 'অথচ আকাশ বলো নীল,' 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি। 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় বিশ্বকবির 'সৌন্দর্যের আনন্দ-বেদনা'-র বিপরীত চিত্র দেখাতেই বাস্তবের ওয়েস্ট ল্যান্ড রূপ তুলে ধরেছেন।

এ কী অভিশপ্ত দেশ, তিক্ত রৌদ্রে শূন্য মরুভূমি।
চৈতন্যেও নিরুদ্দিষ্ট নিমন্ত্রিত নিরাকার ঘৃণা।
কালবৈশাখীর নিত্য নিয়ন্ত্রিত প্রতিবাদ বিনা
ঈশান উমার বিয়ে সে কোন্ শ্মশানে জানি না ;···
আকাঙ্ক্ষার কোথা মেঘ রিক্ত রৌদ্রে ঘৃণার বৈকালী,
রুগ্ন ক্ষিপ্ত পূতিগন্ধ পথে পথে ত্যক্ত আবর্জনা।

গ্রামের চিত্র আঁকতে গিয়েও 'নিজস্ব সংবাদদাতা' কবিতায় অনুরূপ ওয়েস্ট ল্যান্ডের ছবি ঃ

ঘুরি তিক্ততায় দগ্ধ ক্যাম্পে, ছাউনি-বস্তিতে
গ্রামে গ্রামে, পোড়া মাঠে পোড়ো দেশে
যেখানে একালে, মনে হয়, চিরকাল বার্ষিক আকাল।
মাথায় প্রচণ্ড রৌদ্র, পায়ে মাটি কোথাও চৌচির
কোথাও বা হাঁটু ধুলো,
জল নেই, মানুষের চোখে মুখে জল নেই,
শুধু ঘৃণা, অবিশ্বাস, দীর্ঘকাল বঞ্চিতের সন্দেহ সংশয়।

নাগরিক জীবন সম্পর্কে এলিঅটীয় প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় 'অথচ আকাশ বলো নীল' কবিতায় ঃ

অথচ আকাশ বলো নীল
কলকাতায়ও আহত আকাশ !
ধূলায় ধোঁয়ায় তিলতিল
ফুসফুসের ধূসর সন্ত্রাস,
দুর্গন্ধের বিবর্ণ নিখিল
যেখানে ঊর্ধ্বে প্রতিভাস।
তবু তো আকাশ ভাবো নীল।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থে ওয়েস্ট ল্যান্ড সম্পর্কে দেশ-কালোপযোগী একটা নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠেছে কবি বিষ্ণু দে-র। কিছু কিছু অনুরূপ নজির 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কাব্যগ্রন্থেও আছে। 'গাছ মরে,' 'চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা' প্রভৃতি কবিতায় এর স্বাক্ষর রয়েছে। অরণ্য ব্যবসায়ীদের গৃধ্নুতায় অরণ্যভূমি কালে শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়, তেমনি মানুষেরই সর্বগ্রাসী গৃধ্নুতায় সোনার দেশ পোড়ো দেশে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গেই 'গাছ মরে' কবিতায় লিখেছেন ঃ

ঝড়ে নয়, জল-ঝড়ের অভাবে
বজ্রবৃষ্টি রুদ্ধ ব'লে
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ মহাপুরুষ স্বভাবে
মারী লাগে, মড়ক লাগায়।
জল নয় ঝড় নয়, অনাবৃষ্টি অকালের বীজে
চোরা মৃত্যুর মরশুমে শিকড়ের মর্মে মর্মে
মাটির অন্দরে ভিজে উদ্ভিদের মনে প্রাণে
শ্মশান জাগায়। কে বা কারা ?

'চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা' কবিতায় কবি স্পষ্টতঃই বলেছেন মানুষেরই পাপে (? প্রেমের অভাবে) 'আজ…হাসি পাঁক, রৌদ্র আজ…অশ্রুজলে,/ আজ মরুভূমি সাজে সাগরে সাগরে' ঃ

চতুর্দিকে নির্বোধের ভিড়,
কেউ ভালো, কেউ মন্দ, এরা সকলেই
স্বার্থে বা পরার্থে ঢাকে বর্ষার নিবিড়
সজল বাহার, ঢাকে দু'চোখের নীড়
কথার কালিতে নানা নির্বোধ কৌশলে।

পৃথিবী ঢেকেছে এরা জীবনের মাটি
করেছে শ্মশান পোড়া, পোড়ো ;···

চতুর্দিকে মাটিতে আকাশে
এরাই করেছে ভিড়, শালিক ও কাক
কিছু বা শকুন, আর বিচালিতে ঘাসে
বাছুব, শিবের ষাঁড, আর হাঁকডাক
করে বটে পাড়ায় পাড়ায় কুকুর আশ্বাসে।

'জন্মাষ্টমী', 'জল দাও', 'আষাঢ়ের জয়গান' প্রভৃতি কবিতায় ওয়েস্ট ল্যান্ড থেকে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে এলিঅটের মতোই বিষ্ণু দে-ও উর্বরতার উৎস মেঘ বৃষ্টি জল প্রভৃতির প্রার্থনা জানিয়েছেন ; কিন্তু 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের' যুগে নিজস্ব ওয়েস্ট ল্যান্ড ধারণা গড়ে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে একটা নিজস্ব ওয়েস্ট ল্যান্ড-প্রতিরোধ ধারণাও লালন করেছেন। এ প্রতিরোধ একান্তই আত্মিক।

চোখ ঢাকো কান চাপো, বুক চাপা দুঃস্বপ্নের ভিড়ে
নৈঃসঙ্গ্য রোপণ করো, প্রতিরোধ অন্বিষ্টের ধ্যানে ;
অবজ্ঞায় ঘৃণায় নেতিতে, একান্ত সজ্ঞানে
প্রেম-কে লালন করো স্বপ্নশুচি নীড়ে,
অন্য অরণ্যের ভিড়ে, আপন সম্মানে,
গাছপালা পশুপাখি শিশুর কল্যাণে,
মানুষের, যত মেয়ে-পুরুষের গানে।

অনুরূপ আভাস পাওয়া যাবে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কবিতায়ও :

নরকের দাহ দাও নরকের আত্মগ্লানি হে যম জীবন
অশ্রু দাও প্রাসাদে প্রাসাদে বসতিতে মজ্জায় মজ্জায় অবসাদে
যন্ত্রণার বাণী দাও মর্মে দাও সজল শিকড় ফুলে ফলে শাখায় পল্লবে
রূপান্তরে প্রাণ দাও অভ্যন্তের তিক্তের ক্ষুব্ধের
চৈতন্যের ক্ষুরধার ক্ষিপ্র প্রতিবাদে স্পষ্টবাক্
জীবনমৃত্যুর এ গোধূলিই স্বচ্ছতা পাক
বৈশাখী রৌদ্রের আর কালবৈশাখীর আন্দোলিত রবে।

এলিঅটের 'ল্যান্ডস্কেপস' কবিতাগুচ্ছের 'নিউ হ্যাম্পসায়ার' কবিতার সঙ্গে 'স্মৃ তি স ত্তা ভ বি ষ্য তে' র 'সূর্যাস্ত-বেলায়' কবিতাটির দূর সাদৃশ্য বর্তমান। বিষ্ণু দে-র এই কবিতাটিও নিসর্গদৃশ্যেরই বর্ণনা এবং পরিণত বয়সে শিশুদের গাছে-গাছে খেলার দৃশ্য থেকে আনন্দ-উপভোগের প্রয়াস। এলিঅটের কবিতায় ঃ

'Children voices in the orchard
Between the blossom-and the fruit-time ঃ

বিষ্ণু দে-র কবিতায় ঃ

গরমের পোড়া দিন, গিয়েও যায় না।
জারুলের ফুলে ফুলে শিশুদের খেলা
থামেই না, বলি ঃ আহা হোক না বায়না,
এখনও তো আমি আছি ; ···
আমি আছি, চেয়ে আছি চোখ-মন মেলা ;
ওই দুটি শিশু দেখি, গাছের পাতায়
ফুলে ঘাসে একাকার ; সূর্যাস্ত-বেলায়
এই বুঝি মানুষের জীবন্ত আয়না ?

এলিঅটের ব্যাপক সৃষ্টিশীল অভিঘাত একাধারে বাংলা কাব্যের জগতে এবং বিষ্ণু দে-র কবিসত্তায় উভয়তঃ ক্রিয়াশীল হয়েছিল এই শতকের তিরিশের দশকের একেবারে গোড়ায়। বিষ্ণু দে-র কাব্যধারার মতোই বাংলা কাব্যের ধারাও নব সৃষ্টিসম্ভাবনারহিত তথা বহু ব্যবহারে ক্রমেই বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত পূর্ববর্তী রোমাণ্টিক ঐতিহ্য অতিক্রম ক'রেনবসৃষ্টিতে মুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কালগত ব্যবধানে প'ড়ে এই অভিঘাত ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। প্রায় দুই দশক অতিক্রান্ত হতে না হতেই বাংলা কাব্য এলিঅটীয় ঐতিহ্য অতিক্রমণ ক'রে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গ'ড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। বিষ্ণু দে-ও সক্ষম হয়েছিলেন এলিঅটীয় ঐতিহ্য অতিক্রমণ ক'রে নিজস্ব কাব্যরীতি এবং কাব্য-আঙ্গিক সৃষ্টি করতে। 'না ম রে খে ছি কো ম ল গা ন্ধা র'-এর পর থেকেই একথা আরো বেশি অনুভূত হয়েছে। বিশের বা তিরিশের দশকের বিষ্ণু দে পঞ্চাশের বা ষাটের দশকের বিষ্ণু দে নন, একথা কেবল মানুষ বিষ্ণু দে সম্পর্কেই নয়, কবি বিষ্ণু দে সম্পর্কেও স্বাভাবিক কারণেই সত্য ! আর সে-কারণেই পঞ্চাশের দশকের পর সম্ভবতঃ বিষ্ণু দে-র কাব্যে এলিঅটীয় ছোপ খুঁজতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ ততদিনে মানুষটির মতোই তাঁর

কাব্যও এলিঅটীয় পরিমণ্ডলের মোহ ও প্রয়োজন কাটিয়ে যথার্থই অনেকখানি দূরে সরে গেছে। কিন্তু সেই প্রথম যুগের প্রথম ভালবাসায় আঁকড়ে ধরা বিশেষ-বিশেষ ভাববাহী এলিঅটীয় বিশিষ্ট প্রতীক ও চিত্রকল্পগুলি যেন কিছুতেই বিষ্ণু দে-র কাব্যজগৎকে ছেড়ে যেতে পারে নি। তাই 'ই তি হা সে ট্রা জি ক উ ল্লা সে'-র মতো ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের কাব্যগ্রন্থেও 'পোড়ো জমি', 'ফাঁপা মানুষ', 'জন্ধ তেপান্তর', 'ফণিমনসা' [৬৫] প্রভৃতি একান্তই নির্ভেজাল এলিঅটীয় প্রতীক ব্যবহৃত হতে দেখেও বিস্মিত হওয়ার অবকাশ থাকে না। বৃষ্টি, মেঘ, জল প্রভৃতি এই কাব্যেও এলিঅটীয় রূপকার্থ নিয়েই দেখা দিয়েছে। উর্বরতা ও বন্ধ্যাত্ব প্রসঙ্গও এলিঅটীয় ভাবধারারই অনুসারী।

তবু জলে ফলে ভালো, না হলেই শূন্যে হাহাকার।
মাটিও পরান্নে ক্লান্ত, হৃতমান, জরিষ্ণু নিঃসার,
প্রাচীন লাঙল দীর্ণ, শীর্ণ দুটো বলদ সম্বল।
সর্বদা আকাশে মুখ নিষ্পলক, চায় শান্তি, জল। [৬৬]

তবে এলিঅটীয় প্রতীকগুলি বিষ্ণু দে-র গোধূলি পর্যায়ের কাব্যসমূহে এলিঅটীয় তাৎপর্যেরই ভাববাহী নয়, বিষ্ণু দে-র স্বপ্রতিপাদিত আনন্দ এবং মুক্তি তত্ত্বেরও দিশারী।

তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি, দুপুরের শেষে প্রায় নামল বিকেলে,
বাড়িঘর ভেসে গেল, অন্ধকার আপিস অঞ্চল,
জলে জলে বাতাসের ছাটে ছাটে সতেজ সজল
ক্লান্ত তিক্ত অভাবের মন যত, কদম্বকেশর শত মেলে
সুখের শিখরে বুঝি।

তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি। আমাদেরও হৃদয় চঞ্চল,
ময়ূর না হোক তবু মানুষেরই মতো পাখা মেলে
দপ্তরে আড়তে ঘরে সকলেই ভোলে অবহেলে
বর্তমান গ্লানি-জ্বালা, চলে যায় স্বভাব-সরল
শৈশবেই, মহাখুশি জলপথে ইস্কুলের ছেলে,
ইলিশের মতো মুক্ত। সারা দেশে জলের ফসল।

('তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি')

এলিঅটীয় প্রভাব কিংবা অভিঘাত যাই বলি না কেন বিষ্ণু দে তথা বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এই গতি ও প্রবহমানতার মধ্যেই তা সার্থক হয়ে উঠেছে, গতি-

রূপান্তরে বন্ধ্যা হয়ে যায় নি। এ কারণেই এলিঅট বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সম্ভবতঃ ক্যাটালিটিক এজেন্ট নন, তাড়িৎ সংশ্লেষক।

৪.

কাব্যরীতি সংক্রান্ত এলিঅটের মূল সিদ্ধান্তগুলি সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েই কাব্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, বিষ্ণু দে সম্পর্কে এরকম নিঃসংশয়িত ধারণায় উপনীত হওয়া আদৌ অযৌক্তিক নয়। যে সমস্ত কাব্যরীতি, আঙ্গিক, প্রকরণ ও প্রবণতা-সঞ্চার ক'রে এলিঅট তাঁর কাব্যে ও কবিতায় এক স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, বিষ্ণু দে-ও (সেই সঙ্গে কল্লোল কবিগোষ্ঠীর আরো কেউ কেউ) সে-সমস্ত তাঁর কবিতাবলীতে যথাযথ প্রয়োগ ক'রে বাংলা কাব্যেও স্বতন্ত্র স্বকীয় ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৭] বলা বাহুল্য সে-ঐতিহ্য আধুনিক বাংলা কবিতারই ঐতিহ্য। আধুনিক সভ্যতার বৈচিত্র্য ও জটিলতা ('variety and complexity') গভীর ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বেদ্যতায় ('refined sensibility') আধুনিক কবিতাকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলবেই, এলিঅটীয় কাব্যরীতির এই মৌলিক সত্যটি[৬৮] বিষ্ণু দে যেমন তাঁর কাব্যচর্চার উষালগ্ন থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তা কাব্যেও রূপায়িত করেছিলেন, তেমনি স্ব-কাল এবং স্বকীয় কাব্যের উপযোগী ভাষা-নির্মিতিতেও কবির একটা প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ('direct duty to the language') আছে, কাব্যভাষা সম্পর্কিত এলিঅটের অনুরূপ মতবাদ বিষয়েও বিষ্ণু দে একেবারে গোড়া থেকেই ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কাব্যভাষাকে কথ্যরীতির নৈকট্যে নিয়ে আসার সক্রিয় ও আন্তরিক প্রয়াস এলিঅটের মতো বিষ্ণু দে-রও কাব্যসাধনার অঙ্গীভূত।

এলিঅটীয় কাব্য-আঙ্গিক, প্রবণতা, প্রকরণ প্রভৃতিও বিষ্ণু দে-র কাব্যে সংক্রমণের বহুল নজির আছে। তবে একথাও স্বীকার্য যে, এ-অধমর্ণতায় বিষ্ণু দে নিঃসঙ্গ নন। আধুনিকম্মন্য সমসাময়িক সতীর্থ অনেক কবিই এলিঅটীয় আঙ্গিকাদি আহরণে এবং কাব্যপ্রয়োগে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এলিঅট প্রভাবিত এই সমস্ত কাব্যলক্ষণগুলির সবিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২.

এলিঅট এবং বিষ্ণু দে-র বৈসাদৃশ্যে কাব্য-বিষয় অপেক্ষা ধর্মবিশ্বাস, মতাদর্শ এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়েই অধিকতর। এলিঅট খৃষ্টীয় অ্যাংলো-ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসে আস্থাশীল, একথা নিছক আপ্তবাক্য নয়; প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁর কাব্যবিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের ভিত নড়াতে পারে নি। যদ্যপি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসে শূন্যতা জেগেছিল এবং এই শূন্যতাপূর্তির ভূমিকাই নিয়েছিল মার্কসবাদ অনুশীলন। এলিঅটের কবিদৃষ্টি ক্রমেই অধ্যাত্মমুখী হয়েছে। 'Ariel Poems' কিংবা 'Four Quartets'- এর কাব্যমূল্য হয়তো নগণ্য নয়, কিন্তু এই সমস্ত কবিতার আধ্যাত্মিকতাও উপেক্ষার নয়। এই আধ্যাত্মিকতার পথ ধ'রেই তিনি খৃষ্টীয় শুদ্ধিকরণ চিন্তাধারায় (idea of purgation) পৌঁছোতে পেরেছেন। অগ্নি এলিঅটের কাব্যে শুদ্ধিকরণেরই প্রতীক।

অনুরূপ আধ্যাত্মিকতায় আত্মসমর্পণের দুর্বলতা থেকে বিষ্ণু দে-কে উদ্ধার করেছে মার্কসবাদী দার্শনিকতা, তাঁর কবিতাও আধ্যাত্মিকতা কিংবা ধর্মীয় মতবাদের বাহন হয়ে ওঠে নি। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বিষ্ণু দে-র কাব্যমানসের পশ্চাৎপটে ভারতীয় পুরাণ-চেতনা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান; বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি তাঁর কবিতায় প্রচুর উপাদান যুগিয়েছে, কিন্তু তুলনামূলক ভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা প্রশ্রয় পায় নি। এমনকি নাগরিক সভ্যতার নারকীয় গ্লানি থেকে মুক্তির আশায় পূষণ অর্থাৎ সূর্যের প্রতি প্রার্থনা 'রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্যআকাশ / এই নিত্য অপঘাত দূর করো' কিংবা হিরণ্ময় আবরণ অনাবৃতকরণের আকাঙ্ক্ষায় অথবা 'সবিতুর্বরেণ্যম ধীমহি প্রচোদয়াৎ' ভর্গোদেবের প্রতি তিমিরদুয়ার উন্মোচনের আকুতিতেও আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারের কোনো প্রবণতাই দেখা যায় নি কবির মধ্যে। তাঁর কবিতায় পুরা-প্রসঙ্গ, পৌরাণিক চরিত্র, উপনিষদিক চরণাংশ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থবহ চিত্রকল্প এবং প্রতীকব্যঞ্জনারই বাহন, আধ্যাত্মিকতা কিংবা ধর্মীয় মতবাদের দ্যোতক নয়।

'স্টিল পয়েন্ট'-এর ধারণা এলিঅটের অন্তিম কাব্যে এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে এসেছে। আধ্যাত্মিকতার পথেই তিনি এই দার্শনিক তত্ত্বে উপনীত

হয়েছেন। 'ফো র কো য়া র্টে ট স্'-এর কবিতাগুলির যে আধ্যাত্মিক, দার্শনিক তথা তাত্ত্বিক মর্যাদা, তার পশ্চাতে এই তত্ত্বের ভূমিকা অনেকখানি। অথচ এলিঅটের আধ্যাত্মিকতার মতোই 'স্টিল পয়েন্টা' তত্ত্বও বিষ্ণু দে-র কাব্যানুশীলনে কোনো ছাপই ফেলতে পারেনি। একথা অবশ্য সামগ্রিকভাবে এলিঅটের উত্তরকাব্যগুলি সম্পর্কেই প্রযোজ্য, উত্তর পর্বের এলিঅট থেকে বিষ্ণু দে-র ব্যবধান দুর্নিরীক্ষ্য নয়। সে-কারণেই নাট্যকার এলিঅট বিষ্ণু দে-কে আকৃষ্ট করতে পারেন নি। কাব্যরচনা সম্পর্কিত এলিঅটীয় মাত্রাবোধও বিষ্ণু দে-র দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। একই আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু দীর্ঘকাল ধ'রে এলিঅটের প্রশ্রয় পেয়েছে এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। কাব্য থেকে কাব্যান্তরে তাঁর আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। একই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর কবিতা-সংখ্যার বাহুল্য তাঁর কাব্যের আয়তনকে স্ফীত এবং ভারাক্রান্ত করে নি; আবার, সমগ্র কবিজীবনকেও কবিতা রচনায় ভারাক্রান্ত ক'রে তোলেন নি। পঞ্চাশোর্ধ্বে তিনি কবিতা রচনা থেকে বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেছেন। এলিঅটের এই মাত্রাবোধ ও পরিমাণবোধ বিষ্ণু দে কেন, সম্ভবতঃ আর কোন কবিকেই স্পর্শ করে নি।

অন্য দিকও আছে। সমসাময়িক কালেই ইয়োরোপের চিন্তাজগতে ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা এবং মার্ক্সীয় দর্শনের সাড়াজাগানো অভ্যুত্থান ঘটে অথচ এলিঅটীয় কাব্যে তার প্রতিফলন পড়ে নি। রাজনৈতিক মতবাদে রাজতন্ত্রে আস্থাশীল('royalist in politics)[৬৯] এলিঅট বৃটিশসুলভ স্পর্শকাতরতায় অ-রক্ষণশীল মার্কস্‌বাদ পরিহার করেছেন এমন অনুমান অসঙ্গত মনে না হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু ফ্রয়েড সম্পর্কে তাঁর অস্বাভাবিক অনীহার কারণ অজ্ঞাত। বিষ্ণু দে মার্কস্ এবং ফ্রয়েড উভয় দার্শনিকের সম্পর্কে কেবল ঔৎসুক্যই প্রকাশ করেন নি, তাঁদের মতবাদের কাব্যরূপায়ণও ঘটিয়েছেন—এলিঅট কর্তৃক প্রভাবিত হয়েও বিষ্ণু দে তাঁর উত্তমর্ণকে অতিক্রম ক'রে গেছেন, এই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১। 'Homage to T. S. Eliot,' In the Sum and the Rain, pp.171-72

২। Mr. Eliot Among the Arjuns,' T. S. Eliot, p. 98

৩। রচনাকাল ১৯৩৬

৪। কোথাও থাকলে তা একান্তই আপতিক

৫। তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা স্মর্তব্য

৬। উর্বশী ও আর্টেমিস, পৃ. ৪৩-৪৪

৭। 'গার্হস্থ্যাশ্রম', চোরাবালি, পৃ. ৩৩

৮। Selected Poems, p. 60

৯। The Faber Book of Modern Verse, p. 7

১০। Ibid, p 8

১১। Ibid, p. 9

১২। বিশদ আলোচনার জন্য জে. এম কোহেন-এর 'পোয়েট্রি অব দিস্ এজ' পৃ. ১৩৩ দ্র.

১৩। ঐ, পৃ. ১৩৪

১৪। 'T. S. Eliot and Bengali Poetry,' T. S. Eliot, p. 228

১৫। 'Homage to T. S. Eliot' In the Sun and the Rain, pp. 173-74

১৬। Tradition and the Individual Talent,' The Sacred Wood, p. 49

১৭। 'The first phase of Eliot's poetry is concerned with living in hell, the grimy, squalid banal hell of modern urban life'—Crisis in English Poetry, p. 147

১৮। 'The speaker in this poem ('Gerontion') ···is an impersonal symbol, European civilisation imaged as an old man full of memories,···who no longer even owns the 'decayed house' where he lives,···' Ibid, p. 148

১৯। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য 'ভারতকোষ-২', পৃ. ২১১ দ্র.

২০। ঐ, পৃ. ২১০

২১। T. S. Eliot, p. 225

২২। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক,' ন তু ন সা হি ত্য র. শ, সং, পৃ ৮

২৩। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে

২৪। '…এই কবিরা সম্পূর্ণরূপে জানেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কত ঋণী এঁরা, আর সে-কথা পাঠককে জানতে দিতেও সংকোচ করেন না, কখনো-কখনো আস্ত-আস্ত লাইন তুলে দেন আপন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে।'—'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', ন তু ন সা হি ত্য র. শ. সং, পৃ. ৯

'আধুনিক কালে দু-একজন বিশিষ্ট কবির প্রধান কবিতাগুলিও বার-বার রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়িয়ে দেয়। আরো দু-একজন ভালো কবি তাঁরই জিনিষ নিয়ে সাধক হয়েছেন বলে মনে হয়;' —ক বি তা র ক থা, পৃ. ১১৩

২৫। প্রথম প্রকাশ ১৩৪০। 'বা ঙ্গা লা সা হি ত্যে র ই তি হা স'-৪ গ্রন্থে উল্লিখিত ১৯৩২

২৬। দৈ নি ক ক বি তা শরৎ ১৯৬৯ (পৃষ্ঠা নেই)

২৭। 'রবীন্দ্র বিরোধী হতে গিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজন ছিল, হয়তো এ কারণে বিষ্ণু দে-র প্রথম দিকের কবিতায় হৃদয়ের চেয়ে বুদ্ধির অংশটা ছিল বেশি,…'—'প্রবক্তা নয়, প্রতিভাই বিষ্ণু দে', ঐ

২৮। কয়েকটি প্রশস্তিমূলক কবিতা কিন্তু রচনা করেছেন

২৯। Selected Poems, pp. 64-65

৩০। Ibid, p. 67

৩১। 'Artemis is also a protectress of youth, especially those of her own sex……and as the promote of healthy development, especially in the female frame, (and with it) is connected the notion of her assisting in childbirth'.—A Dictionary of Classical Antiquities.

'…by this Asiatic strain, Artemis…became the birth goddess,…She protected pregnant and young animals.. The tree cult is one form of the worship

of Artemis as goddess of wild vegetation'—Encyclopaedia Britannica, vol-2 pp. 507-8 'She is the goddess of chastity, the protectress of youths and maidens, and defies the power of love··· To her influence the increase of the fruit of the fields is due. She is the goddess of agriculture.'—Everyman's Encyclopaedia.

৩২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-৪, পৃ. ৩৭২

৩৩। কুলায় ও কালপুরুষ, পৃ. ১০৪

৩৪। 'Eliot's poem took its place among a whole galaxy of major works that embodied the new sensibility of Europe. But from the beginning that place was seen as a central one.'—The Twentieth Century Mind, p. 310

৩৫। 'He is in search of a tradition ; but he knows that it is also a tradition, among poets, to be original', —Ibid.

৩৬। অবশ্য নামটি সংগৃহীত 'ফ্রম রিচুয়াল টু রোমান্স' থেকে

৩৭। কুলায় ও কালপুরুষ, পৃ. ১০৫-৬

৩৮। কোমল গান্ধারে বিষ্ণু দে, পৃ. ৫৪

৩৯। ঐ

৪০। অনুরূপ রোমান্টিকতা প্রশ্রয় পেয়েছে এলিঅটেও 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর শৈশবস্মৃতির মধ্যে

৪১। 'টপ্পা-ঠুংরি', চোরাবালি, পৃ. ৭৯-৮০

৪২। 'গার্হস্থ্যাশ্রম,' ঐ, পৃ. ২৫

৪৩। Ever since the appearance of his third book of verse 'Purbalekh' (1941), Bishnu Dey's poetry started undergoing a new orientation in that it became more socialistic in its gesture as well as contents'—Selected Poems (Bishnu Dey) p. xiv.

৪৪। '১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই'—ভা র ত কো ষ-৫, পৃ. ৩২৩

৪৫। ফ্রয়েডের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রকাশকাল ঃ
Studien uber Hysteric (1895) ; Die Traumdeutung (1900), Uber den Traum (1901) ; Psychopathologie des Alltagslebens (1904) ; Drei Abhandlungen Zur Sexualtheorie (1905)
কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশকাল ঃ
Interpretation of Dreams (1913); Psychopathology of Everyday Life (1914) ; Totem and Taboo (1919) ; Introductory Lectures (1922)

৪৬। Crisis in English Peetry, 1880 p. 152

৪৭। 'সন্ধ্যা', ব ছ র প* চিশ, পৃ. ৪৬৯

৪৮। গায়ত্রী মন্ত্রের শব্দগুলির যথেচ্ছ প্রয়োগ ক'রে অন্যপূর্বা চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন

৪৯। আ ধু নি ক বাং লা কা ব্য প রি চ য়, পৃ. ৩১০

৫০। আ ধু নি ক বাং লা ক বি তা র রূ প রে খা, পৃ. ৩৬২

৫১। পো ড়ো জ মি-র (অনিল বিশ্বাস) ভূমিকা দ্র.

৫২। আ. বাং কা ব্য প রি চ য়, পৃ. ৩২২

৫৩। বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে (transtiteration) বিষ্ণু দে-কেই অনুসরণ করেছি।

৫৪। 'ঘরোয়া কথা' (কবিতা সিংহ), দৈ নি ক ক বি তা শরৎ ১৯৬৯

৫৫। কো ম লে গা ন্ধা রে বি ষ্ণু দে, পৃ. ৪-৫

৫৬। আ. বাং কা ব্য প রি চ য়, পৃ. ৩২২

৫৭। কো ম লে গা ন্ধা রে বি ষ্ণু দে, পৃ. ৪

৫৮। 'সাত ভাই চম্পা' নামের দুটি কবিতারই বক্তব্যে মার্কসবাদের ছায়াপাত

৫৯। Selected Poems (Bishnu De), P. xvi

৬০। 'বিষ্ণু দে-র কবিতায়('অ ন্বি ষ্ট')এই দার্শনিক পদ্ধতি-ই তাঁর যাবতীয় চিত্রকল্প নিয়ে আসে,...'না ম রে খে ছি কো ম ল গা ন্ধা র'-এর এক আনন্দিত যুগ অতিক্রান্ত হয় এই একই দার্শনিক আস্তিক্যে, আর 'স্মৃ তি স ত্তা ভ বি ষ্য ত'-এ

'অম্বিষ্ট'-এরই পুনধ্বনিত কণ্ঠ।' 'অন্বিষ্টের আলোকে' (কালীকৃষ্ণ গুহ), দৈনিক কবিতা শরৎ ১৯৬৯

৬১। কোমলে গান্ধারে বিষ্ণু দে, পৃ. ১০

৬২। নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, পৃ. ৬৮

৬৩। Mr. Eliot Among the Arjunas, T. S. Eliot, p,

৬৪। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, পৃ. ৩-৪

৬৫। 'আমৃত্যু চৈতন্যে', ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে, পৃ. ৯৩

৬৬। 'তবু জলে ফলে ভালো', ঐ, পৃ. ৮৪

৬৭। এলিঅটীয় প্রবণতাকে নিছক 'চতুরালি' ব'লে রোমাণ্টিকতার অপবাদে বিষ্ণু দে-র ভূমিকাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন কেউ (কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল, পৃ. ১২৪-২৫); আবার কেউ বা 'নকল-নবিশি' ব'লে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেন নি (আ. বাং. কবিতার রূপরেখা, পৃ. ৩৩৮)৷

৬৮। 'The Metaphysical Poets', Selected Essays, p. 289

৬৯। 'For Lancelot Andrewes,' Essays on Stile and Order, p. ix.

·পাঁচ

এলিঅট ও

বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ

১.

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসু কবি বিষ্ণু দে-র পূর্বসূরী। সে-ক্রম অক্ষুণ্ণ রাখতে বুদ্ধদেব বসু বিষয়ক আলোচনা বিষ্ণু দে-র কাব্যালোচনার পূর্বে সন্নিবিষ্ট হওয়াই বিধেয়। কিন্তু ইতিহাসের খাতিরে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আরো অনেকেরই পূর্বিতা (priority) স্মরণে রেখেও পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বিষ্ণু দে বিষয়ক আলোচনা সন্নিবিষ্ট করেছি এলিঅটের প্রভাবের ব্যাপকতা নির্দেশ করতেই। বিষ্ণু দে-র পূর্বসূরী কবি সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের কাব্যচেতনার বিশেষ-বিশেষ দিকে এলিঅটীয় কাব্যচেতনার সজ্ঞান ছায়াপাত ঘটেছে কিনা, সে-অনুসন্ধান এই পরিচ্ছেদের আলোচনার অঙ্গীভূত। অন্যদিকে এই পরিচ্ছেদেই অনুসন্ধানের নোঙর নামিয়ে দিয়েছি বিষ্ণু দে-র অনুসূরী কবিকুলেও একেবারে সমর সেন, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত পর্যন্ত। সামগ্রিক বিচারে পূর্বসূরী কিংবা অনুসূরী এই সমস্ত কবিদের মধ্যে কেউই বিষ্ণু দে-র মতো এলিঅটের কাব্য এবং কাব্যভাবনার সঙ্গে নিজেদের কাব্যকে অমন ওতপ্রোতভাবে জড়ান নি। সেই নিরিখেই বিষ্ণু দে-র কাব্যালোচনার অন্তে জাতি-গোত্র কিংবা পূর্বিতা অনুগামিতা বিচারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না ক'রে একই পরিচ্ছেদে বিষ্ণু দে ভিন্ন অন্যান্য কবিগোষ্ঠী যাঁদের মধ্যে এলিঅটের প্রভাব তত ব্যাপক নয় (অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ) তাঁদের এই অভিন্ন পংক্তিবিধান। দুঃসাহসিকতাও আছে। রবীন্দ্রকাব্যে এলিঅটীয় রীতি তথা ধর্ম অনুসন্ধানের এবং পর্যালোচনার বিতর্কিত পথেও অবতীর্ণ হয়েছি।

২.

কাব্য-স্বভাবের (ঐতিহ্যের অঙ্গীকারেও)[১] সুস্পষ্ট বৈপরীত্যটাই এলিঅট এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পর্ক নির্ণয়ের প্রধান বাধা। উভয় কবিই স্ব-স্ব

কাব্যস্বভাব সম্পর্কে সচেতন—এলিঅটের অকপট আত্মস্বীকৃতি তিনি সাহিত্যরীতিতে ক্লাসিকপন্থী ('classicist in literature'); রবীন্দ্রনাথের সগর্ব ঘোষণা, 'আমি জন্ম রোমান্টিক'। কাব্য-বিচারেও উভয় কবির পার্থক্য সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রকাব্যে বিক্ষিপ্তভাবে উচ্চারিত সতর্কতাবাণী, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে', স্মরণে রেখেও নির্বিবাদে এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে রোমান্টিক ব'লেই রবীন্দ্রকাব্যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনের ছায়াপাত যথেচ্ছই ঘটেছে এবং ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করলে রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা অনিবার্যতঃই অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। এলিঅটের বেলায় এমন কাব্য-বিচার অসঙ্গত। তাঁর কাব্যব্যাখ্যায় ব্যক্তিজীবন ব্যাখ্যা অবান্তর। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণই (objective approach) তাঁর কাব্যজগতে অনুপ্রবেশের একমাত্র চাবিকাঠি। কাব্য-বিচারে এলিঅটের ইস্তাহারের ফতোয়া স্মরণীয়ঃ

> ...with the repeated assertion that when we are considering poetry we must consider it primarily as poetry and not another thing.

কিংবা,

> And certainly poetry is something over and above, and something quite different from, a collection of psychological data about the minds of poets, or about the history of an epoch; for we could not take it even as that unless we had already assigned to it a value merely as poetry.

অথবা,

> We can only say that a poem, in some sense, has its own life; that its parts form something quite different from a body of neatly ordered biographical data; that the feeling, or emotion, or vision, resulting from the poem is something different from the feeling or emotion or vision in the mind of the poet.

যদিচ কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত মৌল সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোনো বিবাদ ছিল না এলিঅটের। 'Poetry is a superior amusement' কিংবা কাব্য অবশ্যই আনন্দ দেবে, এরকম কাব্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের সত্য-শিব-সুন্দর-ভিত্তিক কাব্যতত্ত্বেরই অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়। কাব্য-আঙ্গিক

সম্পর্কিত এলিঅটের মন্তব্য, 'poetry as excellent words in excellent arrangement and excellent metre'.-এর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের কোনো মতদ্বৈধতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনকি, কাব্যকলার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হওয়ার পশ্চাতে পরিবেশের অলক্ষিত প্রভাব সম্পর্কে উভয় কবিই অভিন্ন মত পোষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন, 'কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমঝদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে;'[২] এলিঅট সেখানে অধিকতর সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'Any radical change in poetical form is likely to be the symptom of some very much deeper change in society and the individual.'[৩]

এতদ্‌সত্ত্বেও এলিঅটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব তথা কাব্যরীতির দুস্তর ব্যবধান উপেক্ষার নয় এবং এই ব্যবধান কবিস্বভাব ও মতাদর্শের ভিন্নত্ব-জনিতই নয়, উভয় কবির প্রজন্মগত ব্যবধানজনিতও অবশ্যই। রোমান্টিক কবির সঙ্গে ক্লাসিকপন্থী কবির কাব্যদৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা অভিন্ন হবে এমন কল্পনাও বাতুলতা; কিন্তু এই দুই যুগন্ধর কবির কাব্যিক ব্যবধান গভীরতর ক'রে তোলার পশ্চাতে যে মূল কারণ তা হল এই যে এঁরা যথার্থ সমসাময়িক নন, দুই বিশিষ্ট যুগ এবং যুগধারার কবিপ্রতিভূ। একই দেশ এবং অভিন্ন ভাষার কবি হলেও এ-ব্যবধান এড়ানো সম্ভব নয়। সে কারণেই সুস্পষ্ট চোখে-পড়া ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও এলিঅটে, রবীন্দ্রনাথ ও কল্লোলযুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে; পক্ষান্তরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথে, বিষ্ণু দে ও এলিঅটে এই ব্যবধান অনুপস্থিত।

গদ্যকবিতা (prose poetry) বা মুক্তবন্ধ কবিতা (vers libre or free verse) রচনা-প্রয়াসে উভয় কবির আপাত নৈকট্য অনুভূত হয়; কিন্তু এতদ্বিষয়ে উভয় কবির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং এ-পার্থক্যও প্রজন্মগত ব্যবধানজনিতই। এখানে এই গদ্যকবিতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকেই উভয় কবির প্রজন্মগত ব্যবধান উপলব্ধির প্রয়াসে প্রবৃত্ত হতে পারি তাঁদের কাব্যিক নৈকট্য ও ব্যবধান বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হওয়ার মানসেই।

গদ্যকাব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি 'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন

ভাণ্ডার' অতিরিক্ত 'ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে···সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন-প্রথা··· দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার (কাব্যের) সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে' এবং 'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।' এতদুদ্দেশ্যেই কোথাও-কোথাও 'গদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ' করার বিশেষ প্রয়াস।[৪] 'কেবলমাত্র কাব্যের অধিকার' বৃদ্ধির মানসেই রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া' কেন না, তাতে 'তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে।[৫] সর্বোপরি, 'গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক' ঘুচিয়ে ঘটে 'গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদান প্রদান।'[৬]

এলিঅটীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে গদ্যকবিতা সোজাসুজিই প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্রোহের নামান্তর, সেই সঙ্গে নতুন রীতির প্রস্তুতি কিংবা প্রাচীনের নবীকরণ প্রয়াস। তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা,

> ···only a bad poet could welcome free verse as a liberation from form It was a revolt against dead form, and a preparation for new form or for the renewal of the old; it was an insistence upon the inner unity which is unique to every poem, against the outer unity which is typical.[৭]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি অকপটে বলতে পারেন, 'Every revolution in poetry is apt to be, and sometimes to announce itself as, a return to common speech—'[৮] এবং সেই সুবাদেই সমসাময়িক তথা অব্যবহিত পূর্ববর্তী কুড়ি বছরের (ইংরেজি সাহিত্যের) সৃষ্টি সম্পর্কে এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছোতেও বাধে না যে 'if the work of the last twenty years is worthy of being classified at all, it is as belonging to a period of search for a proper modern colloquial idiom'. বলা বাহুল্য, কবিতায় কথ্যরীতি প্রবর্তনের অনতিলক্ষ্য প্রয়াস রবীন্দ্রনাথেরও ছিল; কিন্তু তিনি অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী প্রজন্মের এবং যুগের প্রতিভু ব'লেই তাঁর কথ্যরীতিও পিছিয়ে পড়েছে, আধুনিক কথ্যরীতির মর্যাদা পায় নি। আরো উল্লেখ্য, এলিঅটের ভাবদীক্ষিত কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের বিদ্রোহের অন্যতম মূল লক্ষ্যই ছিল রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-মুক্ত

কবিতায় আধুনিক কথ্যরীতির প্রবর্তনা। তিরিশের দশকের বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে প্রমুখ কল্লোল গোষ্ঠীভুক্ত কবিরা একই প্রয়াসের সমান্তর শরিক, কিন্তু অলঙ্ঘ্য দুস্তর ব্যবধান।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে এলিঅটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ যোগাযোগ ব্যাপক হলেও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অবশ্যই 'জার্নি অব দি মেজাই'-এর ক্ষীণ সূত্রে আবদ্ধ। 'সা হি ত্যে র প থে' গ্রন্থের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধের আলোচনায় দৃষ্টান্ত রূপে এলিঅটের 'প্রিল্যুড্' কবিতার আংশিক এবং 'আন্ট হেলেন' কবিতার গদ্য সারানুবাদ স্থান পেলেও এই দুটি কবিতার সঙ্গে বিশ্বকবির কোনো কাব্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণের একান্তই অভাব। 'জার্নি অব দি মেজাই'-এর সঙ্গে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক যোগাযোগ অনুপেক্ষণীয়।

'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে এলিঅট, পাউন্ড প্রমুখ আধুনিকতাবাদী পাশ্চাত্য কবিদের আলোচনা এবং তাঁদের কবিতার বিক্ষিপ্ত অনুবাদ করলেও ঐ সমস্ত কবিদের সম্পর্কে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নি, বিতৃষ্ণাই প্রকাশ পেয়েছে এই সমস্ত কবি এবং তাঁদের কবিতা সম্পর্কে। মানসিক জগতের ব্যবধানবশতঃ তিনি অন্যান্য আধুনিকতাবাদী কবিদের মতোই এলিঅটের কবিতাতেও দেখেছেন 'ঔদ্ধত্য, স্পর্ধা, অঘোরপন্থী বীভৎস বা কুৎসিতের প্রতি আকর্ষণ।'[৯] সম্ভবতঃ আধুনিক ইংরেজি কাব্যের (এলিঅট প্রভৃতির) বিদ্রোহ পরায়ণতাই বিশ্বকবির বিমুখতা ও বৈমনস্যের কারণ। বিদ্রোহ সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন তিনি।[১০] আধুনিক ইংরেজী কবিদের বিদ্রোহ যে-পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথও তো সেই ঐতিহ্যেরই ধারক, তাই স্বাভাবিক কারণেই এ-বিদ্রোহ তাঁর পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়। অধিকন্তু আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য তাঁর কাছে দূরবর্তী বলেই এই সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি: 'আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে; বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি; তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহবান।'[১১] অনুরূপ বিরূপ মনোভাব থেকে কাব্যিক যোগাযোগ অবশ্যই অনপেক্ষিত; কিন্তু বিষ্ণু দে-র সাক্ষ্য যদি সত্য হয়, তাহলে মেনে নিতে হয়

যে এলিঅট সম্পর্কে বিরূপতা অনতিবিলম্বেই দূরীভূত হয়েছিল [১২] এবং পরিণামে এলিঅটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক যোগাযোগও সংঘটিত হয়েছিল। 'জার্নি অব দি মেজাই' অনুবাদের মধ্য দিয়েই এই কাব্যিক যোগাযোগের সূত্রপাত।

'জার্নি অব দি মেজাই'-এর অনুবাদ এক আকস্মিক ঘটনা। এরকম ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ এবং এলিঅটের কাব্যযোগাযোগের হেতু ব'লে চিহ্নিত করাও অযৌক্তিক। আসলে কোনো বিশেষ কবিতা কিংবা কোনো বিশেষ অনুবাদ নয়, গোধূলি-পর্যায়ের কাব্য-আঙ্গিক এবং কাব্যরীতির পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ এলিঅটের কাব্যসান্নিধ্যে এসেছেন। গদ্য-কবিতার মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে (এলিঅটীয় ভাষায়) রুদ্ধগতি স্বীয় প্রাচীন কাব্যরীতি এবং আঙ্গিকের বিরুদ্ধেই যেন বিদ্রোহ করেছেন তিনি ('revolt against old form'), সেই সঙ্গে কবিতায় এ তাঁর আধুনিক কথ্যরীতি সঞ্চারেরও সচেতন প্রয়াস ('search for a proper modern colloquial idiom')। গদ্যরীতি অনুসরণের পর থেকেই রবীন্দ্রকবিতায় বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার তথা রোমাণ্টিক জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবের জগতে অবতরণের সনিষ্ঠ প্রবণতা অনুভূত হয়েছে।

'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি ('জার্নি অব দি মেজাই'-এর রবীন্দ্রনাথ কৃত বঙ্গানুবাদ) রবীন্দ্রনাথের এলিঅট অনুরক্তির সাক্ষ্য বহন করছে, এরকম সন্দেহাতীত প্রমাণের একান্তই অভাব। এমনকি, 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্য দুটি কবিতার ('মানবপুত্র' এবং 'শিশুতীর্থ') সঙ্গে 'তীর্থযাত্রীর' ভাব তথা প্রসঙ্গ-সাদৃশ্যের অন্তর্নিহিত কারণ-নির্দেশও গবেষণা সাপেক্ষ। বিষ্ণু দে তথ্য প্রমাণাদি সহযোগে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর যে 'শিশুতীর্থ'-এর আদি রূপ 'The Child' রচনার পূর্বে বাংলা দেশে 'Ariel Poems' আসে নি। বিরুদ্ধ প্রমাণাভাব হেতু এ-সত্য স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই; কিন্তু এই ভাব তথা প্রসঙ্গ-সাদৃশ্যের উৎস অনুদ্ঘাটিত থাকাটা নিশ্চয়ই গবেষক মনের অস্বস্তির কারণ হয়ে থাকবে। আধ্যাত্মিকতার প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথকে 'Ariel Poems'-এর প্রতি, বিশেষতঃ 'জার্নি অব দি মেজাই'-এর প্রতি, কৌতূহলী

করে তুলতে পারে। তদুপরি, খৃস্টের জীবন এবং আদর্শের প্রতিও তাঁর সশ্রদ্ধ দুর্বলতা ছিল। খৃস্টের জীবন ও আদর্শকে বিশিষ্ট সম্প্রদায় ও ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে এক উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রজ্ঞা দিয়ে উপলব্ধি করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় খৃস্ট ও খৃস্টধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে। খৃস্টকে তিনি দেখেছেন সর্বমানবের সত্য পরিচয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং খৃস্টধর্মকে সমগ্র 'মানবের জিনিস' রূপে। 'মানবপুত্র' কবিতাটির সঙ্গে খৃস্টবিষয়ক 'বড়োদিন' প্রবন্ধটির বক্তব্যের প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য আছে। উভয় রচনায়ই এই বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে, মানুষ খৃস্টের শিক্ষা গ্রহণ করে নি। তাঁর বাণী বিস্মৃত হয়ে জিঘাংসায় লিপ্ত হয়েছে। 'আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতি মুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।' 'বড়োদিন', 'মানবপুত্র' এবং 'তীর্থ-যাত্রী'-র রচনাকালের ব্যবধান খুব বেশি নয়, তিনটি রচনাই বৎসর খানেকের মধ্যে রচিত। এর অত্যল্পকাল পূর্বে রচিত 'শিশুতীর্থ', অবশ্য 'শিশুতীর্থের' মূল রূপ 'দি চাইল্ড'-এর রচনাকাল আরো বৎসরাধিক পূর্ববর্তী।

রচনাকালের ব্যবধান যাই হোক, 'শিশুতীর্থ', 'মানবপুত্র এবং 'তীর্থযাত্রী' এই তিনটি কবিতার মধ্যে ভাব ও বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টির গোচরীভূত হতে বাধ্য। কালানুক্রমের বিচারে 'তীর্থযাত্রী' সর্বশেষে রচিত, তাই এই কবিতার দ্বারা পূর্ববর্তী কালে রচিত কবিতার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা অযৌক্তিক। অন্যদিকে ঐ কবিতা এলিঅটের অনুবাদ ব'লেই পরবর্তী কালে রচিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী 'শিশুতীর্থ' কিংবা 'মানবপুত্র' দ্বারাও 'তীর্থযাত্রী'-র প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। স্বীয় মানসিকতার ছায়া দেখতে পেয়েই রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন[১৩] এরকম সিদ্ধান্তও অমূলক মনে হয় বিষ্ণু দে বর্ণিত ঐ কবিতার আকস্মিক অনুবাদ-কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত বিরুদ্ধ প্রমাণ কবিতা তিনটির সাদৃশ্য-রহস্য যেন আরো ঘনীভূত করেছে।

'মানবপুত্রের' আলম্বন খৃস্ট, কবিতাটিতে সেকথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। 'শিশুতীর্থ' এবং 'তীর্থযাত্রী' কবিতারও আলম্বন খৃস্ট; কিন্তু প্রতীক কবিতা ব'লেই কবিতা দুটিতে কোথাও তার উল্লেখ নেই। উভয়

কবিতাতেই যে রূপক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ দীর্ঘ দ্বন্দ্বসঙ্কুল দুর্গম কন্টকর পথপরিক্রমা (? তীর্থযাত্রা) শেষে মানুষেরা উপনীত হয়েছে এমন এক 'সার্থকতার তীর্থে' যেখানে দেবশিশু (? খৃস্ট) হয়েছেন ভূমিষ্ঠ, যিনি নিয়ে এসেছেন জীবনের চরিতার্থতার বাণী, তাঁকে দেখে অতীতের সমস্ত অচরিতার্থতা হয়েছে চরিতার্থ, অসার্থকতা হয়েছে সার্থক। 'তীর্থযাত্রী'-র সংক্ষিপ্ত কাহিনী 'শিশুতীর্থে' আরো ব্যাপক পটভূমি পেয়েছে, কিঞ্চিৎ সংযোজন এবং রূপান্তরও ঘটেছে। এখানে কবির আর একটি রচনার প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। 'শিশুতীর্থ' কবিতার সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধও রচনা করেন 'তীর্থযাত্রী' নামে। রচনাটি প্রকাশিত হয় 'শিশুতীর্থ' প্রকাশিত হওয়ার পরের মাসে (আশ্বিন ১৩৩৮) ঐ একই সাময়িক পত্রে। রচনা দুটি শুধু সমসাময়িক কালেই রচিত নয়, এদের বক্তব্যেও গভীর সাদৃশ্য আছে। 'তীর্থযাত্রী' প্রবন্ধটি 'যে 'শিশুতীর্থ' কবিতার বিষয়বস্তুর কবিকৃত ব্যাখ্যা তাহাতে সন্দেহ নাই।'[১৪] কবিকৃত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : 'আদিকাল থেকে মানব সংসারে যাত্রীরা চলেছে সার্থকতার তীর্থ খুঁজে। নানা দেশে নানা কালে। সে তীর্থ কুবেরের ভাণ্ডারে নয়, ইন্দ্রলোকে নয়, বৈকুণ্ঠে নয়, সে তীর্থ সেই-খানে, পুরাতন মানব যেখানে নূতন হয়ে জন্মলাভ করেছেন—যিনি ঘোর দুর্দিনে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে মানুষকে এই আশ্বাস জানিয়েছেন : সম্ভবামি যুগে যুগে। ক্লান্ত আসছে, পীড়িত আসছে, ক্ষুধাতুর আসছে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে নগ্ন শিশুর কাছে; প্রশ্ন করলে, "তুমি এসেছ ?" মাতা বললেন, "তুমি আমার ধন।" সকলে বললে, "জয় হোক নবজাতকের"। কবির এই বক্তব্যে ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রবণতা সুপ্রকট। 'বি চি ত্রা'-য় প্রকাশকালে 'শিশুতীর্থ'-এর শিরোনামও ছিল : 'সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ। অথর্ব বেদ।—ইনি সনাতন। ইনিই অদ্য পুনর্নব।' সম্ভবতঃ পাঠকের দৃষ্টি ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্য অভিমুখীকরণের জন্য কবি অনুরূপ নামকরণ করে-ছিলেন। কিন্তু 'শিশুতীর্থ' সম্পর্কিত Passion Play তথ্যটি বিস্মৃত হলে চলবে না। ম্যুনিখ শহরের উপকণ্ঠে ওবেরয়াম্মারগাউ গ্রামের ঐতিহ্য-মণ্ডিত খৃস্টের শেষ জীবন অবলম্বনে পরিকল্পিত Passion Play নাট্যাভি-নয় থেকেই কবি এই কবিতার প্রেরণা আহরণ করেছিলেন। উক্ত নাট্যাভিনয়ের

আলম্বন খৃস্টের শেষ জীবন হলেও কবিতাটির আলম্বন কিন্তু খৃস্টের তিরোধান নয়, আবির্ভাব। উপসংহারে 'তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটির'-এর মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় দৃশ্যপটের অবতারণা করা হলেও এবং প্রথম প্রকাশ কালে ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি ইঙ্গিত থাকলেও কবিতাটির শেষ ছবি কিন্তু জন্মাষ্টমীর নয়, বরং ইহুদি-খৃস্টান কল্পনার শিশুক্রোড়ে মাতার অনুরূপ।[১৫] দুর্গম পথ-পরিক্রমা থেকে নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, পরিণামে হত্যা, তারপর পাপবোধ থেকে অন্তরে অলক্ষ্য নির্দেশ এবং সর্বশেষে আলোর সন্ধান—এই মানসিক বিবর্তনের পশ্চাতেও খৃস্টধর্মসুলভ ভাবনার ছায়াপাত থাকা অস্বাভাবিক নয়। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দ্বারা কবি পরিচালিত হয়েও থাকতে পারেন।[১৬]

'তীর্থযাত্রী' এবং 'শিশুতীর্থ' উভয় কবিতারই প্রারম্ভ একই আঙ্গিকে, ঘটনাংশেরও সাদৃশ্য অনুভূত হয়, অনেকাংশে বক্তব্যেরও। 'তীর্থযাত্রী'-র গোড়ায় আছে,

> কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা,
> ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
> রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট—
> একেবারে দুর্জয় শীত।...
> মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না।
> নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা; নগরীতে সন্দেহ;
> গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
> কঠিন মুশকিল।
> শেষে ঠাওরালেম, চলব সারারাত;
> মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে
> আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে
> —এ সমস্তই পাগলামি।

এই চরণগুলির একটা ক্ষীণ অনুরণন অনুভূত হবে 'শিশুতীর্থ'-এর পঞ্চম অনুচ্ছেদে।

> দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
> ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,

তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষত চরণ, কারও মনে ক্রোধ, কারও মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি ?
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না—
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে ;
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,
ভয়, পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।[১৭]

উভয় কবিতারই উপসংহারে খৃস্টের আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে। 'তীর্থযাত্রী'-তে এই আবির্ভাবের কথা সোজাসুজি বলা হয় নি, বলা হয়েছে আভাসে উপলব্ধি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। 'শিশুতীর্থে' যে-নবজাতকের যে-চিরজীবিতের আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে তিনিই খৃস্ট এমন স্বীকৃতি অবশ্যই নেই ; তবে 'জয় হোক মানুষের' এই উদ্ঘোষণা স্পষ্টতঃ অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রতি যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য, মানবের জয়ই যাঁর জীবনেতিহাস। খৃষ্ট সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে কবি এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কবিজীবনের একেবারে অন্তিম পর্বে—'রো গ শ য্যা য়' থেকে 'শে ষ লে খা'—কবিসত্তা 'পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে' মিলিত হওয়ার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাবালুতাবর্জিত, অলঙ্কারহীন, নিরাড়ম্বর উপলব্ধির নিরলঙ্কৃত প্রকাশ এক বিশুদ্ধ কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করার প্রয়াসী। কাব্য-

রূপে যেন নিত্য চৈতন্যেরই নগ্নপ্রকাশ। এলিঅটের 'ফো র কো য়া র্টে ট স'-এর মধ্যেও অনুরূপ বিশুদ্ধ কাব্য সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।[১৮] বর্তমান কালকে (এবং মানবাত্মাকে) মহাকালের অনন্ত গতিচক্রের অঙ্গীভূত করে দেখার প্রবণতা রবীন্দ্রকাব্যে বলাকার যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। অন্তিম পর্বে কবির ব্যক্তিসত্তাকে অনন্ত সত্তার অঙ্গীভূত ক'রে, বর্তমান কালকে অতীত থেকে ভবিষ্যতে প্রসারিত ক'রে অনন্ত কালের পটভূমিকায় দেখেছেন—'যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি'। 'কেন', 'ইস্টেশন', 'জয়ধ্বনি' ('ন ব জা ত ক'), 'জ ন্ম দি নে-'র কবিতা-সংখ্যা ১১, ১৩ প্রভৃতি কবিতায় কবির এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি স্থান পেয়েছে।

৩.

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার তথা কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ব'লে জীবনানন্দ দাশকে চিহ্নিত করলে অনেকেরই ভ্রূ সংশয়কুঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁরই যে মুখ্য ভূমিকা সে-বিষয়ে সম্ভবতঃ সকলেই নিঃসংশয়।[১৯] অনন্য কবিস্বভাবের ফলশ্রুতিতে একটি বিশিষ্ট কাব্য-ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রোত্তর যুগের মূল সুর রবীন্দ্র-ঐতিহ্যবিরোধিতা এবং বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি জীবনানন্দের মধ্যে ছিল না। তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতোই জন্ম রোমান্টিক।[২০] কাব্যবিচারে তাঁকেও প্রকৃতির কবি ব'লে অভিহিত না করলে সত্যের অপলাপ হবে। কবিস্বভাবে রোমান্টিক এবং প্রকৃতির কবি হয়েই রবীন্দ্রঐতিহ্য অতিক্রমণের সচেতন প্রয়াস তাঁর। যুগ-চেতনা, প্রতীক-চেতনা, স্বকীয় ভাষাভঙ্গি, ছন্দোবৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যকে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে, আর সেই সঙ্গে দিয়েছে এলিঅটীয় কাব্য-নৈকট্য। যে-অর্থে বিষ্ণু দে 'এলিঅট ভক্ত' কিংবা এলিঅটের অধমর্ণ সে অর্থে নন, কয়েকটি বিশিষ্ট এলিঅটীয় চেতনায় জীবনানন্দও বিষ্ণু দে-র সমধর্মা কবি।

'কল্লোল যুগের' রবীন্দ্রবিরোধিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন জীবনানন্দ, এমনকি তিনি সমসাময়িক অগ্রণী কবিদের ভিতরেও 'অবচেতনলোকে বিদ্রোহের মূর্তি' লক্ষ্য করেছেন; কিন্তু একে তিনি রবীন্দ্রকাব্যলোকের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না ব'লে 'রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে' বিদ্রোহ ব'লে অভিহিত করার পক্ষপাতী। 'কেন না সময় নিজেই কবিসার্বভৌমকে এমন একটি দৈগন্তিক মহত্ত্বের ভিতর সরিয়ে নিয়ে গেছে যে তাঁর সম্পর্কে বিদ্রোহের প্রশ্ন এখন (১৩৫২) অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হয়।'[২১] রবীন্দ্রনাথের মতো সার্বভৌম প্রতিভাকে বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্য দিয়ে নয়, ঐতিহ্যবোধের মধ্য দিয়ে উত্তরসূরীদের কাছে সামান্যায় অঙ্গীকরণের সচেতনতা জীবনানন্দ লাভ করেছিলেন এলিঅটীয় ঐতিহ্যচেতনা থেকেই। 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' জীবনানন্দের কাব্যচেতনার মধ্যে এলিঅটীয় এই কাব্যচেতনারই অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়।[২২] এলিঅটের 'ট্রাডিশন এণ্ড ইনডিভিজুয়াল ট্যালেণ্ট'-এর বহুশ্রুত বক্তব্যেরই অনুরূপ মন্তব্য শুনতে পাই যখন দেখি জীবনানন্দও বলছেন, ইতিহাসচেতনা ও পরিচ্ছন্ন কালচেতনা 'নিয়েই মানবতার ও কবিমানবের ঐতিহ্য। কিন্তু এই ঐতিহ্যকে সাহিত্যে বা কবিতায় রূপায়িত করতে হলে ভাবপ্রতিভার প্রয়োজন।'[২৩]

'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়',[২৪] জীবনানন্দের এই মৌল কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে এলিঅটীয় কাব্যতত্ত্ব 'Poetry is a superior amusement'-এর নিশ্চয়ই কোনো মতদ্বৈধতা নেই। তাই কি এলিঅটের মতোই (অবশ্যই ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের যুগের) নৈরাশ্যবোধ (morbidity) ও নৈঃসঙ্গ্য-চেতনাই জীবনানন্দের কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছে! নাগরিক জীবন তাঁর কাছেও দুঃসহ মনে হয়েছে। কিন্তু মর্মান্তিক নাগরিক জীবন-চেতনায় মৌল পার্থক্য আছে উভয় কবির মধ্যে। জীবনানন্দ মূলতঃ প্রকৃতির কবি, গ্রামবাংলার নগ্ন-সৌন্দর্যে মদির হওয়ার, চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করার দুর্বার বাসনা তাঁর। নগরজীবন এবং নাগরিক সভ্যতা তাঁর প্রকৃতি-সম্ভোগের বাধা ব'লেই এই জীবন এই সভ্যতা তাঁর জীবনে নিঃসঙ্গতা এনে দেয়, তাঁর জীবনের চারপাশে কারাগারের প্রাচীর তুলে দেয়।

রৌদ্র-ঝিলমিল
উষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল,

অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে-বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে।
উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,
উগ্র চুল্লীবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি,
আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
মরীচিকা-ঢাকা।

অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার, পায়নাকো পথের সন্ধান ;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল ;
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছো মায়াবী। ('নীলিমা')

কিংবা, ঐ কবিতারই পরবর্তী অংশে

বসুধার অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়—

বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই তাঁর নাগরিক জীবনের নারকীয়তার উপলব্ধি গভীরতর হয়েছে। আবার মানসিক বিচ্ছিন্নতাবোধ এসেছে তাঁর অনুভূতি-প্রবণ বিশিষ্ট মানস-গঠন থেকে। 'বোধ' কবিতায় এ-সম্পর্কে অসহায় স্বীকারোক্তি কবির,

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে ;
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;
সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়,

সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।

এই 'কোন্ এক বোধ' কিংবা বিশিষ্ট মানসিক গঠনই কবিকে বিচ্ছিন্ন করেছে সমাজ থেকে, সংসার থেকে, এমনকি বাস্তব জগৎ থেকেও। সে-এক গভীর সংকট।

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?
আমার পথেই শুধু বাধা ?

'কবি-মানসের এই বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়বোধ'-ই[২৫] জীবনানন্দকে শূন্যতা ও রিক্ততার জগতে নিয়ে গেছে, তাঁর অন্তরে জাগিয়েছে এলিঅটীয় বন্ধ্যাত্বচেতনা। আর কাব্যে দেখা দিয়েছে নিঃসঙ্গতা রিক্ততা ধ্বংসবতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ। বন্ধ্যাত্বের প্রতীকরূপেই হেমন্ত ঋতু স্থায়ী আসন পেতেছে তাঁর কাব্যে, যে হেমন্ত ফসলের নয়, রিক্ততার।

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—খেতে মাঠে প'ড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।

কিংবা, যে 'হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার পর'; আর 'তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে খেতে'।

প্রকৃতি-সম্ভোগে বাধার প্রতিক্রিয়াজাত চেতনা ছাড়াও নাগর সভ্যতা ও নাগরিকজীবন সম্পর্কিত বিশুদ্ধ এলিঅটীয় নরক-চেতনাও অভিব্যক্ত হয়েছে জীবনানন্দের বিভিন্ন কবিতায়। এ-নরক জুড়ে আছে 'রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়'। এ-সভ্যতায়

অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে দ্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা

পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আধারের খাত বেয়ে,
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে ; ('বিভিন্ন·কোরাস')

রবীন্দ্রকাব্যধারায় যখন 'ব লা কা'-র ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত বেগের আবেগ, শিল্পবিপ্লবোত্তর ইয়োরোপে প্রাচীন মূল্যবোধের ওপর নেমে এসেছে প্রথম মহাযুদ্ধের নির্মম আঘাত, তখনই 'রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায়··· স্বাবলম্বনের বিবর্তন চলেছে' কবি জীবনানন্দের। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ ও ইতিহাসচেতনা এক নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে। আধুনিকের কবিতা সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে যে ধরনের সমাজ ও ঐতিহ্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার পরিচয় রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া গেলেও 'এই জিনিস···প্রধান স্মরণীয় বিষয় নয়।'[২৬] 'দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতি' স্বীয় কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে সময় লেগেছিল জীবনানন্দের, ভাবাবেগ ও রোমাণ্টিসিজমকে সংহত করতে এবং 'অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনাপ্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি' আনতেও সময় লেগেছিল। কবির চৈতন্য বিচ্ছিন্নতার এক বিশিষ্ট বোধে পীড়িত ব'লেই স্বতঃই এক স্বভাবজ মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাব্যের নিত্যসঙ্গী। 'স্বাবলম্বনের বিবর্তন' সমাধা ক'রে বেগের আবেগে ভর করা বলাকার পালক ঝরিয়ে জীবনানন্দ যখন তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে তখন প্রথম তাঁর মনোহরণ করেছিলেন এলিঅট নয়, ডব্লু. বি. ইয়েটস্।[২৭] পরবর্তীকালে তাঁর দৃষ্টি এলিঅট বা ওয়েস্ট ল্যাণ্ডমুখী হলেও ইয়েটস-এর Power of imagination, Precise emotion প্রভৃতি জীবনানন্দের কাব্যচিন্তায় 'কল্পনা-মণীষা', 'ভাবনা প্রতিভা', 'কল্পনা প্রতিভা' 'হৃদয়ের সংহতি', 'ভাবাবেগের সংহতি' রূপে স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছে। কবি জীবনানন্দের দৃষ্টি এলিঅটমুখী করার পশ্চাতে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা অনেকখানি। যুদ্ধবিধ্বস্ত যুগেই সচেতন আধুনিক কবিদের 'empty men'-মানসিকতা এবং দেশ-কাল-সভ্যতা-বিষয়ক ওয়েস্ট ল্যাণ্ড চতনা বা বন্ধ্যাত্ববোধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে রবীন্দ্রপ্রতিভা সৃষ্টিশীল হলেও 'হলো মেন'-মানসিকতা কিংবা ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-জাত বন্ধ্যাত্ববোধ ঔপনিষদিক্ প্রজ্ঞাঋদ্ধ রবীন্দ্রমানসিকতাকে স্পর্শ করতে পারে নি এবং সে-কারণেই 'ব লা কা'-র সমসাময়িক কালে তথা 'ব লা কা'-র ছন্দে (মুক্তক) রচিত হয়েও 'ঝ রা পা ল ক' দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথক। এই পার্থক্য অবশ্যই

বিশ্বযুদ্ধের মানস-বিপর্যয়জনিত। স্পষ্টই অনুভূত হয় যে রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দে ব্যবধান বছরের হিসেবে চার দশকের হলেও প্রকৃত ব্যবধান কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঐতিহ্যের। বিশ্বযুদ্ধের আঘাতের জন্যই কবি সার্বভৌম লালিত বাংলা কাব্যধারার উনিশ শতকীয় ঐতিহ্যের জীর্ণ পালক ঝরিয়ে যুদ্ধোত্তর বিশ শতকীয় ঐতিহ্যের নির্জন স্বাক্ষর রেখে যেতে দুঃসাহসী হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি অন্তরে-অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, উত্তররৈবিক বাংলা কাব্যের 'প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়'।

জীবনানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে আমাদের দেশের 'যে-বিশেষ সময়রূপ' 'তেরোশো পঁচিশ—আটাশ—তিরিশে' সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি হয়েছিল। একদিক থেকে যেমন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল, অন্যদিকে কয়েকটি ইতিহাসোত্থিত কারণে এবং অঙ্গাঙ্গী নতুন সময় পর্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা আশ্চর্য রক্তচ্ছটায় (মৃত্যুর বা অরুণের জীবনেরও) রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল।[২৮] এই বিশেষ সময়রূপের বাংলা কাব্যের আকাশে অপরাহ্নের রবি-দীপ্তির পাশাপাশি তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র—মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম। এরই মাঝে নতুন সময় পর্বের সংকেত নিয়ে জীবনানন্দ নামধেয় নক্ষত্রটি উঠি-উঠি করছে 'ক ল্লো ল'-'কা লি ক ল ম'-'প্র গ তি'-র আঙিনায়। তাই পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান হয়ে ওঠার প্রাক্কালে 'রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায় স্বাবলম্বনের বিবর্তন'-এর অধ্যায়ে জীবনানন্দের ওপর ছায়া ফেলেছেন যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল।[২৯] এই পর্যায়ের যে অল্পসংখ্যক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে 'বেদুঈন', 'আঁধারের যাত্রী' ও 'মোর আঁখিজল' কবিতায় নজরুলের, 'কোহিনূর' কবিতায় মোহিতলালের এবং 'ঝরা ফসলের গান' কবিতায় যতীন্দ্রনাথের অনপনেয় ছায়া অনুভূত হয়। অনুরূপ ছায়া 'ঝ রা পা ল ক' কাব্যগ্রন্থের 'আমি কবি, —সেই কবি', 'নব নবীনের লাগি', 'জীবন-মরণ দুয়ারে আমার', 'বেদিয়া', 'সাগর-বলাকা', 'নিখিল আমার ভাই', 'পতিতা' প্রভৃতি কবিতাতেও অনুভূত হবে।[৩০] 'চলছি উধাও' কবিতায় নজরুলের কবিতার মতো যথেচ্ছ ফার্সী শব্দের ব্যবহার জীবনানন্দের কাব্যধারায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। 'ঝ রা পা ল ক' এবং পূর্ববর্তী কবিতাসমূহে পূর্বসূরীদের ছায়া অনুভূত

হলেও জীবনানন্দের বিশিষ্ট সুরের উন্মেষ কোথাও-কোথাও ঘটেছে, সেইসঙ্গে দু-একটি এলিঅটীয় চেতনাও ধরা পড়েছে। 'নীলিমা' কবিতার নাগরিক-জীবন চেতনার, যা এলিঅটীয় নরকচেতনার উৎস, উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি। 'কিশোরদের প্রতি' কবিতায়ও অনুরূপ চেতনা স্থান পেয়েছে :

নগরীর ক্ষুব্ধ বক্ষে জাগে যেই মৃত্যু প্রেতপুর,
ডাকিনীর রুক্ষ অট্টহাসি
ছন্দ তার মর্মে তব ওঠে না প্রকাশি' !
সভ্যতার বীভৎস ভৈরবী
মলিন করেনি তব মানসের ছবি,
ফেনিল করেনি তব নভোনীল, প্রভাতের আলো,
এ উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের বক্ষে তার রশ্মি আজ ঢালো, বন্ধু, ঢালো !

'একদিন খুঁজেছিনু যারে' কবিতায় জীবনের অবসাদের (limbo of boredom) ইঙ্গিত আছে :

এ মাটির ছলনার সুরাপাত্র অনিবার চুমি'
আজ মোর বুকে বাজে শুধু খেদ,—শুধু অবসাদ !
মহুয়ার,—ধুতুরার স্বাদ
জীবনের পেয়ালায় ফোঁটা ফোঁটা ধরি'
দুরন্ত শোণিতে মোর বারবার নিয়েছি যে ভরি' !

বন্ধ্যাত্ব-চেতনা এবং বন্ধ্যাত্বের প্রতীক হেমন্ত ঋতুর প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কবিতায় একেবারে প্রথম যুগ থেকেই এসেছে। 'ঝ রা পা ল কে' অনেকগুলি কবিতায় হেমন্তের উল্লেখ থাকলেও বন্ধ্যাত্বচেতনার আভাস আছে কেবল দুটি কবিতায়—'পিরামিড' ও 'শ্মশান'-এ। 'সিন্ধু' কবিতায় হেমন্তের উল্লেখ নেই, হেমন্তের আভাস আছে, বন্ধ্যাত্বচেতনাও আছে। নিঃসঙ্গ নীরব পিরামিডের শব-সাধনা সম্পর্কে কবি বলেছেন,

ব'সে আছো অশ্রুহীন স্পন্দহীন তাই ;
ওলটি-পালটি যুগ-যুগান্তের শ্মশানের ছাই
জাগিয়া রয়েছে তবে প্রেত-আঁখি—প্রেমের প্রহরা।

এই প্রসঙ্গেই বন্ধ্যাত্বের আত্মসচেতনতা জেগে উঠেছে ;

মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি—

অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু ;

'সিন্ধু' কবিতায়ও এই চেতনা এসেছে আত্মসচেতনতার মধ্য দিয়েই,

ক্ষুরধার আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া চিতা
গড়ি তবু বারবার ধুতুরার তিতা
নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ তুলি নিতেছি চুমিয়া।
মোর বক্ষকপোতের কপোতিনী প্রিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে,—পড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়,—ঝরাপাতা,—পুবালির হাহা !
কাঁদে বুকে মরা নদী,—শীতের কুয়াশা !

'ঝ রা পা ল ক' পূর্বর্তী কবিতায়ও ওয়েস্ট ল্যান্ড তথা পীড়াদায়ক নাগরিকজীবন চেতনার অভিব্যক্তি অনুভূত হয় 'বেদুঈন', 'আঁধারের যাত্রী' প্রভৃতি কবিতায়।

—মৌন গৃহতলে বসি নিরালা, —একাকী,
শতাব্দীর সভ্যতার পিঞ্জরের পাখী
আছি মোরা আর্ত ম্লান আঁখি দুটি তুলে।
—সীমাহারা নীলিমার কূলে
যেতে চাই ছুটে,
অসংখ্য শৃঙ্খলাঘাতে বিদ্রোহীর বক্ষে শুধু রক্ত ওঠে ফুটে !
ভাঙে না এ প্রাচীরের কারা,
জেগে আছে চিরন্তন ব্যর্থ বিধি-বিধানের এই মিথ্যা বিরাট পাহারা ![৩১]

জীবনের অবসাদ-প্রসঙ্গও আছে একটি কবিতায় ঃ

আমাদের হৃদয়ের সব আশা হতাশা যেখানে
বরফের মত কথা কহিতেছে বরফের কানে,—
পরিশ্রান্ত পেগানেরা একদিন চিনেছিল যারে,—
সব চেয়ে অবসাদ সঙ্গে করে এনেছিল যারা ![৩২]

'ধূ স র পা ণ্ডু লি পি'-র যুগে জীবনানন্দের দৃষ্টি পাশ্চাত্যমুখী হয়েছিল, একথা স্বীকৃত সত্য। ইয়েটস্-এর কাব্য-পরিক্রমা শেষে এলিঅটের কাব্য-ভাবনার জগতে উপনীত হয়েছিলেন জীবনানন্দ।[৩৩] কিন্তু সেই সঙ্গে এ-তথ্য-

টুকু বিস্মৃত হওয়া অনুচিত যে যে-সমস্ত কাব্য-বৈশিষ্ট্য এবং কাব্যচেতনা এলিঅটের কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং চেতনার ক্ষীণ উন্মেষ জীবনানন্দের কাব্যে একেবারে ঊষালগ্নেই ঘটেছিল। সমসাময়িক কাব্য-আন্দোলন তথা ইংরেজি কাব্যের প্রচণ্ড অভিঘাতের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব আরোপ ক'রেও যেমন একথা বলতে বাধে না যে স্বীয় কাব্য বিবর্তনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতায় উপনীত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ঊষালগ্নের ঐতিহ্যবিরোধী বৈশিষ্ট্য এবং চেতনাগুলিই জীবনানন্দকে কাব্যবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এলিঅটীয় বৈশিষ্ট্য ও চেতনার নৈকট্যে পৌঁছে দিত এমন সম্ভাবনাকেও নিতান্ত উপেক্ষা করা যায় না।

পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য মুছে ফেলে প্রতীচ্যের দিকপালদের ঐতিহ্য স্বীকরণে প্রচ্ছন্ন প্রয়াসী কবির স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে একটি চিঠিতে ঃ

> মানস পরিধি থেকে পূর্বজেরা তখন সরে গিয়েছেন খানিক দূরে, —অনেক দূরে ;—রবীন্দ্র, বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন ঐতিহ্যও ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড় বড় বৈদেশিকদের উজ্জ্বল আলোর কাছে।[৩৪]

অনুমিত হয় 'ধূসরায়িত ঐতিহ্য'-এর মধ্যে 'ধূ স র পা ণ্ডু লি পি' কাব্যগ্রন্থের নামকরণের যথার্থ ইঙ্গিত নিহিত আছে। যদিও প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি অন্যরকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, প্রায় এগারো বছরের ব্যবধানে প্রকাশের সময় 'ধূ স র পা ণ্ডু লি পি' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কবির কাছে ধূসর হয়েই বেঁচে ছিল।[৩৫] কবির মানস-পরিধিতে কোন্-কোন্ বড় বড় বৈদেশিকের উজ্জ্বল আলো এসে প্রাক্তন ঐতিহ্য ধূসরায়িত করেছিল তার উল্লেখ নেই কবির চিঠিতে, তবে এঁদের দলে যে ইয়েটস্, এলিঅট অবশ্যই ছিলেন সে-বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ বোধহয় নেই।[৩৬]

স্বাবলম্বনের বিবর্তন অন্তে 'ধূ স র পা ণ্ডু লি পি'-র যুগে পূর্বজের ধূসর ঐতিহ্য মুছে ফেলে 'কোনো এক নতুন কিছুর' প্রয়োজনীয়তা কবি-মানসে গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল ঃ

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছ যে-সুর—

ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো,—
নতুন এ—আর সব হারানো—পুরোনো। ('কয়েকটি লাইন')

(এই কবিতার সঙ্গে এলিঅটের ১৯৪৩ খৃঃ অব্দে রচিত 'দি সোস্যাল ফাংশান অব পোয়েট্রি' প্রবন্ধে কবির ভূমিকা সম্পর্কিত বক্তব্যের নৈকট্য আছে ঃ··· **he is also individually different from other people, and from other poets too, and can make his readers share consciously in new feelings which they had not experienced before.**—***On Poetry and Poets***, **p.** 20) 'কোনো এক নতুন-কিছু' অর্থে কবি 'শেষ মুহূর্তের. আজিকার' কোন্ সুরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা স্পষ্ট নয়। 'উৎসবের কথা', 'যন্ত্রণার বিষ' 'বিষাদ' কিংবা 'দুর্দশার গান' তাঁর নয়। তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন তিনি।

আনন্দের ? দুর্দশার ?—পড়ি নাকো।—সৃষ্টির আহ্বানে
আসিয়াছি।

'সৃষ্টির আহ্বান'-এর মতো সাধারণীকৃত অভিধা থেকে কবির 'নতুন কিছু' বা 'নতুন সুর' সম্পর্কে বিশেষ ধারণা গড়ে তোলা দুঃসাধ্য। 'নতুন কিছু' ইঙ্গিতের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে উপাদান আহরণের ইঙ্গিত সোজাসুজি খুঁজতে যাওয়াও অসমীচীন। কিন্তু এই অসমীচীনত্ব অজুহাত সম্ভবতঃ খুব বেশি প্রবল হয়ে উঠতে পারে না, কবির প্রাসঙ্গিক দু-একটি রচনার সাক্ষ্য গ্রহণ করলে। ১৩৪৮ সালের 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছেন ঃ 'আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য দিকটার অভ্যুত্থান হল নতুন সময় তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে

এসেছে বলে।...বর্তমান কবিদেরও অল্পবিস্তর পরস্পরনিঃসক্ত বিশেষ-বিশেষ গোষ্ঠী তেমনি বোদলেয়র ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে ইয়েটস, এলিয়ট ও পাউণ্ড-এর কাছে গেল· খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে বলে।'[৩৭] এর আট বছর পরে 'দেশ কাল ও কবিতা' প্রবন্ধেও বাংলা সাহিত্যে নতুন পটভূমি কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে সে-সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন: 'বাংলা সাহিত্যে যা নেই অথবা শীর্ণভাবে রয়েছে সেই সব প্রাণ ও পরিসরের থেকে রশ্মি পেতে হলে ইউরোপীয় সাহিত্য ছাড়া আমাদের অন্য কোনো আলোভূমি নেই।'[৩৮] 'হৃদয়ের সাহচর্য' কিংবা 'অভিনবত্বের গরিমা' অথবা 'বাংলা সাহিত্যে যা নেই' তারই উপলব্ধিতে কিনা জানি না জীবনানন্দ কিন্তু এলিঅটীয় চেতনায় উপনীত হয়েছিলেন 'ধূ স র পা ণ্ডু লি পি' কাব্যগ্রন্থে এবং সে-চেতনা অবশ্যই ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনা বা বন্ধ্যাত্ববোধ। 'মৃত্যুর আগে' কবিতার গোড়াতেই বন্ধ্যাত্ববোধ ঠাঁই পেয়েছে:

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পৌষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;

চাঁদকে আশ্রয় ক'রে বাংলা কবিতার যে-রোমান্টিক ঐতিহ্য তাকে প্রকারান্তরে প্রতিহত করে তার বন্ধ্যাত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। 'বোধ' কবিতার উপসংহারে এই বন্ধ্যাত্বচেতনা সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন। কবির বোধের মধ্যেই মানুষ-মানুষী-শিশুর বন্ধ্যাত্বস্বরূপ উপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে

নষ্ট শশা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

'মাঠের গল্প' পর্যায়ের কবিতা চতুষ্টয়ে ওয়েস্ট ল্যান্ড চেতনা বা বন্ধ্যাত্ববোধ গভীরভাবে ধরা পড়েছে। জীবনানন্দের বন্ধ্যাত্বচেতনা অবশ্যই অনুর্বরতা-পীড়িত নয়, ফসল কাটার পরবর্তী হেমন্তের শস্যরিক্ততা বা মাঠজোড়া শূন্যতাই এর উৎস। 'মেঠো চাঁদ' কবিতায় বন্ধ্যাত্ববোধটুকু দানা বেঁধেছে 'পোড়ো জমি' ঘিরে, এরকম স্পষ্ট ভাষায় অন্য কোনো কবিতায় সম্ভবতঃ এলিঅটের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' 'পোড়ো জমি'-র রূপ পায় নি। কবিতাটিতে 'পোড়ো জমি' প্রসঙ্গের পুনঃপুনঃ আম্রেড়ন থেকে এই চেতনার গভীরতাটাও সহজেই অনুমেয়।

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়-নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল।...
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝ'রে কতো—
বুড়ো হ'য়ে গেছ তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো।
ক্ষেতে-ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতবার—কতোবার ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে, চ'লে গেছে কবে!
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে
রয়েছো দাঁড়ায়ে
একা-একা! ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়-নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল।'

'শিশিরের জল'-কথাটিতে উর্বরতা-আভাস আছে এমন সংশয় মনে জাগতে পারে; কিন্তু তা অমূলক। জীবনানন্দের কবিতায় 'শিশির' কিংবা 'শিশিরের জল' হেমন্তের সহচর, অনুর্বরতারই অনুষঙ্গ। এখানে কবির বন্ধ্যাত্বচেতনার বিশিষ্ট স্বরূপটাও অনুধাবনীয়। অনাবৃষ্টি কিংবা প্রখর গ্রীষ্মজনিত অনুর্বরতা জীবনানন্দ কল্পনা করেন নি, দীর্ঘকাল ধ'রে ফসল

ফলাতে-ফলাতে যে-অনিবার্য অনুর্বরতা প্রকৃতিকে গ্রাস করে সেই অনুর্বরতার কল্পনাই তিনি করেছেন। 'মেঠো চাঁদ' কবিতায় চাঁদকে 'বুড়ো' বলার পশ্চাতে কিংবা 'বুড়ি পৃথিবী' কথাটিতে সম্ভবতঃ তারই ইঙ্গিত আভাসিত।

'পঁচিশ বছর পরে' কবিতায় পোড়ো জমির উল্লেখ না থাকলেও যে-পরিবেশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা পোড়ো জমিরই অনুকল্প।

তারপর—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়কড়;
শসাফুল—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল—শুকনো মাকড়সা
লতায়—পাতায়.

জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের প্রতি একটা স্পষ্ট পক্ষপাত অনুভূত হয়। এই পক্ষপাতের সূত্র ধ'রে হেমন্তকে তাঁর প্রিয় ঋতুরূপে চিহ্নিত করতেও প্রয়াসী হয়েছেন কোনো-কোনো সমালোচক। প্রিয়-অপ্রিয়ের তর্কে লিপ্ত না হয়েও এটুকু অবশ্যই জানাতে দ্বিধা করব না যে হেমন্ত তার বন্ধ্যাত্ব-বৈশিষ্ট্যের জন্যই জীবনানন্দের পক্ষপাত লাভ করেছে। হেমন্ত তাঁর কাছে প্রতীক—ধূসরতার, রিক্ততার, শূন্যতার প্রতীক। তাই হেমন্তের প্রসঙ্গ যখনই তাঁর কবিতায় এসেছে তখনই বন্ধ্যাত্বচেতনার একটা অভিব্যক্তিও তাকে আশ্রয় করেছে—'ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে'। 'পেঁচা' কবিতায়—

প্রথম ফসল গেছে ঘরে—
হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে
হিম হ'য়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা;

বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা ;
ধানক্ষেতে—মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা ,
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী—

'অঘ্রাণ' কবিতায় অঘ্রাণের প্রতি ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন অঘ্রাণের (হেমন্তের) পাতা-ঝরা বিষণ্ণতা, বিবর্ণতা, রিক্ততা, শূন্যতা সত্ত্বেও ।

আমি এই অঘ্রাণেরে ভালোবাসি—বিকালের এই রং—রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম—ঢালু মাঠ—বিবর্ণ বাদামী পাখি—হলুদ বিচালি
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে-ঘাসে—কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা,
ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে—জীবনেরে জেনেছে সে—কুয়াশায় খালি
তাই তার ঘুম পায়—ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনি সে—ক্ষেতের ভিতর
এখনি সে নেই যেন—ঝ রে পড়ে অঘ্রাণের এই শেষ বিষণ্ণ সোনালী
তুলিটুকু ;—মুছে যায় ;—কেউ ছবি আঁকিবে না মাঠে মাঠে যেন তারপর,
আঁকিতে চায় না কেউ—এখন অঘ্রাণ এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয়,
একদিন নীল ডিম দেখি নি কি ।

'নীল ডিমের' প্রতীক জীবনানন্দের কবিতায় অন্যত্রও আছে। মনে হয় পচা ডিমের রঙ নীল ব'লেই কবির এই প্রতীক বিশেষ রূপেই বন্ধ্যাত্বের দ্যোতনাবাহী ।

'জীবন' কবিতার ঊনত্রিংশ স্তবকে জীবনের দিকে ছুটে না গিয়ে অনেক ইচ্ছার বেগে ঘুমোবার বাসনা কবির যে-'বালির পরে' সে-বালিও বন্ধ্যাত্বেরই লীলাক্ষেত্র । এ-বালি বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি'-র সমগোত্রীয় এবং এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যাণ্ডেরই অনুকল্প ।

যেখানে আসে নি চাষা কোনোদিন কাস্তে হাতে লয়ে,
জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই যেইখানে এসে,
নিরাশার মত কেঁপে চোখ বুজে পলাতক হয়ে
প্রেমের মৃত্যুর চোখে সেইখানে দেখিয়াছি শেষে ।
তোমার চোখের পরে তাহার মুখেরে ভালোবেসে
এখানে এসেছি আমি,— আর একবার কেঁপে উঠে
অনেক ইচ্ছার বেগে,—শান্তির মতন অবশেষে

সব ঢেউ ভেঙে নিয়ে ফেনার ফুলের মত ফুটে,

ঘুমাব বালির পরে ;—জীবনের দিকে আর যাবে নাকো ছুটে।

নির্জনপ্রিয়তা কিংবা নৈঃসঙ্গ্যবোধ থেকে কবির অন্তরের 'অবসাদ' ও ক্লান্তি উদ্ভূত কি না দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সেকথা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, তবে তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতা ও কবিস্বভাবের জন্য অবসাদ ও ক্লান্তির অনুভূতি গভীরতর হয়েছে। এই অবসাদ ও ক্লান্তি আধুনিক নাগর সভ্যতার দান। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতার সঙ্গে নারীর হৃদয়, প্রেম, শিশু প্রভৃতি অনেক কিছু দিলেও অন্তরের ক্ষুধানিবৃত্তির হদিস দিতে পারে নি, তাই এই সংসারের পরিপূর্ণ সুখৈশ্বর্যের মাঝেও মানুষের মর্মে ক্লান্তি আসে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;

'উত্তরপ্রবেশ' কবিতায়ও নাগরিক জীবনের ক্লান্তির কথা ব্যক্ত করেছেন ঃ

মৃগনাভিঘন বড়ো নগরের পথে···
চারিদিকে উঁচু-নিচু অন্তহীন নীড় ···
হলেও হয়ে যেত পাখির মতন কাকলির
আনন্দে মুখর ;

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি—ক্লান্তি ;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময় ;
সেইখানে মৃত্যু তবু,
এই শুধু—
এই ;

'মিতভাষণ' কবিতায় ('বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ) আধুনিক সভ্যতার ক্লান্তি ও অবসাদের কথা অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে ;
বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা ;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।

সভ্যতার মর্মের ক্লান্তি তথা অবসাদ অতিক্রমণের উপায় খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতির মধ্যেই। এ-সম্পর্কে কবি তাঁর কবি-জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই প্রত্যয়নিষ্ঠ। 'নীলিমা' কবিতায় কবির এ-প্রত্যয়ের আভাস আছে। পূর্বোক্ত 'মিতভাষণ' কবিতায়ও আভাস আছে ঃ 'তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো'। আধুনিক সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তি আধুনিক মানুষকে সূক্ষ্ম রুচি, রসবোধ এবং সুকুমার মানসিকতা বিসর্জন দিতে বাধ্য করছে। তাদের অবসাদগ্রস্ত জীবনে প্রকৃত কাব্যরসেরও কোনো আবেদন নেই। এরকম পরিস্থিতিতে আধুনিক জগতের কাছ থেকে প্রকৃত কাব্যকলার স্রষ্টারা যথার্থ স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত হয়ে প্রকৃতির মধ্যেই সান্ত্বনা আহরণে যত্নবান হবেন কি না সে-বিষয়ে মনে জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল ঃ 'কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, অতএব স্বখাত সলিলে ধাতস্থ আমাদের দেশের সাহিত্যকর্মীদের সহানুভূতি যাঁর জন্যে একটুও নেই, তিনি কি করবেন? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর চলে যাবেন—শহরে বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতর ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনা-মনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন ; আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে করে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর ; সেই কোন্ আদিম জননীর কাছে যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনো অদিতির কাছে।'[৩৯]

সৎকবি-মানসিকতার জন্যই এ-সংশয় কবি জীবনানন্দের স্বকীয় আত্মজিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত। তবে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আলোচনার খাতিরে তিনি এই সংশয়কে জিজ্ঞাসারূপে তুলে ধরলেও কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসংশয় —প্রকৃতিই অবসাদ ও ক্লান্তির সান্ত্বনা

আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের ভার
কমে যায় ;—তাই নীল-আকাশের স্বাদ—সচ্ছলতা—
পূর্ণ ক'রে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর,
মানুষের অন্তরের অবসাদ—মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায় ;— ('অনেক আকাশ')

ব্যষ্টি-চেতনা থেকেই সমষ্টি-চেতনা বা বিশ্বচেতনায় উত্তরণ ঘটে। এলিঅটও ব্যষ্টির মানসিক অবসাদ-চেতনা থেকেই আধুনিক বিশ্বসভ্যতার অবসাদ-চেতনার ওয়েস্ট ল্যান্ড-উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন। জীবনানন্দের কবি-মানসিকতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিবর্তন দুর্লক্ষ্য নয়। 'মানুষের অন্তরের অবসাদ' কিংবা 'মানুষের ক্লান্তি' নয়, স্বীয় অবসাদ এবং স্বীয় ক্লান্তি-অনুভূতি 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'থেকেই বিশ্বের অবসাদ-চেতনায় উপনীত হয়েছেন ; 'বনলতা সেন' কবিতার প্রাতিস্বিক ক্লান্তি-চেতনা কিংবা 'ভিখিরী' কবিতার ব্যষ্টি-চেতনা 'ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—আরো গভীর অসুখ' থেকেই ঐ একই কাব্যে কবি উপনীত হয়েছেন বিশ্ব-চেতনায় ঃ 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'।

জীবনানন্দের উত্তর পর্বের নানা কবিতায় অবসাদগ্রস্ত বিশ্বচেতনার বিক্ষিপ্ত ছায়া পড়েছে।

কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই
নীড় নেই
পাখিরো মতন কোনো হৃদয়ের তরে। ('অন্ধকারে')

কিংবা,

…এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো ('পৃথিবীতে')

অথবা,

এইখানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে। ('এই সব দিনরাত্রি')

'এই সব দিনরাত্রি' কবিতায় এই বিশ্বচেতনার বর্ণনা আরো বাস্তবায়িত।

ঝর্ ঝর্ ঝর্
সারারাত শ্রাবণের নির্গলিত ক্লেদরক্ত বৃষ্টির ভিতর

এ-পৃথিবী ঘুম স্বপ্ন রুদ্ধশ্বাস
শঠতা রিরংসা মৃত্যু নিয়ে
কেমন প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সংগীতে
মুখের ব্যাদান সাধ দুর্দান্ত গণিকালয়—নরক শ্মশান
হলো সব।
জেগে উঠে আমাদের আজকের পৃথিবীকে এ-রকম
ভাবে অনুভব
আমিও করেছি রোজ সকালের আলোর ভিতরে
বিকেলে - রাত্রির পথে হেঁটে ;
দেখেছি রজনীগন্ধা নারীর শরীর অন্ন মুখে দিতে গিয়ে
আমরা অঙ্গার রক্ত : শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের
ভিতরে দাঁড়িয়ে।

সম্ভবতঃ প্রাতিস্বিক অবসাদ-চেতনা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে বিশ্বচেতনায় রূপান্তর লাভ করে তা এলিঅটীয় ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনা বা বন্ধ্যাত্ববোধেরই আর এক রূপ; তাই নির্জন অবসাদের কবি জীবনানন্দ বিশ্বচেতনার সুররিয়ালিজমের যুগে প্রায়ই ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনায় পীড়িত হয়েছেন।

নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে ঃ
যত দূর চোখ যায়— অনুভব করি,

অবশ্যই জীবনানন্দের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনা দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। তদুপরি বাংলার সমসাময়িক ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক ও দৈব-দুর্বিপাক যা জাতীয় জীবনে গভীরভাবে ছায়া ফেলেছিল তাও জীবনানন্দের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনাকে পুষ্ট করেছিল বিষ্ণু দে-র মতোই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগান্তর কালে কিংবা মন্বন্তরের মড়কের দিনে অথবা দাঙ্গাবিধ্বস্তের শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে স্বভাবতঃই আধুনিক সভ্যতাকে কেবল ওয়েস্ট ল্যাণ্ড নয়, কবরভূমি কিংবা শতাব্দীর শেষ ব'লেও অনুভূত হয়েছে।

নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে ;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল

ইতস্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে ;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথ নেই ব'লে,
যথাস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলি যথাস্থানে
রয়ে যায় ; শতাব্দীর শেষ হ'লে এ-রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে ,

কবির এই চেতনা মাঝে-মাঝে আরো বাস্তব ঘটনাকে ছুঁয়ে গেছে ঃ

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ ,
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো-সাঁকো সমাধির ভিড় ;

আবার কখনো-কখনো কবির এই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে প্রতীক আশ্রয় করে ঃ

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে , মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি ; নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের , যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে
আরেক আকাশ যেন—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে ; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে—পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের 'পর,

অবসাদ বা ক্লান্তিবোধ কিংবা ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনা বা বধ্যাত্ববোধ সমস্তই অঙ্গাঙ্গিভাবে এসেছে জীবনানন্দের কবিতায় প্রথম যুগ থেকেই। এই সমস্ত চেতনা উত্তরণের আত্মজিজ্ঞাসাও তাঁকে আগাগোড়া বিব্রত করেছে। এলিঅট সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব থেকে ধরাকে মুক্ত করতে 'বরিষণ' এবং 'শান্তি' উভয়েরই প্রার্থনা করেছেন। শান্তির প্রার্থনা মাঝে-মাঝেই জীবনানন্দের মনকে অধিকার করেছে। 'ধূ স র পা ণ্ডু লি পি'-র 'এই শান্তি', 'ম হা পৃ থি বী র' 'শান্তি' কিংবা 'রূ প সী বা ং লা' -র 'এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্ণে শান্তি আসে মানুষের মনে' কবিতাগুলি ছাড়াও নানা-কবিতায় শান্তি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

বৈতরণী—বৈতরণী—শান্তি দেয়—শান্তি—শান্তি—ঘুম—ঘুম—ঘুম
অবিরত তারি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।'
('বৈতরণী')

এলিঅটের মতো আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মুক্তি জীবনানন্দও অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন। 'আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের' অন্বেষার পথের এই সভ্যতার মুক্তি, মানব-সমাজের মুক্তি, 'পৃথিবীর ক্রমমুক্তি' ঃ

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;—
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে । ('সুচেতনা')

জীবনানন্দ স্পষ্টতঃই মানবিকতার আস্তিক্যবোধে গভীর আস্থাবান।

তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎসে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?...
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে !
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির
ভিতরে চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয় । ('সময়ের কাছে')

পাশ্চাত্যের কবি এলিঅটে কিংবা তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' সম্ভবতঃ এ-আস্তিক্যবোধ অনুপস্থিত।

'ঝরা পালক' কিংবা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র বর্তমানচারিতা 'বনলতা সেন'-এর যুগে হাজার বছরের অতীতের 'উজ্জ্বল সময়স্রোত' পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে ; 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর যুগে কবির 'উজ্জ্বল সময় ঘড়ি'-র কাঁটা চক্রাকারে ঘুরেছে অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে, আবার ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে।

আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
কাচের গেলাসে জলে উজ্জ্বল শফরী,
সমুদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো।
তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব এক সাথে প্রচারিত করে।
('আবহমান')

এই বিশিষ্ট সময়-চেতনা কবির প্রতীক-চেতনা ও অধিবাস্তব বা পরাবাস্তব-চেতনার (surrealism) মধ্যে দানা বেঁধেছে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দ্বারাও লালিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এলিঅটের 'ফোর কোয়ার্টেট স্'-এর সময়-চেতনার সঙ্গে কোথাও যেন একটা মিল আছে।

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে ? মরে গেছে অনেক নৃপতি ?
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি ? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি ;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান ?
('সিন্ধুসারস')

এর পশ্চাতে এলিঅটের

Time present and time past
Are both perhaps present in time future

এই তত্ত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া কোথাও-কোথাও খৃষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার আভাসও সূচিত হয়েছে। যেমন,

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি। ('সময়ের কাছে')

অথবা,

সময়ের সমুদ্রের পারে
কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে
প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
অগ্রসর হয়ে কোনো আলোকের পাখিকে দেখেছে ?
জয়, তার জয়, যুগে-যুগে তার জয়। (ঐ)

জীবনানন্দের কিন্তু সময়-চেতনা অবশ্যই বিশিষ্টরূপ পেয়েছে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা তথা জন্মান্তরবাদের পটভূমিকায়। ভারতীয় দর্শনের ছাত্র হলেও এলিঅটের সময়-চেতনায় এর কোনো প্রভাব সম্ভবতঃ পরিলক্ষিত হয় না।

সে অনেক রাজনীতি রুগ্ন নীতি মারী
মন্বন্তর যুদ্ধ ঋণ সময়ের থেকে

উঠে এসে এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার
বছরে বয়সী আমি ;
বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে
চ'লে যেতে দেখে—তবু—অবিরল অশান্তির দীপ্তি ভিক্ষা ক'রে
এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়েছি ; ('তবু')

জীবনানন্দ স্বীয় কাব্য ও কবিস্বভাবের উপযোগী কাব্যভাষা সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন, বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছিলেন এমন যা তাঁর রোমান্টিক নিঃসঙ্গতাকে বাঙ্ময় রূপ দিয়েছিল। প্রতীক, চিত্রকল্প প্রভৃতির মধ্যেও তাঁর বিশিষ্ট কবিস্বভাব যথাযথ ধরা পড়েছিল। এককথায়, এলিঅটের ভাষায় 'proper modern colloquial idiom' বা যথাযথ আধুনিক কাব্যরীতি জীবনানন্দকেও খুঁজে নিতে হয়েছিল। তাঁর কৃতিত্ব এখানেই যে বাঙালীর এবং বাংলা ভাষার যথার্থ মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এলিঅটের সঙ্গে জীবনানন্দের কাব্যিক সাদৃশ্য খুঁজতে যাওয়া সম্ভবতঃ অযৌক্তিক।

দু-একটি কবিতায় জীবনানন্দের চিত্রকল্প ও বক্তব্যে এলিঅটের অনুরূপ চিত্রকল্প ও বক্তব্যের আকস্মিক ঝলক অনুভূত হয়।

এলিঅটের 'মারিনা' কবিতার মূল আলম্বন চিত্রকল্প তথা ছবির সঙ্গে 'বনলতা সেন' কবিতার আলম্বন চিত্রকল্প তথা প্রদত্ত ছবির সাদৃশ্য স্পষ্ট। 'মারিনা'-র সমুদ্রযাত্রার শেষে এক শ্রান্তিহর মুখচ্ছবি (অবশ্যই নারীর) 'বনলতা সেন'-এরও আলম্বন। তবে ভারতীয় জন্ম-জন্মান্তরের ব্যঞ্জনাটুকু বাহুল্য, খৃষ্টীয় রেজারেকশনের সঙ্গে মেলে না।[৪০] জীবনানন্দের বনলতা, দারুচিনি দ্বীপ, হালভাঙা জাহাজ, রৌদ্রের গন্ধ, চিল প্রভৃতি এলিঅটের this face, granite island, rigging weak and canvas rotten ship, scent of pine, woodthrush প্রভৃতিরই অনুকল্প। পার্থক্য এই যে এলিঅটের সমস্তই অচেনা, জীবনানন্দের সমস্তই চেনা—'মারিনা'-য় সমুদ্র, দ্বীপ কিংবা মুখ কোনো কিছুরই নাম নেই, 'বনলতা সেন'-এ সব কিছু নাম দিয়ে চিহ্নিত। কবিতা দুটির কয়েকটি সদৃশ চরণের ব্যঞ্জনাও উপেক্ষণীয় নয়। 'মারিনা'-য় যা সংহত ও ব্যঞ্জনাময়, 'বনলতা সেন'-এ তাই আরো ব্যাপকতর, স্পষ্ট এবং বর্ণনাময়। এলিঅটের 'What seas what shores what grey rocks and what islands··' জীবনানন্দের কবিতায় হয়েছে ঃ

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;

আবার,

'What is this face, less clear and clearer···
···more distant than stars and nearer than the eye'

'বনলতা সেন' কবিতায় হয়েছে ঃ

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ;

'আট বছর আগের একদিন' কবিতার কয়েকটি চরণের পশ্চাতে 'দি লাভ সঙ অব জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক' কবিতার একটি সুপরিচিত চিত্রকল্পের অস্তিত্ব অনুভূত হয়।

এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর 'দি বেরিয়্যাল অফ দি ডেড' অধ্যায়ের 'death had undone so many'-এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়, যেন জীবনানন্দের 'আবহমান' ও 'জনান্তিকে' কবিতার প্রাসঙ্গিক দু-একটি চরণে। 'জনান্তিকে'-র সংশ্লিষ্ট চরণগুলি ঃ

পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে ;
ঝ'রে পড়ে।
এই সব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুণে নিতে
ব্যাপ্ত হ'তে হয়।
নব প্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

'মাঘ সংক্রান্তির রাতে' কবিতার সূচনায় এলিঅটের 'পার্গেটোরি' বা শুদ্ধিকরণ চিন্তা প্রশ্রয় পেয়েছে ব'লে মনে হয়। এলিঅট এই শুদ্ধিচিন্তা পেয়েছিলেন দান্তে থেকে।

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।[৪১]

রোমান্টিক তথা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য উত্তরণে এলিঅটীয় দৃষ্টান্ত আধুনিক বাংলা কবিতার উন্মেষ পর্বে গভীর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, এলিঅটীয় কাব্যরীতি আঙ্গিক প্রকরণ প্রভৃতিও ব্যাপক অনুসৃত হয়েছিল, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সত্য। জীবনানন্দ কাব্যসাধনাকালে এই আন্দোলনের ঔপপত্তিক দিকটি অন্তর থেকেই গ্রহণ করেছিলেন, সে-কথা তাঁর প্রবন্ধাবলীতে নানা প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সফলকাম হলেও রবীন্দ্র বিরোধিতায় কিংবা এলিঅটীয় কাব্যরীতি-অনুকৃতি তেমন উগ্রতা পায় নি জীবনানন্দের কাব্যে, সম্ভবতঃ বিশিষ্ট কাব্যস্বভাবই তাঁকে অনুরূপ উগ্রতা থেকে নিবৃত্ত করেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও দু-একটি এলিঅটীয় কাব্যতত্ত্ব জীবনানন্দের কাব্যানুশীলনে মূলমন্ত্ররূপে গৃহীত হয়েছে, সে-কথা তাঁর প্রবন্ধাবলীর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এলিঅটের 'ট্রাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট' প্রবন্ধটি সমসাময়িক সাহিত্য-চিন্তার জগতে গভীর আলোড়ন তুলেছিল, তার প্রভাব পড়েছিল 'ব্রিটিশ ভারতেও'। প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত 'historical sense' বা 'ইতিহাস-চেতনা' তত্ত্বটি বাংলা কাব্যের আধুনিকতাবাদী কবিগোষ্ঠীর অনেকের মতোই জীবনানন্দকেও শুধু আকৃষ্টই করে নি, তাঁর কাব্যে এই তত্ত্বটির কাব্য-রূপায়ণও ঘটেছিল। কবিতা ও কাব্যতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি এই তত্ত্বের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এমন কি, যেখানে প্রসঙ্গান্তরেও বিষয়টি উত্থাপিত সেখানেও এই এলিঅটীয় তত্ত্বের অস্তিত্ব অনায়াসে অনুভূত হয়েছে। 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে 'কেউ কেউ কবি'-র সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করতে গিয়ে জীবনানন্দ বলেছেন, 'কবি—কেন না তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।' বছর তিনেক পরে লিখিত 'একটুখানি' প্রবন্ধেও আছে, 'যে-জাতির ভিতরে ইতিহাস-চেতনা ও সমাজ-চৈতন্য নেই, সে-জাতির দুর্ভাগ্য উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।···ইতিহাস ও সমাজ-সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। এই চেতনা ও কল্পনা-প্রতিভা যাদের রয়েছে তারাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করতে সমর্থ।'[৪২] উদ্ধৃতি দুটিরই আলম্বন ও উদ্দিষ্ট এলিঅটের 'historical sense' হ'লেও বক্তব্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে একথা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। এ-তারতম্য ঘটেছে তথাকথিত 'ইতিহাস-চেতনা'র কাব্যিক রূপায়ণেও। 'ইতিহাস-চেতনা'রূপে বাংলা

কাব্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিহাসেরই কাব্যরূপারণ ঘটেছে, জীবনানন্দেও এমন ব্যাপার ঘটতে দেখা গেছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই বিষ্ণু দে। এলিঅট ব্যাখ্যাত 'historical sense' আসলে ঐতিহ্য-চেতনারই নামান্তর; তাই তাকে 'ইতিহাস-চেতনা' রূপে গ্রহণ করতে গেলে কিংবা কাব্যে রূপায়িত করতে গেলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত উদ্ধৃতি দুটির মধ্যে প্রথমটিতে 'historical sense' 'ঐতিহ্য-চেতনা' রূপে গৃহীত হয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে গৃহীত হয়েছে সোজাসুজি 'ইতিহাসের চেতনা' রূপে। স্বভাবতঃই প্রথমটিতে এলিঅটীয় বক্তব্যের অনুরণন থাকলেও এই কারণেই দ্বিতীয়টিতে নেই। জীবনানন্দ এলিঅটের 'historical sense'-কে মুখ্যতঃ 'ইতিহাস-চেতনা' রূপে গ্রহণ করেছিলেন ব'লেই প্রথম উদ্ধৃতির বক্তব্যের বিরুদ্ধ উক্তিও ঐ একই প্রবন্ধে ঠাঁই পেয়েছে, 'কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না।' স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে তিনি এলিঅটের 'the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order' এই বক্তব্য সমর্থন করেন না; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর নিজেরই পূর্বোদ্ধৃত উক্তি' '…এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে'-এর থেকেও সমর্থন প্রত্যাহৃত হল না কি?

The Use of Poetry and the Use Criticism গ্রন্থে (পৃ. ১৫১) এলিঅট কবিতায় অর্থের মুখ্য উপযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন, 'The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him', অন্য কোনো কবির কবিতা সম্পর্কে এই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হয় কি না নির্দ্ধিধায় বলা না গেলেও জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে অবশ্যই বলা চলে। কবিতা বোঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য—এরকম একটি কাব্যবিধান রবীন্দ্রনাথও

প্রচার করেছিলেন; কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে তাঁর কবিতায় অর্থ-গৌরবই মুখ্য ভূমিকা জুড়ে বসে আছে। জীবনানন্দের কবিতায় অবশ্যই অর্থের ওপরে আমেজকে স্থান দেওয়ার ঐতিহ্য বিরোধী প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অর্থ তাঁর অধিকাংশ কবিতায় অনায়াসলভ্য নয়, বরং সহজলভ্য একটা কাব্য-আমেজ।

'কবিতার কথা' প্রবন্ধেরই অংশবিশেষে জীবনানন্দ লিখেছেন, 'প্রথমত শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে, মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয়, এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে এবং নতুন ক'রে গড়তে চাচ্ছে।' এই বক্তব্যের মধ্যে গদ্য-কবিতা আন্দোলন সম্পর্কে এলিঅটের বক্তব্যের একটা ক্ষীণ আভাস আছে।

৪.

এলিঅটের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নৈকট্য অবশ্যই কবি-স্বভাবের নয়, মুখ্যতঃ কাব্যরীতির। স্বভাবে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন রোমান্টিক, কিন্তু কাব্য-রীতিতে ধ্রুপদী বা ক্লাসিকপন্থী। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, 'এলিঅট কবিকে ঘটক আখ্যা দিয়েছেন, এবং আমিও মনে করি যে ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের পরম সার্থকতা'[৪৩] কিংবা 'স্বপ্নচারী পথিককে যেমন, অনুপ্রাণিত কবিকে আমি তেমনই ডরাই, এবং কালের বৈগুণ্যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মূল্য বাড়ছে বই কমছে না।'[৪৪] কাব্যে জাতীয় মানস প্রতিফলন, হৃদয়াবেগ সংহতকরণ তথা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ উপাদান ব্যবহার সম্পর্কিত ক্লাসিকপন্থী কাব্যস্বভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থাকলেও সর্বথা সে-দায়িত্ব পালনে তিনি সক্ষম হয়েছেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশয়াম্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ধ্রুপদী কবিতার মুখ্য আলম্বন বস্তুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় পুরোপুরি ধরা পড়ে নি। তবে তিনি ভাষারীতিতে বাংলা কবিতায় এক ক্লাসিক কাব্যভাষা সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছিলেন। যথেচ্ছ অপরিচিত তৎসম শব্দ ব্যবহার তাঁর কবিতাকে সাধারণ্যে দুরূহ (? দুর্বোধ্য) ক'রে তুললেও বাংলা কবিতায় তিনি নতুন মাত্রা (dimension) ও গতি এনেছিলেন। যদিও তাঁর কাব্যধারার অনুসরণে কোনো উত্তসূরীর আবির্ভাব ঘটে নি, তাহলেও তিনি আরো অনেকের সঙ্গে গোষ্ঠীগত প্রয়াসে বাংলা কবিতার যে মোড় ঘুরিয়েছিলেন তার সাফল্য

অবিসংবাদিত এবং ঐতিহাসিক; বাংলা কবিতা যথার্থই প্রাচীন গতিপথ ছেড়ে নতুন সম্ভাবনার পথে পা দিয়েছিল। মনে হতে পারে সুধীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী কাব্যরীতি এলিঅটীয় কাব্যরীতির এবং আধুনিকতাবাদী কাব্য-আন্দোলনের পরিপন্থী। এলিঅট কবিতায় কথ্যরীতির প্রবক্তা, তার সঙ্গে সুধীন্দ্রীয়-রীতির সাদৃশ্য কোথায়! কিন্তু এলিঅটের গদ্যকবিতা-আন্দোলন বিষয়ক ব্যাখ্যার সঙ্গে এর সাদৃশ্য তাৎপর্যপূর্ণ। সুধীন্দ্রনাথেরও অনুচ্চারিত বিদ্রোহ অবশ্যই 'against dead form, and a preparation for new form or for the renewal of the old'—বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রা ও গতি সঞ্চার করতে বহু ব্যবহারে জীর্ণ শব্দ দিয়ে নয়, অপরিচিত শব্দ দিয়েই প্রতীক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে হবে। এ-প্রয়াস তাঁর যথার্থই অভিনব কাব্যভাষারীতির জন্য এবং মৃতপ্রায় পয়ার-রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, নিঃসন্দেহে এই প্রাচীন রীতির পুনর্নবীকরণ।

কোনো কোনো সমালোচক সুধীন্দ্রনাথকে যেভাবে নির্দ্বিধায় ধ্রুপদী-রীতির কবি বলেছেন কিংবা বিষ্ণু দে-র সমপর্যায়ভুক্ত বলে গ্রহণ করেছেন[৪৫] সেভাবে গ্রহণ করতে পারলে এলিঅটে ও সুধীন্দ্রনাথে কাব্যিক যোগাযোগ দেখানো সহজ হতো; কিন্তু তা যে সম্ভব নয় সে আভাস এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই তুলে ধরা হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক স্বভাব সম্পর্কে তাঁর সতীর্থ কবিরাও অনেকেই নিঃসংশয় ছিলেন।[৪৬] সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে ক্লাসিকধর্মিতা আনয়নের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তা সফল হয় নি সম্ভবতঃ মাটির গুণে। মাটির গুণেই বাংলার জাতীয়মানস রোমাণ্টিকধর্মী। তাই দেখি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মূল্য স্বীকার ক'রে নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে আগাগোড়া রচিত হ'য়েও 'প্রতীক্ষা' ('দ শ মী' কাব্যগ্রন্থ) কবিতাটির উপসংহারের স্তবকটিতে কবি আকস্মিক ভাবেই ধরা দিয়েছেন রোমাণ্টিকতা-সুলভ মন্ময়তায়।

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই;
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে,
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে:
তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি?

এরকম বিপর্যয় তাঁর কাব্যে একটি সাধারণ ঘটনা। তাই তাঁর মৃত্যুর

অত্যল্প পূর্ববর্তী কালের স্বীকারোক্তিকে স্বাভাবিক ব'লেই মনে হয় যখন তাঁকে বলতে শুনি : 'নিজের প্রতি যে-নিরাসক্তি সৎসাহিত্যের অনন্য লক্ষণ, তাকে আমার আয়ত্তে আনতে দেরী আছে।'[৪৭]

বাংলা 'কাব্যের মুক্তি'-সন্ধানী সুধীন্দ্রনাথই বাংলায় সম্ভবতঃ ভারতীয় ভাষায়ও, এলিঅট-চর্চার এবং এলিঅট-চেতনার পথিকৃৎ।[৪৮] ১৯৩০ সালে রচিত 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনিই প্রথম [৪৯] স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেছিলেন, '...বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেখা গেল যে পূর্বপুরুষের অনন্ত শোষণে কাব্যের কলেবর থেকে অর্থ ও আবেগের মজ্জাটুকু শুকিয়েছে, পড়ে আছে শুধু কঙ্কাল—প্রতিধ্বনিপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে পড়ে আছে শুধু দীর্ণ, জীর্ণ, বৈশিষ্ট্যবিহীন কঙ্কাল।'[৫০] 'বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই ব'লেই কাব্যের জগতের কঙ্কালের মরুভূমি অতিক্রমণের উদ্দেশ্যে 'এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে, কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না। তারপর বহু পরিচর্যার ফলে হয়তো তাতে অঙ্কুর দেখা দেয়, কিন্তু কবি নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পায় না, তখনও উনিদ্র যত্নে সেই অনিকাম বৃন্দর রক্ষণাবেক্ষণ তার অবশ্য কর্তব্য...।'[৫১] প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন, (কাব্যের জগতে) শুধু নূতন অট্টালিকার নির্মাণে কোনোও সার্থকতা নেই; হর্ম্যখানাকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী করা চাই...। তাতে যদি প্রথাগত স্থাপত্য বর্জনীয় ঠেকে, তবে তাই স্বীকার। তাতে যদি নাস্তিক, বস্তুবাদী ইত্যাদি অন্যায় অপবাদ ঘাড়ে পড়ে, তবে তাও বরণীয়। প্রথম দফায় দরকার অবৈকল্য, দ্বিতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, তৃতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, শেষের দফায় দরকার অবৈকল্য। বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্র অবৈকল্য আর অকপটতা।'[৫২]

উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহ বিংশ শতাব্দীর যুগধর্মের তো বটেই, বিংশ শতাব্দীর নতুন কাব্য-ঐতিহ্যের কবি এলিঅটেরও কাব্যভাষ্য। সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না যে ইংরেজির মতোই বাংলা কাব্যেরও মুক্তি রোমাণ্টিকতা হ'তে অপসরণে তথা এলিঅটীয় বস্তুনিষ্ঠ নৈরাত্মসিদ্ধিতে, এরকম কাব্যপ্রত্যয়ে আরো অনেকের মতোই সুধীন্দ্রনাথও উপনীত হয়েছিলেন। সক্রিয় অংশ-গ্রহণে সুধীন্দ্রনাথের প্রাধান্য অবিসংবাদিত, তিনি স্বীয় কাব্যপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠায় প্রবন্ধে এবং কবিতায় দ্বিমুখী সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন, ব্যাপারটা অনেকাংশে এলিঅটেরই অনুরূপ। সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এলিঅটের 'দি ক্রাইটেরিঅন'-এর ছায়া অনুভূত হওয়ার মতো যুক্তিও অস্বীকার করা যায় না।[৫৩]

নৈরাত্মসিদ্ধি তথা ধ্রুপদী রীতি ছাড়াও এলিঅটীয় ঐতিহ্য-চেতনায় গভীর আস্থাশীল সুধীন্দ্রনাথ। প্রাচীন ও অর্বাচীন কাব্যের পুনর্মূল্যায়ন সৎকবিকে স্বীয় কাব্য-প্রত্যয়ে উপনীত হতে সাহায্য করে, এ-বিষয়েও তিনি নিঃসংশয়, 'যিনি মহাকবির মর্যাদা চান, তাঁর পক্ষে প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির দক্ষ নির্বাচনই যথেষ্ট নয়; সেজন্যে প্রাচীন ও অর্বাচীন কাব্য-রচনার যথাযথ মূল্য বিচারও আবশ্যক। অর্থাৎ কাব্যের স্বভাব-সম্বন্ধে, সাহিত্যের ইতিহাস ও পরিণতি-সম্পর্কে কবিমাত্রেই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য;...'[৫৪] ঐ প্রবন্ধেরই অন্যত্র আরো সংযত ও ঋজু ভঙ্গিতে বলেছেন, 'অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সচেতন শিল্পী; এবং শিল্পসৃষ্টির জ্ঞাত প্রকরণ স্বকীয় উদ্দেশ্যকে চোখের সামনে রেখে, অতীত ও বর্তমানের সমুদ্রমন্থন ক'রে উপযুক্ত উপায়ে সুসঙ্গত অবৈকল্য-নির্মাণ।'[৫৫]

ঐতিহ্য-চেতনা অবশ্যই এক বিতর্কিত কাব্য-প্রত্যয়, তদুপরি এলিঅটীয় চেতনার কাব্যিক প্রয়োগও সন্দেহাতিরিক্ত কাব্যদক্ষতার পরিচায়ক। সুধীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে কতটা দক্ষতা দেখিয়েছেন সেকথা অন্যত্র বিবেচ্য, এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এর তাত্ত্বিক দিকটি সম্পর্কে এলিঅটে এবং সুধীন্দ্রনাথে মতৈক্য এতই ব্যাপক যে ঐতিহ্য-চেতনা রূপায়ণে ব্যবহৃত বিশিষ্ট এলিঅটীয় প্রতীক-প্রকরণও সুধীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় সমর্থনপুষ্ট, 'প্রতীকের অভিধা যদি এই রকমে বাড়ানো যায়, তবে এলিয়টী বাক্যচৌর্যও তার এলাকায় আসতে বাধ্য। কারণ প্রতীকের সাহায্যে বেদনা যেমন নৈর্ব্যক্তিক রূপরেখায় ফুটে দুটি স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে অনুকম্পনের মধ্যে সেতু বাঁধে, তেমনই এলিয়ট-এর মনোভাব দান্তের ভাষাকে অঙ্গীকার ক'রে আপনার সঙ্কীর্ণতা কাটায়।'[৫৬]

এলিঅটীয় কাব্য-প্রত্যয় কিংবা কাব্য-প্রকরণ সম্পর্কে নির্ভরতা সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনের কোনো একটা বিশেষ মুহূর্তের ব্যাপার নয়, কবিসত্তার মূলেই এরা নাড়া দিয়েছিল; তাই কবিজীবনের প্রৌঢ়ত্বে এসেও এলিঅটীয় আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থায় তাঁর কণ্ঠ ঝঙ্কার তোলে, 'কিন্তু এ-বিশ্বাস আমার সুদৃঢ় যে আণবিক লঙ্কাকাণ্ডের পরেও সভ্যতার কোনো উত্তরকাণ্ড যদি থাকতেই হয়, তাহলে এলিঅটীয় আদর্শের ব্যাপ্ত স্বীকৃতি এখন আবশ্যক, যাতে উত্তর প্রালয়িক মরূদ্যানগুলিতে, আবার যুগান্তরের পূর্বাহ্নে, মানুষ সে-আদর্শে আশ্রয় পায়।'[৫৭]

বহুশ্রুত বৈদগ্ধ্য ও মনীষার অধিকারী সুধীন্দ্রনাথের কাব্যানুশীলনের ব্যাপকতা বিস্ময়াবহ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রাচীন অর্বাচীন নানা কাব্যধারা ও

কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তিনি; বাংলা, ইংরেজি ও ফরাসী সাহিত্যের সমসাময়িক ও পূর্বজ কবিদের কাব্যধারা তথা কবিকৃতির পুনর্মূল্যায়ন ক'রে স্বীয় কাব্যাদর্শ ও কাব্য-প্রত্যয়ের সন্ধান করেছেন, উন্নিদ্র নিষ্ঠায় ও অধ্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বীয় কাব্যাদর্শ ও কাব্য-প্রত্যয়কে। সে-কারণেই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথ অনন্য। তিনি সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী কোনো কাব্যধারা বা কবির ছায়ানুগ নন, পরন্তু সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী বিভিন্ন কাব্যাদর্শ ও কাব্য-প্রত্যয়ের আত্তীকৃত স্বরূপে মন্ময় প্রাবরণে ধ্রুপদী-রীতির স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। গোড়ার ইতিহাস কিন্তু সমসাময়িক অন্য সকলের মতোই অভিনবত্ববর্জিত অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অনপনেয় ছায়ায় স্বাবলম্বনের বিবর্তন—'তন্বী' এবং 'অর্কেস্ট্রা'-য় সে-ছাপ অতি প্রকট।

অনবরত নতুন ক'রে নিজেকে রচনা করা সুধীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান কবিকৃত্যই নয়, তাঁর কবিধর্মও; তাই 'পুরোনো রচনার তৃপ্তিহীন পরিবর্তন ও পরিমার্জনা'-য় তিনি নিরলস ও অকুণ্ঠ।[৫৮] পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে পূর্ববর্তী সংস্করণের পাঠ-সংস্কার ও পরিমার্জন ছিল তাঁর অবশ্যকৃত্য। ব্যতিক্রম 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থটি।' জীবৎকালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি ব'লেই প্রথম বয়সের এই কবিতাগুলি কবির দ্বিতীয় দফার হস্তাবলেপ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য, প্রথম রচনা-কালীন কবিমানসিকতার অবিকৃত স্বাক্ষর 'তন্বী' ছাড়া সুধীন্দ্রনাথের অন্য কোনো রচনায় সম্ভবতঃ নেই। পক্ষান্তরে কাব্যমূল্যে এই কাব্যগ্রন্থটি ততখানিই মূল্যহীন, কবির মৌলিকত্ব কিংবা কাব্যস্বাতন্ত্র্য তখনো অর্জিত হয় নি। গ্রন্থখানি সম্পর্কে কবির অকপট স্বীকারোক্তি, 'রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ ব'লে ধ'রে নেওয়া প্রায় নিরাপদ।'[৫৯] 'জ্ঞানকৃত' রাবীন্দ্রিক ঋণ ছাড়াও অজ্ঞানকৃত ঋণের কথাও কবি স্বীকার করেছেন, 'পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন—সব সময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়।' এই 'বিদেশী অনেক কবি'-র তালিকায় প্রাচীন-অর্বাচীন ইংরেজ-ফরাসী কবিদের মধ্যে অনেকেই থাকলেও এলিঅট নেই এমন অনুমান প্রকৃতই অযৌক্তিক নয়। ১৯২৫ সালের কবিতাবলীর মধ্য দিয়েই এলিঅটের সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের কাব্যিক যোগাযোগ

স্থাপিত হয়েছিল এবং এ-ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথেরই অগ্রণী ভূমিকা ছিল, উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি অস্বীকার না করলে একথাও স্বীকার করতে হয় যে ১৯৩০-এর অব্যবহিত কাল পূর্বেই এলিঅটের কাব্য ও কাব্য-প্রত্যয় সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দেয়। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় সে-সময় 'অ র্কে স্ট্রা'-র যুগ। 'ত ন্বী'-র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৫-২৬। কবি তখন রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতায় আবর্তনের মধ্যেই কাব্যিক সার্থকতা অনুসন্ধানে নিরত, বাংলা কাব্যের মুক্তি কিংবা রোমান্টিকতা হ'তে অপসরণ-চেতনা তখনো কবিমানসকে আচ্ছন্ন করে নি, কিংবা আক্রান্ত হন নি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনায়। নিতান্ত আকস্মিক ভাবে রোমান্টিক-বিরোধী-চেতনা কিংবা বাস্তব-চেতনা এসেছে কোনো-কোনো কবিতার এক-আধটি চরণে। 'অনাহূত' কবিতায়ঃ

> মোরা জানি অত্যাচার ; নৃশংসতা পেয়েছি সতত
> পাইনি করুণা ;

অথবা 'পশ্চিমের ডাক' কবিতায়ঃ

> হে প্রিয়া প্রতীচী, তাই আজি তব তীব্র অভিশাপে
> অঙ্গার হতেছে হিয়া এ অকাল জরার আগুনে।

অবশ্যই সুধীন্দ্রনাথের এই সচেতনতা রাজনৈতিক চেতনাপ্রসূত, মহাযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত মূল্যবোধ সম্পর্কিত চেতনার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, অথচ এই চেতনাই (পরিবর্তিত মূল্যবোধ সম্পর্কিত) এলিঅটীয় নৈকট্য এনেছিল বাংলা কবিতায়।

'অ র্কে স্ট্রা'-য়ও 'রবীন্দ্রনাথের একাধিক পঙ্‌ক্তি···, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, এসে গেছেই' এবং সেটাই স্বাভাবিক। 'অ র্কে স্ট্রা'-র যুগেই এলিঅটীয় অনুচারণায় বাংলা কাব্যের মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে প্রমুখেরা, কিন্তু স্বীয় কাব্যে এলিঅটীয় কাব্য-বৈশিষ্ট্য কিংবা চেতনার অঙ্গীকরণ ঘটেছে তিরিশের দশকেই। বিশেষ ভাবে সময় চিহ্নিত করতে হয় যে-সময় বিষ্ণু দে রচনা করছেন 'চো রা বা লি'-র কবিতাগুলি, কিংবা সুধীন্দ্রনাথ 'ক্র ন্দ সী' ও 'উ ত্ত র ফা ল্গু নী'-র কবিতাসমূহ ঠিক সেই সময়ই অর্থাৎ ১৯৩৩-৩৪-এর দিকেই বাংলা কাব্যে এলিঅটীয় জোয়ারের ভর কটাল।

রবীন্দ্রনাথ এবং সেই সঙ্গে রোমান্টিকতা থেকে দূরে সরে আসা সম্ভব হয় নি ব'লেই 'অ র্কে স্ট্রা'-য় এলিঅটীয় কাব্য-বৈশিষ্ট্যও ভর করতে পারে নি।

দীর্ঘ দুই দশকের ব্যবধানে এই কাব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়েও কবি বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'বৈবিক উদ্ধৃতি এ-গ্রন্থের অনেক জায়গা জুড়ে আছে : এবং যেখানে সে-ঋণ ইচ্ছাকৃত, হয়তো সেখানেই আমার বক্তব্য বিশেষতঃ অতি-রাবীন্দ্রিক।'[৬০] 'কিন্তু রাবীন্দ্রিক-চেতনার সঙ্গে এলিঅটীয়-চেতনার সংমিশ্রণের সচেতন প্রয়াসও অনুভূত হয় যখন দেখা যায় 'বাংলা কবিতার পদলালিত্য এ-গ্রন্থে প্রত্যাখ্যাত ; এবং এতে রোমাণ্টিক সৌন্দর্যবোধের ব্যবহার বিরূপ বিশ্বের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে।' অতি অবশ্যই এই কাব্যের 'বিষয়বস্তুতে অবাস্তব কল্পনা' প্রশ্রয় পায় নি, ভাবাবেগ সংযতই করা হয় নি মনশীলতারও অবতারণা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এলিঅটীয় কাব্য-বৈশিষ্ট্য বাংলা কাব্যে অঙ্গীকরণের তথা রোমাণ্টিক ঐতিহ্য থেকে মুক্তির এই ভাবেই প্রথম সোপান নির্মিত হয়েছিল।

'ত ন্বী'-র মতো 'অ র্কে স্ট্রা'-য়ও কবির এলিঅটীয় নৈকট্য এতই ক্ষীণ যে একান্তই আকস্মিক বলে সংশয় জাগে। রোমাণ্টিকতায় কবিমানস আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দসুলভ হেমন্ত-চেতনা কবিকে পীড়িত করেছে। 'হৈমন্তী' কবিতায় ধূসরতার, রিক্ততার, জীর্ণতার, বিষণ্ণতার, নৈঃসঙ্গ্যের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে চ্যুত পত্রের কাল হেমন্ত।

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্তলোহিত,
তরুণতরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ণ বলাকা
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত ॥

অবশ্যই অনুরূপ হেমন্ত-চেতনায় পাশ্চাত্যের 'autamn' ছায়াবিস্তার করেছে, কিংবা মেলার্মের ছায়াপাতও এর উপর কষ্টকল্পনা নয় ; আমাদের কাছে মূল্যবান্ তথ্য এই হেমন্ত-চেতনায় এলিঅটীয ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, বন্ধ্যাত্ব এবং অনুর্বরত্বের দ্যোতক সুধীন্দ্রনাথের হেমন্তও। 'উ ত্ত র-ফা ল্গু নী'-র যুগে কবির বন্ধ্যাত্ব তথা অনুর্বরতাবোধক হেমন্ত-চেতনা আরো নিবিড় হয়েছে, ঘনীভূত হয়েছে যুদ্ধোত্তর কাল ও নাগর সভ্যতার বন্ধ্যা অনুভূতির প্রগাঢ়তায়।

'Portrait of a Lady' কবিতার সঙ্গে 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার পটভূমি ও আঙ্গিক সাদৃশ্যে বিস্ময়াবহ। বক্তব্য ও বর্ণনায় এলিঅটের সংহতি ও সংযম সুধীন্দ্রনাথে দীর্ঘায়িত ও প্রলম্বিত ব্যাপকতা পেলেও মূল সাদৃশ্য সুপ্রকট। কবিভাষ্য অনুযায়ী 'অ র্কে স্ট্রা' কবিতাটি 'কায়-মনের সপ্তপদী ; এবং তার

সাত কাণ্ড যেমন গতিমূলক পরাকাষ্ঠার সোপান পরম্পরা, তেমনই প্রত্যেক পর্ব আবার ত্রিবিধ উপলব্ধির তাৎক্ষালিক সমন্বয়। অর্থাৎ প্রতি ভাগে ঘুরে ঘুরে এসেছে রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য, শ্রাব্য ঐকতানের অতিশ্রুতি ব্যঞ্জনা, আর শ্রোতৃবিশেষের সমবায়ী ভাবানুষঙ্গ; এবং সমগ্র কবিতার ত্রিবেণীতে একদিনের সাত প্রহরব্যাপী অভিজ্ঞতাই কৈবল্যপ্রার্থী নয়, তাতে—সম্ভবত গ্রন্থের অন্যত্রও—বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরাত্মার, তথা লোকায়ত ও লোকোত্তরের, অবৈকল্যও অন্তত উহ্য আছে।'

এলিঅটের কবিতাটির আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য ও পটভূমি বর্ণনা সুসমঞ্জস। 'অর্কেস্ট্রা'-র মতো ব্যাপক উপস্থাপন না থাকলেও 'পোর্ট্রেট অব এ লেডী'-র প্রথম পর্বে যে-পরিবেশ বর্ণনা উপলব্ধ তাতে রঙ্গালয়ের নয়, 'কনসার্ট রুমের' আভাস পাওয়া যায়। ঘটনা এবং উক্তি-প্রত্যুক্তির পশ্চাৎপটে একটা শ্রাব্য ঐকতানের ব্যঞ্জনাও বিদ্যমান।

—And so the conversation slips
Among velleities and carefully caught regrets
Through attenuated tones of violins
Mingled with remote cornets
And begins.

কিংবা,

Among the windings of the violins
And the ariettes
of cracked cornets
Inside my brain a dull tom-tom begins
Absurdly hammering a prelude of its own,

এই ঐকতান'টি পার্টি কিংবা 'ককটেল পার্টি' যেখানকারই হোক না কেন, এর সঙ্গে 'অর্কেস্ট্রা-'র প্রতি পর্বের সূচনার ঐকতান বর্ণনার সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না, বিশেষতঃ সপ্তম পর্বের সূচনার :

উদাত্ত বিষাণ উৎসরিল ঊর্ধ্বগ আহ্বান ; মুগ্ধ
বেণু, দীর্ঘায়িত মিনতির সুরসূত্র টানি, বেঁধে
দিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংযোগের রাখি ; আবিষ্ট মূর্ছনা,
উদ্বেল অন্তর হতে, উত্তরিল বেহালার তারে ;
ত্রিপথগা সুরধুনী, অর্গানের শঙ্খনাদে জেগে,

চরাচর ডুবাল উর্বর মোক্ষে।

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ঐকতান বাদন শুনতে শুনতে পার্শ্ববর্তী 'নাগর-নাগরীর' প্রেম-কূজন কানে ভেসে আসতেই কবির মনে প্রণয়স্মৃতি জেগেছে, মনে পড়েছে বিদেশিনী প্রেমিকার কথা। 'অর্কেস্ট্রা'-র এ-কাহিনীর সঙ্গে একটা দূর সাদৃশ্য আছে এলিঅটের কবিতাটির। যে-প্রেমকাহিনী নিয়ে কবিতাটি রচনা করেছেন এলিঅট তার সূত্রপাত সঙ্গীতের মাধ্যমেই। তাই ঘুরে-ঘুরে এসেছে বাদ্য ও সাঙ্গীতিক মূর্ছনার কথা। অর্কেস্ট্রা'-র ব্যর্থ-প্রণয়ের হতাশ্বাস 'পোর্ট্রেট অব এ লেডী'-র অনুরূপ ঃ

মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাথী।
Now that we talk of dying—
And should I have tne right to smile ?

এলিঅট-বন্ধু কনরাড আইকেন এই মহিলাটিকে হার্ভার্ডবাসিনী তাঁদের এক বান্ধবী ব'লে সনাক্ত করেছেন।[৬২] এই ইঙ্গিত থেকে যেমন এই কবিতায় এলিঅটের তেমনি 'অর্কেস্ট্রা' থেকেও কবি সুধীন্দ্রনাথের জীবনের একটা দিক আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষা করা যায় না।

মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে,—
আমার অমরা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।

এই 'শ্রোতাবিশেষের সমবায়ী ভাবানুষঙ্গ' কোনো প্রণয়-স্মৃতি জুগুপ্সার আলম্বন কি না কে জানে![৬৩]

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল ও পরিবেশ সম্পর্কিত ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনার ক্ষীণ আভাস ঃ

একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের 'পরে,
সামনে মরু অস্থিসমাকুল।
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিল আজকে মোরে;
অস্তমিত বিধির আমি ভুল।

কাকতলীয় হ'লেও কবিতাটির উপসংহার কি আসে নি 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-সুলভ শান্তির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায়?

অলক্ষ্যে কখন পার্শ্ব হ'তে প্রেমিক-প্রেমিকা চ'লে
গেছে অমৃত সংকেতে। শান্তি-শান্তি-শান্তি চারিধারে!
কেবল অন্তর মোর উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকারে।

'ক্রন্দসী' এবং 'উত্তরফাল্গুনী' দু'টি কাব্যগ্রন্থই সর্বাধিক এলিঅটীয়-চেতনা প্রভাবিত। 'অর্কেস্ট্রা'-য় সুধীন্দ্রনাথ হঠাৎই ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনায় উপনীত হয়েছিলেন, সম্ভবতঃ এলিঅটীয় রচনার সাহচর্যেই। রোমান্টিক মোহাঞ্জন মুছে গিয়ে জগতের রূঢ় বাস্তব রূপটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল 'ক্রন্দসী'-র যুগে, নারকীয় পরিবেশের উপলব্ধিতে (রোমান্টিক স্বপ্নে অভ্যস্ত) অন্তরাত্মা ডুকরে উঠল। নামকরণে তারই ইঙ্গিত অনুমিত হয়।

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত নরকের কীট;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে। ('নরক')

কবির এতদিনকার বিশ্বাস ভেঙে পড়েছে, আস্থা হারিয়েছেন সেই সমস্ত মূল্যবোধে যা তিনি এতদিন আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং তাঁর অগ্রজেরা তাঁকে দিয়েছিলেন যার উত্তরাধিকার। যুদ্ধোত্তর মানুষেরা বাস করছে ইঁদুরের গর্তে এরকম এক প্রতীক কল্পনা করেছিলেন এলিঅট, সুধীন্দ্রনাথের নারকীয় পরিবেশ কল্পনায় মণ্ডূক, মূষিক, পেচক, বাদুড়ের সমাবেশে আরো বীভৎস।

যতই পালাতে চাই অভেদ্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে,
চরে যেথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর,
পঙ্কিল মণ্ডূক আর মূষিক তস্কর,
বজ্রনখ পেচক, বাদুড়…

এরকম উপলব্ধি পূর্বে ঘটে নি, রোমান্টিক উপলব্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে পৌঁছেছেন কবি।

বমন বিধুর
আমার অনাত্ম্য দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর।···
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।

কবির রোমাণ্টিক চেতনা কতখানি আমূল পরিবর্তিত তা 'অ কে' স্ট্রা'-র সঙ্গে তুলনা করলেই স্পষ্ট ধরা পড়বে। 'অ কে' স্ট্রা'-য় কবির রোমাণ্টিক চেতনা ছিল রাবীন্দ্রিক সুরে বাঁধা।

জানি, আরও জানি
তোমার ক্ষণিক প্রেমই অন্তিমের অব্যয় পারানি,
উপরন্তু ধরা,
তোমার উপমা ব'লে, মোর চক্ষে এখনও সুন্দরা। ('অনুষঙ্গ')

'ক্র ন্দ সী'-তে সম্পূর্ণ বিপরীত সুর আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করলেও তা নির্মম সত্য।

মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী,

কিংবা,

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি। ('নরক')

সুধীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক চেতনা অনুরূপ ভাবে বিপর্যস্ত হ'লেও ধ্রুপদী-চেতনা এসে শূন্যতাটুকু ভরিয়ে তোলে নি। বস্তুতঃ এলিঅটীয় ধ্রুপদী-চেতনা সুধীন্দ্রনাথে কোনোদিনই আসে নি একথা এই আলোচনার গোড়াতেই বলেছি। 'ক্র ন্দ সী'-তে ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনা, বন্ধ্যাত্ব-চেতনা, নাগরিক-চেতনা, রূঢ় বাস্তব-চেতনা, নরক-চেতনা প্রভৃতি বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ এলিঅটীয় নৈকট্যে উপনীত হয়েছেন। প্রথম কবিতা 'উটপাখী'-র প্রারম্ভই ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনা দিয়েঃ

কোথায় লুকাবে? ধু ধু করে মরুভূমি;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;

নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।

ওয়েস্টল্যান্ড-চেতনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব-চেতনা এসেছে পরবর্তী স্তবকেই।

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপকে যেমন সভ্যতার 'পোড়ো জমি' মনে হয়েছিল, সুধীন্দ্রনাথের মনেও অনুরূপ সচেতনতা কখনো-কখনো জেগে উঠেছে। 'উটপাখী'-র দুটি চরণে এর স্পষ্ট আভাস আছে :

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার,

ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে 'প্রতক" কবিতায়ও :

উৎসার্গ হয়েছে নদী, বর্জিত এ-শ্মশানসৈকতে
নির্বিকার ঊষরতা শুধু,
যতদূর দৃষ্টি যায় করে ধূ ধূ
ভ্রাম্যমাণ পিঞ্জরের দুর্লঙ্ঘ্য প্রসার
নিঃসঙ্গ, নির্বাক, নিরাকার।

'কাল' কবিতায় এই চেতনার পাশাপাশি বন্ধ্যাত্ব-চেতনাও ঠাঁই পেয়েছে :

স্তব্ধ রাতে
শোকাবহ শিশিরসম্পাতে
মোর ফণিমনসায় ধরিল যে-অপুষ্পক শীষ
এ-বিস্মৃত মরুভূর অনামিক কোণে,
ধ্বংসসার, দুর্গম নির্জনে,...

এলিঅটসুলভ নাগরিক চেতনা অর্থাৎ আধুনিক শিল্পকণ্টকিত নাগরিক সভ্যতায় জীবনীশক্তি ফুরিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত সচেতনতা ফুটেছে 'প্রতীক' কবিতায় :

মিলের ধোঁয়ায় ঢাকা নীল নভস্তল,
নগরের আবর্জনা জাহ্নবীর পুণ্য স্রোতে ঘুরে।
ছুটি-পাওয়া মসিজীবী দল বেঁধে করে কোলাহল,
পরিক্ষিপ্ত পরচর্চা বিষায়িছে বিমুক্ত বায়ুরে।

'উত্তর ফাল্গুনী'-র যুগে অর্থাৎ উত্তর-বসন্তে, কাব্যধারার ইতিহাসে উত্তর 'ক্রন্দসী'-যুগে, সুধীন্দ্রনাথ আবার ফিরে গিয়েছিলেন রোমান্টিকতায়, ধরা দিয়েছিলেন প্রেয়সীর নিবিড় বাহুবন্ধনে, ফিরে পেয়েছিলেন এরকম আত্মবিশ্বাস—

দ্বেষ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন, অপ্রত্যাশী মোর অন্তস্তল
জগতেরে ক্ষমা ক'রে লভিয়াছে জগতের ক্ষমা,
আবার পেয়েছে খুঁজে নবজাত সৃষ্টির সুষমা।

সেই সঙ্গে মর্ত্যপ্রীতিতেও হয়েছে অন্তর উদ্বেলিত।

কেমনে তাদের বলি নই আমি অমরাবিলাসী,
মর্ত্যের সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অন্বিষ্ট আমার ; ···

কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ক্রন্দসী'-র বন্ধ্যাত্ব-চেতনা, ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনা প্রভৃতি ছায়া ফেলেছে 'উত্তর ফাল্গুনী'-রও কয়েকটি কবিতায়, সম্ভবতঃ উভয় কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি প্রায় সমসাময়িক কালে রচিত ব'লেই। 'শর্বরী' কবিতায় এলিঅটীয়-চেতনার প্রকোপ খুব বেশি। বহু শতাব্দীর সৃষ্ট ওয়েস্ট ল্যান্ডের ছবি এঁকেছেন কবি এখানে—

অনেক শতাব্দী কাটে। প্রকীর্তিত সে-কন্দরে ক্রমে
বাদুড় বানায় বাসা ; কালপেঁচা আনাচে-কানাচে
ইঁদুরের ধ্যান করে ; কোণে কোণে অর্ধভুক্ত শব্দ
লুকায় হিসাবী শিবা ; ভূমিসাৎ বিগ্রহের কাছে
মহীলতা জোট বাঁধে ; মধ্যে মধ্যে তুষ্ট জরদশ্ব
জুড়ায় অম্লের জ্বালা কণ্টকিত দ্বারদেশে ব'সে।
তাদের পুরীষে, ক্লেদে অতীতের সার্থক প্রতীক
চাপা পড়ে নিরন্তর ; নোনা লেগে চূর্ণলেপ খ'সে
হাসে অস্থিসার শিলা।

'প্রতিপদ' কবিতায় অনুরূপ চেতনার সঙ্গে বন্ধ্যাত্ব-চেতনাও জড়িয়ে আছে।

শত শ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমুমে,
বন্ধ্যা ফণিমনসার কণ্টকিত, বিষাক্ত, ধূসর ;
পরিত্যক্ত মীনরাজ্য, নিঃসলিল তরঙ্গে ঊষর ;—
নিরিন্দ্রিয় মহাশূন্য, উদাসীন উদ্বায়ী মসৃমে।

'শর্বরী'-তে বন্ধ্যাত্ব-চেতনা এসেছে বন্ধ্যাত্বের প্রতীক হেমন্তের আলম্বনে 'অর্কেস্ট্রা'-র 'হৈমন্তী'-র মতোই।

সহসা হেমন্ত-সন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে
বিরহের অবরোধে হয়েছিল মিলন স্বগত ;···
অঘ্রাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক ;
পথলুপ্ত কেলিকুঞ্জে পড়ে যদি পড়ুক তুহিন ;
শুষ্ক সরোজিনী ছেড়ে উড়ে যাক সপ্তসিন্ধু পারে
যাযাবর রাজহংস পুলকিত কুলায়ের খোঁজে ;

'বিলয়' কবিতাতেও অনুরূপ হেমন্ত-চেতনা—

উত্তর হাওয়ার স্পর্শে ত্রস্ত হাতে অর্গল সন্ধানি
যে-দিন শুনিবে তুমি পাতাঝরা হিম নিরালোকে
ফেরে মাতামাতি ক'রে আগন্তুক মৃত্যু আর ক্ষয়,···

'শর্বরী' কবিতায় যে অনুর্বরতার ছবি কবি এঁকেছেন তার সঙ্গে এলিঅটের 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর অনুরূপ অনুর্বরতার ছবির সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান !

সুখশ্রান্ত ধনী নাগরিক
ক্বচিৎ সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে
পণ্যস্ত্রীর হাত ধ'রে ; আহারান্তে রংমশাল জ্বেলে
ভিত্তিগাত্রে চেয়ে থাকে, কলঙ্কিত কবন্ধ যেখানে
দলে বৈদেহীর উরু ; ছেঁড়া পাতা ভাঙা টিন ফেলে
সায়াহ্নে শহরে ফেরে ।

এর পাশাপাশি 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর প্রাসঙ্গিক অনুর্বরতার ছবিটা তুলে দেওয়া যেতে পারে ঃ

The river's tent is broken the last fingers of leaf
Clutch and sink into lhe wet bank. The wind
Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.
Sweet Thames, run softly, till I end my song.
The river bears no empty bottles. sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed.

And their friends, the loitering heirs of city directors,
Departed, have left no addresses.

'সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থটি বাংলা কাব্যের ইতিহাসে নূতন ধারার ইঙ্গিত বহন ক'রে এনেছিল কি না সে সম্পর্কে অনেকেরই সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থে কবি যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফিরেছেন সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়ার মতো যথেষ্ট যুক্তি আছে। কবির প্রতীক কবিতা রচনার বিশিষ্ট প্রবণতা 'সংবর্ত' কাব্যেই বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে। বিষয়বস্তুর একমুখী মন্ময়তা থেকে বহুমুখী হওয়ার প্রবণতা আর প্রতীক ধর্মিতার ওপর ভর ক'রেই সম্ভবতঃ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিও এসেছে। নানা বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথের গভীর আগ্রহ থাকলেও কবিতায় তা ধরা পড়তে দেখা যায় নি 'তন্বী' থেকে 'উত্তর ফাল্গুনী' পর্যন্ত, সমসাময়িক ঘটনা কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর কবিতা ছিল অদ্ভুতভাবে উদাসীন। এতদিন ধ'রে কবিতায় যে-স্বাতন্ত্র্য এনেছিলেন, যে-জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তার বেষ্টনী অতিক্রম ক'রে 'সংবর্ত'-র যুগেই প্রথম সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, আন্দোলন প্রভৃতি তাঁর কবিতায় ঠাঁই ক'রে নিল। স্পেনের যুদ্ধ, চীন ও রাশিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতির ছায়া অনুভূত হল নানা কবিতায়। সে-কারণেই বিভিন্ন এলিঅটীয় চেতনা এই যুগে আর তাদৃশ অনুভূত হয় না, কেবল কয়েকটি কবিতার প্রতীক সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

স্পেনের যুদ্ধের পটভূমিকায় ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনার আভাস আছে 'নান্দীমুখ' কবিতায়।

তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে ;
নতুবা নগর, তথা প্রান্তর,
ভ'রে রবে বাসী শবে।
অশক্য পিতা ; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন :
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।

'উপসংহার' কবিতায়ও এর আভাস আছে। এলিঅটীয় ঔপনিষদ আস্তিক্য-বিশ্বাস কিংবা 'নান্দীমুখ'এর মতো এই কবিতারও এক বিশ্বাসের মধ্যে স্বতঃই ধরা দিয়েছেন কবি।

প্রনষ্ট পৃথিবীর প্রান্তে তমিস্রার লজ্জা বস্ত্রে আজ
এসো নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাকি।
রক্তে কিংবা অশ্রুপাতে নিষ্কলঙ্ক হবে না সমাজ।
কেন তবে তাকে মনে রাখি?
মানবের অগ্রজেরা আমাদের মর্যাদা শেখাবে;
ছায়া দেবে বনস্পতি; শৈলশ্রেণী যোগাবে নির্ভর:
সভ্যতার অভিশাপে প্রস্তাবিত অর্ধনারীশ্বর
স্বপ্নদুষ্ট ক্লৈব্য থেকে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাবে।

'জেসন' কবিতার প্রতীকের সঙ্গে 'মারিনা' কবিতার প্রতীকের একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য অনুভূত হয়।

আমগ্ন তরণী ছেড়ে, ঝাঁপাতে পারি না তবু জলে।
বিফল কৌশলে
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি; ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই;
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই।
ভুলে যাই একা আমি; সঙ্গে ছিল যারা,
প্রলুব্ধ বন্দরে কিংবা পথকষ্টে আজ আত্মহারা,
কে কোথায় পড়ে আছে, জানি না ঠিকানা।

অথবা,

তবে কী বিশ্বাসে
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি, ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই,
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই,
মনে ভাবি
এ-ক'খানা জীর্ণ কাঠে অস্মিতার অসম্ভব দাবি
আবার প্রতিষ্ঠা পাবে সপ্তসিন্ধু পারে?

সামগ্রিক প্রতীক সাদৃশ্য ছাড়াও উপযুক্ত চরণগুলি 'মারিনা'-র নিম্নলিখিত অংশের প্রতি ইঙ্গিত করে:

Bowsprit cracked with ice and paint cracked with heat.
I made this, I have forgotten
And remember.
The rigging weak and the canvas rotten
Between one June and another September.

Made this unknowing, half conscious, unknown, my own
The garboard strake leaks, the seams need caulking.
This form, this face, this life
Living to live in a world of time beyond me ; let me
Resign my life for this life, my speech for that unspoken
The awakened, lips parted, the hope, the new ships.

'জেসন' এবং 'সংবর্ত' কবিতাদ্বয়ের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে এলিঅটীয় ধারায় সৃষ্ট পার্সোনা এদের আলম্বন। এবম্বিধ পার্সোনাভিত্তিক কবিতা সম্ভবতঃ 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থেও খুব বেশি নেই এবং তার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা রচনায় কবি অভ্যস্ত ছিলেন না। সুধীন্দ্রনাথের মন্ময়ধর্মী বিশিষ্ট কাব্যস্বভাব অনুরূপ কাব্যসৃষ্টির বিরোধী ছিল এরকম মন্তব্যও সত্যের অপলাপ নয়। পার্সোনা বিচারেই 'সংবর্ত' কবিতাটির গভীর সাদৃশ্য এলিঅটের 'দি লাভ সঙ অব জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক' কবিতার সঙ্গে। উভয় কবিতাতেই নায়ক বা যার জবানিতে রচিত সেই উত্তমপুরুষ চরিত্রটি কল্পিত হয়েছে স্বাস্থ্যহীন শ্রীহীন হতাশাগ্রস্ত বৃদ্ধ রূপে। প্রুফ্রক আভিজাত্যের হাস্যাস্পদ ছায়া মাত্র, বার্ধক্যে শ্রী সম্পদ আভিজাত্য প্রণয় সর্বক্ষেত্রে অসহায় এবং করুণার পাত্র। বর্তমানে অতীত সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির পীড়াদায়ক স্মৃতির ভারবাহী মাত্র। প্রজন্মের ব্যবধানে প'ড়ে আজ নিজেকে বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। 'সংবর্ত'-র নায়কের অবস্থাও ঠিক তাই। হতাশাগ্রস্ত বার্ধক্যে এসে শ্রী এবং স্বাস্থ্য হারিয়েছে। আভিজাত্য গেছে, প্রণয়ও গেছে ; অক্ষম জীবনে এখন একমাত্র সম্বল স্মৃতি রোমন্থন ও ষষ্ঠ রিপু মাৎসর্য। অপরের সমৃদ্ধিতে তার অন্তঃকরণ পরশ্রীকাতরতায় ভ'রে ওঠে, অপরের প্রণয়-দৃশ্য কল্পনাতে ঈর্ষান্বিত হয়। এলিঅটের প্রুফ্রকের সঙ্গে তার মূল পার্থক্য যুগের। প্রথম মহাযুদ্ধেরও পূর্ববর্তী কালে রচিত ব'লে প্রুফ্রকে যুদ্ধ, রাজনীতি বা ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াপাত ঘটে নি ; অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা ও চরিত্রের ছায়াপাত সুপ্রচুর। তাছাড়াও অতীত প্রণয়ের স্মৃতি রোমন্থন প্রুফকের তুলনায় অনেক বেশি। আস্তিক্যবোধের আলম্বন 'সংবর্ত'-তে আছে, প্রুফ্রক-এ নেই। 'সংবর্ত'-র এই চরণগুলির ওপর এলিঅটের প্রুফ্রক-এ ছায়াপাত অস্বীকার করা যায় না :

· ··· ভুলে যাই
উত্তরচল্লিশ আমি ; উদ্‌গ্রীব হয়েও যদি চাই,
তবু গলকম্বলের থর
মুকুরের অধিকাংশ জোড়ে ; নতোদর
লুকায় পায়ের ডগা অধোমুখে কদাচিৎ তাকালে ;
স্থানবিনিময় করে চাঁদিতে কপালে,
চুলের প্রলাপ ওড়ে নামমাত্র বাতাসে যখন।

সংশ্লিষ্ট প্রুফ্রকের চরণগুলি :

Time to turn back and descend the stair,
With a bald spot tn the middle of my hair—
[They will say : 'How his hair is growing thin !']
My morning coat, my collar mounting firmly to the chin,
My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin—
They will say . 'But how his arms and legs are thin !']
I grow old···I grow old···
I shall wear the bottoms of my trousers rolled
Shall I part my hair behind ? Do I dare to eat a peach ?

'যযাতি' কবিতার সঙ্গে 'Gerontion'-এর সাদৃশ্য আছে এমন সংশয় অযৌক্তিক নয়। যযাতি পৌরাণিক চরিত্র, জরা উত্তরণের বিশিষ্ট একটি কাহিনী এই চরিত্রটিকে আশ্রয় ক'রে আছে। তাই বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ উভয়েই জরা বা জরা উত্তরণের প্রতীক রূপেই যযাতিকে গ্রহণ করেছেন। লক্ষণীয় 'Gerontion' কবিতার অনুবাদের বিষ্ণু দে-প্রদত্ত নামকরণ 'জরায়ণ'। তাই 'যযাতি'-র সঙ্গে ঐ কবিতার তুলনা অসঙ্গত হতো না যদি সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় পুরোপুরি প্রতীকধর্মিতা বজায় থাকত এবং নৈর্ব্যক্তিক পার্সোনা সৃষ্টি করতেন কবি। কিছু সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত ছোঁয়া থাকায় যযাতি কবিতাটি প্রতীক দ্যোতনা হারিয়েছে।

এলিঅটের প্রুফ্রক কবিতায় কিংবা 'জেরনশান' অথবা 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এ যে বিশ শতকীয় নৈঃসঙ্গ্যবোধ ধরা পড়েছে তাতে সুধীন্দ্রনাথও মর্মান্তিক পীড়িত ছিলেন। নিঃসঙ্গ ব্যক্তিজীবন থেকেই সম্ভবতঃ তাঁর কাব্যে এই বোধ সঞ্চারিত হয়েছিল [৩৪] এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বভাবের জন্যই তিনি স্পষ্টতঃই ঘোষণা করেন—

ভিড়ের সংসর্গ মোরে করে সদা নৈঃসঙ্গ্যবিব্রত। ('প্রতীক', ক্র ন্দ সী)

'প্রত্যাখ্যান' ('ক্র ন্দ সী') কবিতায় স্বীয় ব্যক্তিস্বভাব সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ঘোষণা কবির:

সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি।
প্রণয়ের মমত্ববন্ধনে,
পতঙ্গের সাম্যবাদে, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দনে,
হে ভৈরব, জীবন দুঃসহ।

নৈঃসঙ্গ্যের অসহায় করুণ দিকটি উদ্‌ঘাটিত 'পরাবত' কবিতায়।

কেবল আদিম জাড্য প্রাথমিক মাৎস্যন্যায়ে মিলে,
সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টিরে সংহারে;

সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই নিঃসঙ্গতার আভাস আছে। 'উটপাখী', 'যযাতি', 'সংবর্ত' প্রভৃতি প্রতীক কবিতায়ও নৈঃসঙ্গ্য উঁকিঝুঁকি মারছে যেন। যদিচ নাটকীয় চরিত্রের স্বভাব ও বক্তব্য নাট্যকারে আরোপ অনুচিত, তথাপি বিপরীত নিদর্শন অসুলভ নয় বলেই প্রুফ্রক, জেরনশান প্রভৃতির নৈঃসঙ্গ্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে 'দি ক ক টে ল পা র্টি'-র celia-র সংলাপে এলিঅটের নিঃসঙ্গতাবোধের আরোপ অসমীচীন নাও হ'তে পারে।

What has happened has made me aware
That I've always been alone. That one always is alone.
...it isn't that I 'want' to be alone,
But that everyone's alone — or so it seems to me.
They make noises and think they are talking to each other;
They make faces, and think they understand each other.
And I'm sure that they don't't[৬৫]

'প্রতীক্ষা' কবিতায় ('দ শ মী') নৈঃসঙ্গ্যবোধের যে আর্তনাদ তাতেও যেন উপর্যুক্ত এলিঅটীয় বক্তব্যেরই অনুরণন:

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই;
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

কবিতাটিতে ওয়েস্ট ল্যান্ড এবং বন্ধ্যাত্ব-চেতনাও অনুভূত হয়:

বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধু ধু করে;

নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে ;
যা ছিল বলার, কবে হ'য়ে গেছে বলা সে।

কাব্যরীতিতে সুধীন্দ্রনাথ যে-স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন কিংবা যে-নিজস্ব কাব্যজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তার পশ্চাতে তাঁর দীর্ঘ অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, প্রস্তুতি এবং সনিষ্ঠ অনুশীলন ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রাচীন-অর্বাচীন বহু কবির প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ কাব্যরীতি ও কাব্যজগতের সমন্বয়ে স্বীয় কাব্যরীতি তথা কাব্যজগৎ গড়ে তুলেছিলেন তিনি। কাব্যতত্ত্ব এবং দর্শনের ক্ষেত্রে নানা কবির অনুপ্রেরণা অবশ্যই ছিল। এই অনুপ্রেরণা বা ছায়াপাত থেকে এলিঅটের অংশটুকু বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। একদিকে তিনি ক্রোচের মতো উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈতসিদ্ধির সাধক, অন্যদিকে বিতর্কিত হ'লেও একথা বলতে দ্বিধা করেন নি, যে, 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট : আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ।' অনুরূপ ভাবেই এলিঅটের কয়েকটি কাব্যতত্ত্বের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায় সুধীন্দ্রনাথের। এলিঅটীয় বিশিষ্ট কাব্যরীতি সম্পর্কে তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, 'বিশ বৎসর যাবৎ আমি···জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই'। কাব্যে কথ্যরীতি প্রবর্তন অর্থাৎ কাব্যকে মুখের ভাষার সান্নিধ্য দেওয়ার সাধনা কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সুধীন্দ্রনাথ 'বিশ বৎসর যাবৎ' অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল থেকে, কাব্য-বিচারে 'ক্র ন্দ সী'-র যুগ থেকে, এই সাধনায় নিরত ছিলেন। কাব্যে ধ্রুপদী রীতির মূল লক্ষণগুলি যেমন 'নিজের প্রতি নিরাসক্তি', 'উচ্ছ্বাসসংবরণ' কিংবা 'ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মূল্য' সম্পর্কে সৈদ্ধান্তিক সচেতনতা তাঁর ছিল। ধ্রুপদী রীতির সমর্থক হিসেবে তিনি কবিকর্মে সিদ্ধিকে স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর রূপে দেখেছিলেন এবং এলিঅটীয় দৃষ্টান্তে সুধীন্দ্রনাথও আবেগ মুক্তিতে কেবল 'কাব্যের মুক্তি'ই কল্পনা করেন নি, কাব্যসাধনাকে মনন ও বৈদগ্ধ্যের সমাপতনে ঐকান্তিক সংকল্প ও অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের কারুকর্মিক সিদ্ধির পরাকাষ্ঠারূপেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সময়-চেতনা এবং ইতিহাস-চেতনাভিত্তিক কাব্যরচনা করতে গিয়েই সুধীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী যুগকে কাব্যে অঙ্গীকার করেছেন 'স ং ব র্ত'-এর পর্যায়ে। তবে যেমন ক্রোচে বা মালার্মে-র রীতিতে সার্বিক সিদ্ধি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে অধিগত হয় নি, তেমনি এলিঅটীয় রীতি ও কাব্যতত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিকতা, আবেগ-সংহরণ তথা বস্তুনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেও

পরম সিদ্ধি তাঁকে এড়িয়েই গেছে।

সুধীন্দ্রনাথ 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে' যে-দার্শনিক মতে উপনীত তা 'প্রাচীন' ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ'; 'উপস্থাপন' ('দ শ মী') কবিতায় স্বীয় দার্শনিক বিশ্বাস সম্পর্কে নির্দ্বিধ ঘোষণা তাঁর ঃ

আমি ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জের, সে-সংসারও। অথচ সময় ভূত
থেকে ভবিষ্যতে ধাবমান নয়, এবং যদি বা
তার সাক্ষ্য থাকে অন্ধের কি নাড়ীতে, তবু সে-নিভৃতে
হৃদয়বানের মতো, বুভুক্ষুও নিষিদ্ধ প্রবেশ।

এই দার্শনিকতার পশ্চাতে এলিঅটের সমর্থন ছিল এমন কথা বলা চলে না। এলিঅট আশ্রয় পেতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিকতা এবং নিরবচ্ছিন্ন কালের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু এলিঅটীয় 'পার্গেটোরি'-বিশ্বাসে সুধীন্দ্রনাথ আস্থাবান ছিলেন অবশ্যই, যুদ্ধকেই তিনি মানব সভ্যতায় শুদ্ধির উপায় ব'লে গ্রহণ করেছেন:

ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তাণ্ডবে। ('নান্দীমুখ'/স ং ব র্ত)

৫.

'ক ল্লো ল' কবিগোষ্ঠীর অনেকেই গদ্যে-পদ্যে সংশয়াতীত সাফল্যের নজীর রাখলেও এলিঅটসুলভ সৃষ্টি-প্রতিভার বহুমুখীনতায় বুদ্ধদেব বসু অনন্য। গদ্যে-পদ্যে তাঁরও এলিঅটের মতোই সব্যসাচী-দক্ষতা, অবিসংবাদিত সাফল্য। প্রথম জীবনে কাব্যে, প্রবন্ধে এবং সমালোচনায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর সাহিত্যজীবনের অপরাহ্নে বুদ্ধদেব বসুও পরীক্ষা-নিরীক্ষা-মূলক নাট্যকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। বরং বৈচিত্র্যের বিচারে এলিঅট অপেক্ষা বুদ্ধদেব বসুর পাল্লাই কিঞ্চিৎ ভারী। সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা কথা সাহিত্যে এলিঅটের পদপাত ঘটে নি, বুদ্ধদেব বসু তাতেও অপ্রতিহত গতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে বুদ্ধদেব বসুর

সমধিক খ্যাতি কবিরূপে, এলিঅট যুগপৎ কবি এবং সমালোচক। এলিঅট কাব্য এবং সমালোচনায় (কাব্যনাট্যেও) অবশ্যই নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টির শরিক, বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে এমন দাবী সর্বাংশে যৌক্তিক নয়। অবশ্যই এও বাহ্য, এই দুই কবির মূল বৈসাদৃশ্য কৃতি কিংবা বৈচিত্র্য এবং প্রতিষ্ঠার নিরিখে বিচার্য নয়, বিচার্য কবিস্বভাবে এবং কাব্যরীতিতে। সুধীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা কবিস্বভাবে আর বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিকতা কবিস্বভাব এবং কাব্যরীতি উভয়তঃ। নির্দ্বিধায় বলা চলে, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, এমন কি জীবনানন্দও, যখন রবীন্দ্রনাথের অনপনেয় ছায়ায় স্বাবলম্বনের বিবর্তনে ব্যস্ত, তখনও বুদ্ধদেব বসু রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতার জের টেনে চলেছেন।[৬৬] অন্যেরা যে-কালে সমাজের নিচুতলায় রূঢ় বাস্তব কুৎসিত জীবনে আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তিভূমি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত (অগ্রণী ভূমিকা যুবনাশ্ব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির), বুদ্ধদেব বসু আধুনিক সাহিত্যের এই বিশেষ যুগলক্ষণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও[৬৭] সেকালে গুটিপোকার মতো বন্দী স্বসৃষ্ট রোমান্টিকতার কাব্য-জালে। তথাপি তিনি আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর সম্পাদিত প্রথমে 'প্র গ তি'ও পরে 'ক বি তা'-কে কেন্দ্র ক'রে আধুনিক বাংলা কবিতার মূল ধারাটাই আবর্তিত হয়েছিল; তাই, এলিঅটের সঙ্গে কাব্য-নৈকট্য অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হ'লেও এবং অন্যান্যের তুলনায় এলিঅট দ্বারা কম প্রভাবিত হ'লেও এই পরিচ্ছেদের নামকরণে বুদ্ধদেব বসুকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

এলিঅটের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-নৈকট্য কবিস্বভাবে নয়, কাব্য-রীতিতেও নয়, নিতান্তই কাব্যপ্রকরণে। ভাবলেও অবাক হ'তে হয় 'ব ন্দী র ব ন্দ না'-য় বন্দীদশা থেকে যে-মুক্তির উদগ্র কামনা ফুটে উঠেছে তা কাব্যের মুক্তি কিংবা রোমান্টিক আবেষ্টনী থেকে মুক্তির কামনা নয়; তিনি মুক্তি চাইছেন বিধি-নির্দিষ্ট মানবিক যৌন-জীবনের বন্দীত্ব থেকে। তিরিশের দশকে রূঢ় বাস্তবতা বাংলা কাব্যকে অধিকার করেছিল (সামগ্রিক বিচারে বাংলা সাহিত্যকেই)। এ-সময়েই বাংলা কবিতায় এলিঅট-চারণারও প্রাদুর্ভাব। কিন্তু এই দুই উপসর্গে বুদ্ধদেব বসু আক্রান্ত হন নি সে-সময়। রূঢ় বাস্তবতা তাঁর কাব্যে এসেছে আরো দু-দশক পরে, যখন তাঁর সতীর্থরা সে-স্তর অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গেছেন প্রতীক কবিতার দিকে। তাঁর কাব্যে এলিঅটীয় প্রকরণ (অংশতঃ উপাদানও) সুপ্রকট হয়েছে একেবারে পঞ্চাশের দশকের প্রাক্কালে 'শী তে র প্রা র্থ না : ব স ন্তে র উ ত্ত র'-এর যুগে।

রবীন্দ্র-কাব্যকলার ঐতিহ্য-ছায়ায় যাঁদের অভ্যুদয় সেই সমস্ত রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ সম্পর্কে মোক্ষম মন্তব্য করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, 'তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ।'[৬৮] 'গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মকরূপে প্রতারক' এ হেন সচেতনতার অধিকারী হ'য়েও 'রবীন্দ্রনাথের অনতি-উত্তর' কবিদের মতোই রাবীন্দ্রিক রোমাণ্টিক ঐতিহ্যে ধরা দিয়েছিলেন কবিস্বভাবের গুণেই। তাই তাঁর কবিজীবনের গোড়ার দিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে বিশুদ্ধ আবেগের কবিতার প্রাধান্য। আর একটা দিকও অবশ্য আছে। যুগের বিচারে তিনি অবশ্যই রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি, তাঁরই পাশাপাশি সতীর্থ কবিরা রবীন্দ্র প্রভাব অতিক্রমণে বদ্ধপরিকর, এতদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের কাব্য-ঐতিহ্য হাতড়ে যুগপৎ অনুপ্রেরণা তথা ভিন্নতর স্বাদ ও ঐতিহ্যসৃষ্টির সজ্ঞান প্রয়াসেও তাঁরা অ-পরাঙ্মুখ। এই পরিবেশে পড়েই বুদ্ধদেব বসু মাঝে-মাঝে সজ্ঞানে পাশ্চাত্যমুখী (লরেন্স-হুইট্‌ম্যান্‌-বোদলেয়ারপন্থী), আবার কখনো বা কুৎসিত বাস্তবের বস্তুনিষ্ঠতার অভিমুখী। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা চলে স্বভাবজ রোমাণ্টিক প্রবণতাকে চাপা দিয়ে জোর ক'রে রোমাণ্টিক ঐতিহ্য-বিরোধী হ'তে চেয়েছেন। অবশ্য তিনি একই কবিস্বভাবের আধারে রোমাণ্টিক ও ধ্রুপদী-প্রবণতার সহাবস্থানে বিশ্বাসী।[৬৯]

'অমৃতের তরে' যে-কবির 'অপার পিপাসা' কিংবা যাঁর 'সুন্দরের ধ্যান' বাস্তবের কুৎসিত রূঢ়তায় বারে-বারে ভেঙে যায় ব'লে ক্ষোভের অন্ত নেই, তাঁর বাস্তববাদ তথা রোমাণ্টিক ঐতিহ্য-বিরোধিতা সম্পর্কিত সততায় সংশয় জাগে।

আমার নয়ন এই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি' শূন্যতায় উড়ি' যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লবমর্মর
প্রেমগুঞ্জনের মতো কী-অমৃত ঢালে মর্ম মাঝে।

'ব ন্দী র ব ন্দ না' পর্বের বন্দী-মানসিকতার এই আকাঙ্ক্ষাই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দাম আবেগে ধরা দিয়েছে 'ন তু ন পা তা' যুগের 'চিল্কায় সকাল' কবিতায়। কবিতাটিতে আবেগের অবাধ বহিঃপ্রকাশ কবির রোমাণ্টিক কবিস্বভাবকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রায়শঃই, কিন্তু সচেতন মনের খবরদারিতে অবচেতন মনের রোমাণ্টিক প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে। আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত করতে

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় কুৎসিত বাস্তবতা এবং যৌনানির্ভর দেহবাদ আমদানি করেছেন সচেতন ভাবেই। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে কবির এই প্রবণতা আহরিত হ'লেও তিনি এই দিক দিয়ে সম্ভবতঃ মোহিতলালের উত্তর-সাধক, আর দেহবাদের বিচারে অচিন্ত্যকুমারের সমধর্মা।

কুৎসিত-চেতনা দিয়েই বুদ্ধদেব বসু তথাকথিত রোমাণ্টিক ঐতিহ্যের প্রেম ও সৌন্দর্য-চেতনার প্রতি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন :

নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে
কুৎসিত কঙ্কাল—
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—
জানি, সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি—
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।
নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে
রহিয়াছে সেই
কঠিন কাঠামো
হরিণ-শিশুর মতো করুণ আঁখির অন্তরালে
ব্যাধিগ্রস্ত উন্মাদের দুঃস্বপ্ন যেমন।[৭০]

('প্রেমিক'/বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা)

দেহবাদী শৃঙ্গারচেতনা দিয়েও রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যানুগ প্রেমচেতনা অতিক্রম করতে চেয়েছেন। 'গান' (একটি কথা) কবিতায় :

মুখে মুখ রাখিই যদি, এমন আর দোষ কী, বলো ?
মনেরে যায় না ছোঁয়া, কেমনে চাখবো তারে।
দুটি ঠোঁট—ফুরফুরে ঠোঁট, টুকটুক-রাঙিন হ'লো,
ঠোকরাই পাখির মতো, খুটখুট চার কিনারে।
খুলেই দাও চুলের বোঝা ঝপাঝপ ইতস্তত,
ফুটফুট নরম বুকে টেনে নাও বাহুর টানে।

অথবা, 'এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে' (নতুন পাতা) কবিতায় :

আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মতো দোলে
তোমার দুই বুক ; কল্পনার গ্রন্থির মতো খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর ;…

এই সমস্ত চেতনা কবিকে সমসাময়িক যুগে 'আধুনিক কবি' রূপে প্রতিষ্ঠা

দিলেও এরাই তাঁকে এলিঅট চারণার অভিমুখী ক'রে তুলেছিল এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ে উপনীত হওয়া নিরাপদ নয় ; বরং কথ্যরীতি এবং বিরল হ'লেও কোনো-কোনো কবিতায় অনুসৃত বস্তুনিষ্ঠ আঙ্গিক (objective) বুদ্ধদেব বসুকে এলিঅটীয় কাব্যরীতির পথেই এগিয়ে দিয়েছিল (এই অধ্যায়ের আলোচনায় কাব্যপ্রকরণ বিষয়ক আলোচনা উপেক্ষিত হয়েছে)। কাব্যভাষা এবং মুখের ভাষার ব্যবধান ঘোচাতে সর্বত্র সচেষ্ট হ'লেও কোথাও-কোথাও কবির সাফল্য অবিসংবাদিত। 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা' কাব্যগ্রন্থের 'একখানা হাত' কিংবা 'বিরহ' কবিতার দু-একটি স্তবক এই রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে সহজেই উদ্ধরণীয় :

একখানা শাদা হাত, কয়টি আঙুল,
আংটির হীরার ঝলক,
মণিবন্ধে সরু রুলি, ম্লান-নীল আলো,
--চোখের পলক।

কিংবা 'বিরহ' কবিতায়

ভ্রমর, ওরে ভ্রমর, তুই একটু চুপ কর,
বুকের মধ্যে শুনছি আমার আর-একজনের স্বর,
তোরই মতো দুপুর ভ'রে করতো যে গুনগুন।
ভ্রমর, কালো ভ্রমর, ওরে ভ্রমর উতলা,
তোকে শুনে ব্যথা যে আর সইতে পারি না -
ব্যথা আমার ব্যর্থ না হয়, ঈশ্বর করুন।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যধারায় রীতিমতো এলিঅট-ভাবনার সূত্রপাত ঘটেছে প্রাক্-পঞ্চাশের দশকে, একথা আলোচনার গোড়াতেই বলেছি। ব্যাপারটা আপাত আকস্মিক। বাংলা কবিতার ইতিহাসে যখন এলিঅট-চেতনার ভরা কটালের বান ডেকেছিল সেই তিরিশের দশক ততদিনে অতীতে এক যুগের ব্যবধানে। এমন কি, সমর সেন-এর মতো অনুজ কবিরাও ততদিনে সে পালা চুকিয়ে ফেলেছেন। সে-কারণেই বুদ্ধদেব বসুর এই একক এলিঅট-চারণার পশ্চাতে যে সম্ভাব্য কারণগুলি বিদ্যমান সে-সম্পর্কে কৌতূহল স্বাভাবিক।

বাংলা কাব্যধারার বিবর্তন লক্ষ্য করলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যধারায় বিবর্তন এসেছে বিলম্বে এবং এই দিক দিয়ে তিনি সতীর্থ কবিদের অবশ্যই পশ্চাদ্বর্তী। কল্লোল যুগের বিষ্ণু দে প্রমুখেরা 'রবীন্দ্র কাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের স্বাবলম্বনের বিবর্তন' ত্বরায়

নিষ্পন্ন ক'রে অনতিবিলম্বেই 'রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের' বিরোধী স্ব-স্ব 'সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাব' সৃষ্টি ক'রে নিতে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর 'স্বাবলম্বনের বিবর্তন' দীর্ঘায়িত হয়েছে ; পক্ষান্তরে তিনি সময়স্বভাবে বিরোধী হ'লেও কাব্যস্বভাবে প্রাক্-পঞ্চাশ পর্যন্ত রবীন্দ্রসৃষ্ট মন্ময়ধর্মী (subjective) রোমান্টিকতার অনুসারী। রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাবের বিরোধিতায় অধিকতর আন্তরিক হ'লে বহু পূর্বেই তিনি রোমান্টিকতার প্রাবরণ ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে আসতে পারতেন এবং এলিঅটসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের হদিশ পেতেন।

আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে অনুমিত হয়, পঞ্চাশের দশকের অব্যবহিত পূর্বে কাব্য-নৈকট্য ঘটলেও এলিঅটের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর যোগাযোগের হেতু কাব্য নয় —নাট্যকাব্য। সাহিত্য-সাধনার উত্তরপর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হ'তে গিয়েই বুদ্ধদেব বসু এলিঅটের সংস্পর্শে আসেন। বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায় যথেচ্ছ বিচরণ করেছেন, উত্তর পর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হবেন এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিংবা অভাবনীয়তা কিছু নেই। তা সত্ত্বেও নাট্যকাব্যের প্রেরণা যে তিনি এলিঅট থেকেই আহরণ করেছিলেন এমন ইঙ্গিত উপেক্ষণীয় নয়। উত্তর জীবনে কাব্যধর্মী নাট্য-রচনায় এক স্বতন্ত্র ধারা প্রবর্তনে এলিঅটের অভাবিত সাফল্য বুদ্ধদেব বসুকে প্রলুব্ধ ক'রে থাকতে পারে। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে তিনিও এলিঅটের অনুরূপ প্রচলিত প্রথাবিরোধী কাব্যধর্মী নাট্যধারা বাংলায় প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হন। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যধর্মী নাট্যরচনাগুলির সঙ্গে এলিঅটের নাট্য-কাব্যগুলির আঙ্গিক ও রীতির সাদৃশ্য আছে, এলিঅটীয় তত্ত্ব এবং চেতনারও গভীর সাদৃশ্য আছে।[৭১] 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি নী' এলিঅটীয় চেতনা তথা উর্বরতাতত্ত্বেরই নাট্যরূপ, বলা চলে 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এরই নাট্যভাষ্য। স্পষ্টতঃই বুদ্ধদেব বসু এলিঅটকে ছাড়িয়ে গেছেন। এলিঅট উর্বরতা-প্রসঙ্গের পুরা-কাহিনীটিকে তাঁর কাব্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করলেও পশ্চাৎ-পটেই রেখেছেন, ইঙ্গিতধর্মী প্রয়োগের প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছেন ; বুদ্ধদেব বসু কিন্তু ভারতীয় পুরাণ কাহিনীটিকে (ম হা ভা র ত থেকে গৃহীত) সোজাসুজিই উর্বরতাতত্ত্বের ভাষ্যরূপে উপস্থাপিত করেছেন। 'অ না ম্নী অঙ্গনা' নাটকে মহাভারতোক্ত অনুরূপ আর একটি কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে ভিন্নতর পরিবেশে।

এলিঅটের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর এই যোগাযোগ কিন্তু আদৌ আপতিক নয়। এর পশ্চাতে এলিঅটচর্চার দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল, প্রাক্‌-পঞ্চাশ কিংবা পঞ্চাশের দশকে রচিত বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন কবিতা ও গদ্যরচনা অন্ততঃ অনুরূপ সাক্ষ্যই দেয়। ১৩৫৪ সালের চৈত্র সংখ্যার 'ক বি তা'-র সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপসংহারে (পৃ. ১৩৯) সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এলিঅটের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'মাইকেল' প্রবন্ধের বক্তব্য এবং বিশ্লেষণ ধারার সঙ্গে এলিঅটের 'মিল্টন' প্রবন্ধটির গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। সমসাময়িক কালের একাধিক কবিতায়ও এলিঅটীয়-চেতনার অনুপ্রবেশ অনুভূত হয়েছে। এর থেকেই অনুমিত হয় লরেন্স-হুইটম্যান কিংবা বোদলেয়ারের জগৎ ছেড়ে এই সময়টাতেই বুদ্ধদেব বসু এলিঅটের জগতে এসে উপনীত হয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশক তাঁর এলিঅটীয় রাজ্যে পূর্ণ বিচরণের কাল এবং বিচরণ প্রলম্বিত হয়েছে ষাটের দশকের নাট্যকাব্য রচনার যুগ পর্যন্ত। নাটকগুলি ষাটের দশকে রচিত হ'লেও পঞ্চাশের দশকে রচিত বিভিন্ন কবিতায় বীজাকারে ঐ সমস্ত নাটকের কিছু কিছু তত্ত্ব এবং কাহিনী স্থান পেয়েছে। বন্ধ্যাত্ব চেতনা বা উর্বরতা তত্ত্বের কথা উপেক্ষা করলেও 'উদ্বাস্তু' ও 'আটচল্লিশের শীতের জন্য: ১' কবিতার পরাশর-সত্যবতী প্রসঙ্গ এবং 'মরচে পড়া পেরেকের গান' কবিতার ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিনী প্রসঙ্গ উপেক্ষণীয় নয়। সম্ভবতঃ 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি নী', 'অ না ম্নী অ ঙ্গ না' প্রভৃতি নাট্যকাব্যের কাহিনী ও পরিকল্পনা কবির মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল বহু পূর্ব থেকেই। ঐ সাক্ষ্য থেকে কয়েকটি নাট্যকাব্যের উন্মেষ কাল কবির এলিঅটীয় রাজ্যে অনু-প্রবেশের সমসাময়িক ধরলেও অসঙ্গত মনে হয় না।

১৩৫৪ সালের (ইং ১৯৪৮) চৈত্র সংখ্যার 'ক বি তা'-র সম্পাদকীয় আলো-চনায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, 'আর যেহেতু সেই যুদ্ধের ব্যাপ্তি হিংস্রতা, দূরপ্রবাহী ধ্বংসস্রোত সকল অনুমানকে পঙ্গু ক'রে দিলো, তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ আজ আবার বিষাদের ভারে আচ্ছন্ন, আবার অন্তর্দর্শনের গম্ভীরতায় নিমগ্ন—শুধুই ব্যর্থতাবোধ আর হতাশা নয়—সেই সঙ্গে নিরন্তর সন্ধান. শিকড়ের সন্ধান। জড়বাদের উন্মাদনার অবসানে. নৈতিবাদের ক্লান্ত রাত্রি শেষে এলিঅট···আজ কোনো-এক সংশ্লেষণের সন্ধানী, কোনো-এক সাযুজ্যের, ঐক্যের অপরিহার্য স্বীকৃতিতে স্বাক্ষর-কারী। অনিবার্যত, এই স্বীকৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যে সম্প্রতি একটি তীক্ষ্ণ

নতুন প্রাচ্যচেতনা জাগিয়েছে' :

এই বক্তব্যের সঙ্গে 'শী তে র প্রা র্থ না ঃ ব স ন্তে র উ ত্ত র' কাব্যগ্রন্থের 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'[৭২] কবিতার কয়েকটি চরণের ক্ষীণ সাদৃশ্য অনুভূত হয়।

আজ পৃথিবী মুছে গেছে, তোমার সব অভ্যস্ত নির্ভর
ভাঙলো একে-একে।—রইলো হিম নিঃসঙ্গতা, আর অন্ধকার নিস্তাপ
রাত্রি ;— 'এসো প্রস্তুত হও।

বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় পৃথিবীতে 'নামলো অন্ধকার, নৈরাজ্য', প্রাচীন মূল্যবোধগুলি 'ভাঙলো একে-একে', এই পরিবর্তিত পরিবেশে অনুভূতিপ্রবণ সংবেদনশীল মনের ওপর চেপে বসা নৈঃসঙ্গ্যবোধের জগদ্দল পাথরটাকে আর অগ্রাহ্য ক'রে দূরে সরিয়ে রাখা গেল না।

বেলা তো গেছেই, আমার তো বেলা গেছে। বুড়ো হ'য়ে উড়ো-উড়ো মন
মানায় না আর, মানায় না ইচ্ছার হাওয়ার তাড়া ঃ
শুধু শুনে যেতে হয়, শুধু মেনে নিতে হয়, তাই
আমি তাই মেনেই নিয়েছি এই উত্তরের ঠাণ্ডা ঘর,
রাস্তায় গণ্ডগোল রাত্তির বারোটা অব্দি :
ঘেঁষাঘেঁষি-প্রতিবেশীদের
কয়লা-ধোঁয়ার ফাঁসি, পচা-মাছ-রান্নার প্রবল
গন্ধের উথাল।
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, তাই সারাদিন
কাটাই চেয়ারে ব'সে ;
লিখতে না-পারি যদি, পড়ি, বই পড়ি,
আর যদি আলো কম লাগে—যেহেতু আমার চোখ
তত ভালো নেই আর—
তবে চুপ ক'রে ব'সে ভাবি, ভাবি ; আর
ভাবতেও ক্লান্ত যখন লাগে, জানলা-বাইরে
রাস্তায় তাকিয়ে দেখি, নয়তো, রাত্তিরে
শুয়ে শুয়ে চিরচেনা অথচ অচেনা
দেয়ালে তাকিয়ে থাকি।

'মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে' কবিতার এই নৈঃসঙ্গ্যবোধের সঙ্গে 'জেরোনশান'-এর নৈঃসঙ্গ্য-চেতনার সাদৃশ্য আছে। তবে বস্তুমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে

পার্সোনার আশ্রয়ে এলিঅটের কবিতায় নিঃসঙ্গতা বোধকে যেভাবে সাধারণীকৃত ক'রে উপস্থাপিত করা হয়েছে, বুদ্ধদেব বসুর মন্ময়মুখী কবিতায় তা সম্ভব হয় নি। দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান থাকলেও এলিঅটীয় বন্ধ্যাত্ব-চেতনা তথা উর্বরতাতত্ত্বের আভাস আছে 'মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে' কবিতায়। বার্ধক্যই জরার আশ্রয় এবং বন্ধ্যাত্বেরও প্রকাশ, কিন্তু যৌবন মানেই উর্বরতা—এরকম উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন কবি।

সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা,
তরুণী নাতনির তাতে মাতামহী হাত সেঁকে নেন , …
নিজের জরার ভয়ে হাত পাতে যৌবনের দম্ভের কাছেও—
আর তাই বুড়োরা এমন একা, আর তাই বার্ধক্য এমন
নিষ্ঠুর, ভীষণ।

পরবর্তী চরণগুলিতেও যৌবনই উর্বরতা সে-বিশ্বাস ঘোষিত হয়েছে।

তবে কি, জন্তুর ধর্ম মেনে নিয়ে.
প্রকৃতির অন্ধ টানে অজাত সন্তানে শুধু
ডেকেছি, কবিতা লিখে ? যৌবনের বন্দনা আমার
সে কি শুধু জননশক্তির পূজা ?

'শীতরাত্রির প্রার্থনা' কবিতায় একাধিক এলিঅটীয়-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বন্ধ্যাত্ব এবং পড়ো জমি চেতনা—

যেমন তোমার চোখের সামনে পৃথিবী ম'রে গেলো আজ—ফুল নেই,
সব সবুজ নিভে গেছে, চারদিকে শুধু কঠিন শাদা স্তব্ধতার চিহ্ন—
তেমনি তোমাকে ডুবতে হবে, তোমাকেও।

কিংবা,

শীত এলে ম'রে যায় পৃথিবী, ঝ'রে যায় পাতা, নেয় বিদায়
ঘাস, ফুল, ঘাস-ফড়িং ; নেকড়ে আসে বেরিয়ে , কালো. কালো
নিষ্ঠুর কবরে
হারিয়ে যায় প্রাণ ধবধবে তুষারের তলায়।

নিরবচ্ছিন্ন কালচেতনা—যে-চেতনায় এলিঅট দেখেছেন, Time present and time past/Are both perhaps present in time future,/And time future contained in time past. অনুরূপ কালচেতনার আভাস আছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটিতেও—

অতীত এখনো ফুরিয়ে যায়নি, ভুলো না,

যে-অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভবিষ্যৎ ;

অথবা,

তোমার দিকে এগিয়ে আসবে ভবিষ্যৎ, পিছন থেকে ধ'রে ফেলবে অতীত। 'পার্গেটোরি' বা শুদ্ধিচেতনাও--

এরই মধ্যে তোমার যজ্ঞ , উৎসর্গ হবে প্রাণ, আগুন জ্বালবে আত্মার,
ভস্ম হবে যাকে ভেবেছো তোমার ভবিষ্যৎ, আর যাকে জেনেছে তোমার
অতীত।

পবিত্র হও, প্রতীক্ষা করো।

এলিঅট-বিরোধী কবিস্বভাবের অধিকারী বুদ্ধদেব বসু এলিঅটের আধুনিকতাবাদী প্রকরণগুলি নির্বিবাদে গ্রহণ করলেও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে 'আধুনিক কবিতা জটিল হ'তে বাধ্য' এ-ধরনের সিদ্ধান্ত বোধহয় মেনে নিতে পারেন নি, বস্তুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর অনায়ত্তই থেকে গেছে। গভীরভাবে এলিঅট-চারণায় ব্যাপৃত হ'লেও এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগে শেষ পর্যন্ত তাঁর এলিঅটের সঙ্গে বিরোধ থেকেই গেছে। একমাত্র কথ্যরীতির প্রসঙ্গেই তিনি ছিলেন এলিঅটপন্থী। বুদ্ধদেব বসুও কাব্যভাষা ও কথ্যভাষায় সমন্বয়-বিধানের একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর বিভিন্ন যুগের কাব্যভাষার তুলনামূলক আলোচনা করলে এই প্রয়াস ও সাফল্য সহজেই বোঝা যাবে।

কয়েকটি এলিঅটীয় প্রবণতার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেছে সতীর্থ কবিদের রচনায়, কিন্তু সে-সমস্ত প্রবণতা বুদ্ধদেব বসুকে তেমন ভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। নাগরিক জীবনের যেমন প্রকাশ বিষ্ণু দে-র কাব্যে ঘটেছে তেমনটা পাওয়া যায় না বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে, আবার জীবনানন্দসুলভ নিঃসঙ্গতা, নৈরাশ্য বা বিষণ্ণতাও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে একান্ত অনুপস্থিত। সুধীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী কাব্যরীতি তো তাঁরই একক সাধনার ফসল।

৬

এলিঅটীয় কাব্যরীতিকে গুটিকয় কাব্যপ্রবণতার মধ্যে সংহত ক'রে এনে সমর সেন এলিঅটীয় বাংলা কাব্যধারার এক উজ্জ্বল কবি। সন্দেহ হয়, তিনি এলিঅট-অনুসারী নন, বিষ্ণু দে-অনুসারী কবি। কবিস্বভাবে, কাব্যপ্রবণতায় এবং কাব্য-বিবর্তনে বিষ্ণু দে ও সমর সেন-এর নৈকট্য অনস্বীকার্য। বাংলা কাব্যধারায় যে-সময় এলিঅট-চারণা তুঙ্গে এবং বিষ্ণু দে

এলিঅটীয় রীতি, প্রকরণ, প্রবণতা প্রভৃতি আমদানি ক'রে বাংলা কবিতায় নতুন সুর সংযোজন করেছেন, ঠিক সে-সময়েই কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন ব'লেই কবি সমর সেন বিষ্ণু দে অনুসারী হ'তে গিয়ে এলিঅট অনুসারী। বিবর্তনেও সমর সেন-এর কাব্যধারা বিষ্ণু দে-র কাব্যধারার সমান্তর— তিরিশের দশকে রীতি ও প্রকরণে ঘোরদুস্তর এলিঅটপন্থী, প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধকাল থেকে আধুনিক সভ্যতা, নগরজীবন, পযুর্দস্ত মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পর্কিত ক্ষয়িষ্ণু বন্ধ্যাত্বচেতনায় পীড়িত, যুদ্ধোত্তর চল্লিশের দশকে স্বাধীনতা আন্দোলন, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষের বিভীষিকায় প্রচলিত বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তথা নাস্তিক্যবোধে উদ্দীপিত আর সর্বশেষে মার্কসবাদে আশ্রয় ও 'পোড়ো মাটিতে···সবুজ অঙ্কুর'-এর স্বপ্ন-লালিত। বৈষম্য যেটুকু তা কাব্যধারার আদিতে এবং অন্তে। বিষ্ণু দে-র মতো রবীন্দ্র-কাব্যের ছায়ায় স্বাবলম্বনের বিবর্তন সমর সেন-এর কাব্যধারায় ঘটেছিল কি না সে-ইতিহাস অজ্ঞাত। 'আপনাতে আপনি বিকশি' যখন আত্মপ্রকাশ ঘটল 'ক য়ে ক টি ক বি তা'-য় তখন তিনি প্রকৃতই স্বপ্রতিষ্ঠ কবি, এলিঅটীয় রীতি ও প্রকরণেও ধাতস্থ। প্রাক্-আবির্ভাবকালীন স্বাবলম্বনের বিবর্তন অজ্ঞাত থাকায় জানতে পারি না কি ক'রে রাবীন্দ্রিক তথা রোমান্টিক ঐতিহ্যের নির্মোক ভেদ ক'রে এলিঅটীয় জগতে সমর সেন-এর উত্তরণ ঘটেছিল। তেমনি কাব্যজগৎ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করায় জানতে পারি না বিষ্ণু দে-র মতো মার্কসবাদ থেকে অপসরণ তাঁরও ভবিতব্য ছিল কি না।

অনুমিত হয় বিষ্ণু দে-র কাব্য আশ্রয় ক'রেই কবি সমর সেন স্বাবলম্বনের বিবর্তন সমাধা করেছিলেন, তাই প্রয়োজন পড়ে নি রবীন্দ্রবিরোধিতার কিংবা রোমান্টিক ঐতিহ্য অতিক্রমণের। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিষ্ণু দে প্রমুখেরা বাংলা কাব্যধারাকে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের আবেষ্টনী থেকে মুক্ত ক'রে যে-পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন সেই এলিঅট-চারণার যুগ থেকেই সমর সেন-এর যাত্রা শুরু। ঐতিহাসিক চেতনায় বিষ্ণু দে-রা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সমস্ত কবির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন, সমর সেন তদতিরিক্ত বিষ্ণু দে-রও উত্তরাধিকার পেলেন। তাঁর কাব্যে অন্যপূর্বা চিত্রকল্পরূপে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি বিষ্ণু দে-র কবিতার চরণও নির্দ্বিধায় স্থান পেল।[৮৩] চল্লিশের দশকে উপনীত হ'য়ে সমর সেন-এর অকপট ঘোষণা 'আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট'। 'গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে (তাঁর)···তফাতটা কী' সে-সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন :

তফাতটা এই :

বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন ;
কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকোয় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলেন ব'লে আমার বিশ্বাস। ('২২ জুন')

যদিচ এই বক্তব্য তির্যকাশ্রয়ী তাহলেও রোমাণ্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোমাণ্টিকতাবিরোধী কবির তফাতটা যথার্থই ব্যক্ত করতে পেরেছেন। দৃষ্টি-ভঙ্গির তফাত থেকেই সমর সেনও বিষ্ণু দে কিংবা যতীন্দ্রনাথের মতোই রবীন্দ্র-রোমাণ্টিকতাবিরোধী রূঢ় বাস্তবের সন্ধান পেয়েছিলেন :

নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহে,
শেয়াল-সংকুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়ে-ঘর বাঁধি ;
গরুর দুধ, পোষা মুরগির ডিম, ক্ষেতের ধান ;
রাত্রে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান ;
সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাংলার বধূ নামে ;
নিরালা কাল আপন মনে
পুরোনো বিষণ্ণতা হাওয়ায় বোনে।
('নিরালা'/সমর সেনের কবিতা)

ধূসরতা, ক্লান্তি, শূন্যতা, নৈঃসঙ্গ্য, বিষণ্ণতা প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ সমর সেনের কবিতায় গোড়া থেকেই ধরা পড়েছে। কয়েকটি কাব্য-প্রকরণের সঙ্গে এই সমস্ত এলিঅটীয় কাব্যপ্রবণতাগুলিও কবির কাব্য-জীবনের সহজাত। নাগরিক কবি আধুনিক নগরসভ্যতার ক্লেদ ও বিকারের যে নগ্নরূপ দেখেছিলেন এবং নগরজীবনের ক্লান্তি, নৈঃসঙ্গ্য ও বিষণ্ণতার যে অকরুণ উপলব্ধি ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তারই অকপট অভিব্যক্তিতে তিনি অবিসংবাদিত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।[৭৪]

সমর সেন-এর কাব্যে ব্যাপকতার অভাব পীড়াদায়ক একথা মানতেই হয়। তাঁর কবি-জীবনের বিস্তার দীর্ঘায়িত হয় নি, কাব্যেও বিষয়-বৈচিত্র্য ধরা পড়ে নি, পটভূমি গণ্ডির সংকীর্ণতা অতিক্রম করে নি। তাঁর কাব্যে নগরজীবন, মধ্যবিত্তের যান্ত্রিক দিনচর্যা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, বন্ধ্যা সভ্যতা, সত্তাহীন জরাগ্রস্ত মানুষের নৈরাশ্য—এর মধ্যেই বিষয় ফুরিয়ে গেছে ; পটভূমিতেও কলকাতা মহানগরীর ধোঁয়া ও কুয়াশার ধূসরতা আর সাঁওতাল পরগণার রুক্ষতাই ঘুরে-ফিরে এসেছে। দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, আন্দোলন, বিপ্লব সমস্ত কিছুই কাব্যরূপ পেয়েছে এই সংকীর্ণ জগৎ জুড়েই। কিন্তু একথাও স্বীকার করতেই হয় যে যেমন মুষ্টিমেয় কয়েকটি এলিঅটীয় প্রকরণ-প্রয়োগে তেমনি সীমাবদ্ধ বিষয় ও পটভূমি ব্যবহারেও তিনি কাব্যিক সাফল্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

অন্যপূর্বা ও অন্যপুষ্ট চিত্রকল্প, শব্দানুবৃত্ত চিত্রকল্পের সাহায্যে আম্রেড়িত ব্যঞ্জনা, শিরোদ্ধারণ প্রভৃতি এলিঅটীয় প্রকরণ সমর সেন-এর কবিতায় যথেচ্ছ ব্যবহৃত। ব্যঙ্গাত্মক এবং কথ্যধর্মী রীতি সমর সেন-এরও প্রিয় কাব্যরীতি। বন্ধ্যাত্মচেতনা এবং নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতাবোধ তাঁর কাব্যকেও আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়েছে।

তিরিশের দশক আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় এলিঅট-প্রভাবিত যুগ। সমর সেন এই বিশেষ যুগেরই প্রতিভূ। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত মূল্য-বোধের মানসিকতার ফসল তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে। তাঁর কাব্যের জগৎ ধূসরতার, পরিবেশ ক্লান্তির আর কঠিন প্রতিকূলতার :

রাত্রে ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে,
আর দিগন্তে জমে ইস্পাতের মতো
ধূসর আকাশ ;
আমার নিদ্রাহীন অন্ধকারে শুধু যেন শুনি
দুপুরের খর-সূর্যে ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ
ইস্পাতের কঠিন পথে। ('ঝড়'/স ম র সে নে র ক বি তা)

আধুনিক সভ্যতার এই একঘেয়ে অকরুণ পরিবেশে এলিঅটের মতোই সমর সেন-এর কবি-আত্মা হাঁপিয়ে উঠেছে, চতুর্দিকে 'শুধু আকাশের মহাশূন্য, ঝরাপাতার ক্লান্তি' দেখেছেন, শান্তির সন্ধান পান নি :

রাত নেই, দিন নেই, বারে বারে চমকে উঠি,
আমার মনে শান্তি নেই, আমার চোখে ঘুম নেই,

স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন।

স্বভাবতঃই বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংরেজ কবির যেমন মনে হয়েছিল 'April is the cruellest month' তেমনি তিরিশের দশকের বাঙালী কবিরও মনে হয়েছে : 'উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন/এপ্রিলের বসন্ত আজ'।

এলিঅট আর সমর সেন উভয়েই মহানগরীর কবি, যে-'মহানগরীতে…বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি' এবং যেখানে—

গম্ভীর শব্দে শহরের উপরে আকাশ কাঁপে,
নিচে বিবর্ণ বস্তি
আর হলুদ ঘাসের মাঠ।
বৃষ্টির শেষে বিষণ্ন শান্ত ইন্দ্রধনু,
তবু বারে বারে মনে হয়
এখানে হাওয়া নেই,
মাটির উপরে গ্রীষ্মের পাতাগুলি কঠিন পাথর।

('অখ্যাত নায়ক'/সমর সেনের কবিতা)

নগর সভ্যতার অগণন বলির মিছিল দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন এলিঅট, 'I had not thought death had undone so many'; স্তম্ভিত হয়েছিলেন বিষ্ণু দে-ও ('টপ্পা-ঠুংরি')। পরবর্তী সোপানের কবি সমর সেন কিন্তু স্তম্ভিত হন নি, নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লেই সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ বর্ণনা তাই তাঁর কাব্যে সংক্ষিপ্ত।

জীবিকার স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন
আশেপাশে ব্যর্থতার চিরকাল মৃত্যু আসে আর যায়।

('সন্ধ্যা ও প্রভাত'/সমর সেনের কবিতা)

নগরজীবনের ক্লান্তি, নৈরাশ্য, যান্ত্রিকতা প্রভৃতি ধরা পড়েছিল এলিঅটের কাব্যে, এই প্রবণতাগুলি সমর সেন-এর কাব্যেরও আলম্বন। সমর সেনও আধুনিক সভ্যতাকে দেখেছেন অনুর্বর ও বন্ধ্যা রূপে। তাঁর চোখে উর্বশী অনুর্বরতার প্রতীক, বারবণিতার বন্ধ্যাত্ব নিয়ে সে বারে-বারে এসেছে তাঁর কাব্যে; 'দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী'। কলকাতা শহরটাই অনুর্বরতার পটভূমি, তার 'কালীঘাট ব্রিজের উপরে…লম্পটের পদধ্বনি'। 'কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের' মহানগরীর 'রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাস' আর 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে… বিষণ্নমুখে উর্বর মেয়েরা আসে'। ক্ষয়রোগ কেবল

মেয়েদের জীবনেই বন্ধ্যাত্ব এনে দিচ্ছে না, নগরজীবনে পুরুষদেরও জরাগ্রস্ত করছে এ-সম্পর্কে কবি নিঃসন্দিগ্ধ : 'আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো'। 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি'-র মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেন :

আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই ;
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপে।
তবু সত্য শুধু পতন-বন্ধুর পথ,
বন্ধ্যা ভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত।

'বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে পৃথিবীকে রেখে' তিরিশের দশক এগিয়েছে চল্লিশের দশকের দিকে—পৃথিবীতে নেমে এসেছে বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা। কবির অন্তরেও এর প্রতিধ্বনি। সংবেদনশীল সমর সেন অনুভব করেছেন 'চারিধারে অদৃশ্য ধ্বংসের প্লেসিওসার'। বিশ্বযুদ্ধ কবির মন ও চেতনাকে করেছে বিশ্বচরাচরমুখী। 'একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি' কবিতায় :

গলিত অন্ধকারে মরা মাঠ ধু ধু করে
চরাচরে মরা দিনের ছায়া পড়ে।

'গ্রহণ' কবিতায় সভ্যতায় গ্রহণের ইঙ্গিত :

সূর্যে আজ কবন্ধের ছায়া, দিন শেষ,
চরাচর কী ভীষণ করুণ লাগে ;
অভিশাপে শতছিদ্র মনের উপর
বাঁধন টুটে বুঝি নামে রক্তের প্লাবন।

সমাজসচেতন কবি সমর সেন-এর স্পর্শকাতর অন্তর চল্লিশের দশকে যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষে গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তিরিশের দশকে লব্ধ এলিঅটীয় চেতনাগুলোকে বর্জন করে নি। নবলব্ধ যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-চেতনার সঙ্গে পূর্বতন ক্লান্তি-নৈরাশ্য-বিষণ্ণতা-নৈঃসঙ্গ্য-অনুর্বরতা-বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি চেতনার সুসমঞ্জস আত্তীকরণ ঘটিয়েছেন। অবশেষে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে মার্কসবাদে। এমনকি, মার্কসবাদের রূপায়ণের মধ্যেই তিনি বন্ধ্যাত্বমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। 'বসন্ত' কবিতায় :

আসমুদ্রহিমাচল হে হিন্দুস্থান,
কানে বাজে
ক্ষুরধার নদীসংকুল চীনের আহ্বান।

কৃষ্ণসাগর থেকে বল্টিক পর্যন্ত
বিপর্যস্ত সোভিয়েট-ভূমির মৃত্যুঞ্জয় গান
পোড়োমাটিতে কি চিড় ধরে, সবুজ অংকুর ভিড় করে
হে হিন্দুস্থান ?

মার্কসবাদে আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন ব'লেই কবি রাশিয়ায় তাঁর স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করেছিলেন। '২২শে জুন' কবিতায় :

সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হ'লে
বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন
জোসেফ স্টালিন।
প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর,
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
অমর নমস্য তারা।

একথা স্বীকার্য, সমর সেন আশাবাদী। কালের নিয়মেই সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব-উত্তরণ ঘটবে এ-বিশ্বাস তাঁর আছে :

কূপের মণ্ডূক আমি, ঘুমে শুনি কালের প্রপাত,
মহাদেশ আলোড়িত, ক্রমে আসে নতুন প্রভাত।

অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও উল্লেখ্য, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-বন্ধ্যাত্ব তথা মার্কসবাদ থেকে উদ্ভূত কাব্যরীতি থেকেই পরবর্তী কাব্যরীতির উদ্ভব ঘটবে এ-রকম আন্তরিক বিশ্বাসও তাঁর ছিল।

কালক্রমে টেকনীক নিয়ে যাবে নব কাব্যলোকে,
যেমন বুর্জোয়া টেকনীক
কালক্রমে মার্ক্সিস্ট পৃথিবী আনে।

সমন্বয়ধর্মী কাব্যরীতি তাঁর কাব্যবাহন হ'লেও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীরই কবি সমর সেন। প্রথমাবধি তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতা তাঁকে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করেছিল। গোড়ার দিকে কিছু-কিছু কবিতায় রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গী মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও অত্যল্পকালের মধ্যে সহজেই সমাজসচেতনতা তাঁকে এই স্তর কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে, তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছে ব্যঙ্গাশ্রিত তির্যক কথন রীতি। সমাজসচেতনতার পথ বেয়েই তিনি এলিঅটসুলভ বিশ্বযুদ্ধোত্তর নগরজীবন ও সভ্যতার ক্লান্তি নৈরাশ্য নৈঃসঙ্গ্য বিষণ্ণতা অনুর্বরতা প্রভৃতি চেতনায় উপনীত হতে পেরেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমস্ত চেতনা সমন্বয়ধর্মিতায় অভিব্যক্ত হ'লেও এদের

তন্ময়ধর্মী ব্যঞ্জনা অনস্বীকার্য। তাই একেবারে কাব্যজীবনে ছেদ টানার মুখে 'রোমাণ্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়' স্বগতোক্তির মত শোনালেও সমসাময়িক (পঞ্চাশের দশকের প্রাক্কালে) কাব্যস্বভাবের বিচারে তদানীন্তন বাংলা কাব্যধারার সামগ্রিক সত্য ব'লে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয় না।

আশা করছি অতঃপর সমর সেনকে 'চল্লিশের যুগের কবি' ব'লে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ক'রে বাংলা কাব্যধারার তিরিশের দশকের এলিঅটীয় যুগের সঙ্গে প্রকারান্তরে তাঁর সম্পর্ক অগ্রাহ্য করা অযৌক্তিক হবে। যদিচ এরকম ভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন এমন গবেষকের অভাব নেই।[৭৫] ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এরকম একপেশে সিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তির বিপক্ষে। সমর সেন-এর কবিজীবনের আয়ুষ্কাল ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রসারিত—স্পষ্টতঃই তাঁর পূর্বার্ধ কেটেছে তিরিশের দশকে এবং উত্তরার্ধ চল্লিশের দশকে। পূর্বার্ধের সমাজ-চেতনাই তাঁর কাব্যের মূল কথা, অবশ্য চল্লিশের দশকে কবির এই সমাজ-চেতনা অনুকূল পরিবেশে তীক্ষ্ণতর হয়েছে এবং কবিকে মার্কসবাদে আস্থাবান্ করেছে। কিন্তু কবির সমাজচেতনায়, এমনকি মার্কসবাদেও, আগাগোড়াই এলিঅটীয় চেতনাগুলি সক্রিয়। তাই সমর সেন পুরোপুরি তিরিশের দশকের নন, চল্লিশেরও নন, বরং বলা চলে তিনি এলিঅটীয় যুগের কবি।

সমর সেন-এর কোনো-কোনো কবিতার বিশেষ-বিশেষ চরণে এলিঅটীয় চরণের ছায়া অনুভূত হয়। 'ঝড়' কবিতার

এখনি বৃষ্টি নামবে ;
ছেলেবেলায় জলে ভেজার অদ্ভুত আনন্দ
এখন আর নেই,
আর এখন বাড়ি ফিরে কি হবে।
তার চেয়ে ভালো
কাছাকাছি কোনো বন্ধুর আড্ডা,···

এলিঅটের : And if it rains, a closed car at four,
And we shall play a game of chess.

'April is the cruellest month' হয়েছে 'উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন/এপ্রিলের বসন্ত আজ।'

She turns and looks a moment in the glass,
Hardly aware of her departed lover ;

Her brain allows one half-formed thought to pass···
Paces about her room again, alone,
She smooths her hair with automatic hand,···

এলিঅটের এই চরণগুলির অনুরূপ ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে 'মৃত্যু' কবিতার একটি বর্ণনায় ঃ

প্রান্তরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে
একটি ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গিনী আলোয় থমকে দাঁড়ালো,
তারপরে শীর্ণ হাতে
অলস, অলসভাবে ঠোঁটে মাখাল রঙ,
আর পাউডার মুখে ;···

'দি লাভ সঙ অব জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক'-এর গোড়ার সন্ধ্যার বর্ণনার সঙ্গে পূর্বোক্ত কবিতার সন্ধ্যার বর্ণনার সাদৃশ্য আছে চিত্রকল্পের পার্থক্য সত্ত্বেও।

When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table ···
এখানে সন্ধ্যা নামল,
শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শুয়রের চামড়ার মতো,

'দি হলো মেন' কবিতায় ব্যবহৃত 'For Thine is the Kingdom'-এর বাংলা রূপান্তর 'প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম' ব্যবহৃত হয়েছে 'একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি' কবিতায়।

'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর We think of the key, each in his prison / Thinking of the key, each confirms a prison' প্রভৃতি চরণেরই প্রতিধ্বনি শুনি 'গ্রহণ' কবিতার 'চাবিতে বন্ধ দুয়ার, অন্ধ ঘরে একলা থাকি' চরণে।

৭

কিরণশংকর সেনগুপ্ত 'ক ল্লো ল' পরবর্তী যুগের কবি, এলিঅটীয় যুগ থেকে তাঁর ব্যবধানও উপেক্ষার নয় ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর 'স্বর' কবিতায় এলিঅটীয় কাব্যরীতি ও প্রকরণ প্রয়োগের বাহুল্য বিস্ময়াবহ। অবশ্য বুদ্ধদেব বসুর এলিঅটীয় যুগ থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে উপনীত হ'য়েও

কাব্যচেতনা ও প্রকরণে প্রভাবিত হওয়ার দৃষ্টান্ত স্মরণে রাখলে কিরণশঙ্করের এলিঅট চর্চা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হবে না। কিরণশঙ্কর প্রকৃতই এলিঅট ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সমসাময়িক কালের কিঞ্চিৎ আগে-পরে রচিত 'আধুনিক কবিতার রূপ', 'কবিতার কথা', 'কাব্য-বিচার', 'রূপকের সঙ্কট' প্রভৃতি সমালোচনা প্রবন্ধে তিনি সে-সময় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এলিঅটীয় কাব্যরীতি, কাব্যতত্ত্ব ও কবিতার ভাষ্য-রচনা করেছিলেন।

'স্বর' কবিতায় এক-আধটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে যে কবি কিভাবে এলিঅটীয় রীতি ও প্রকরণ আত্মসাৎ করেছিলেন।

'ও শব্দ কিসের ?'
'বাতাসের।'
'বাতাসের শব্দ বুঝি এতো ভারী হয়।'
'নিশ্চয় !'
'বেঁচে আছো, অথবা তুমিও আজ বাতাসের মতো মৃত, ভারী ?'
'নতনেত্রা বিম্ববতী দিলো না উত্তর, এ ঘর নিথর।'
'ধীরে-ধীরে মিলালো সে কামদৃপ্ত পুরুষের স্বর।'

(কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৭)

কবিতাটির রীতি এবং প্রকরণই নয়, বক্তব্যও বারে-বারে সচেতন পাঠককে 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর কথা মনে করিয়ে দেবে।

এলিঅট-সুলভ ক্লান্তি, নৈরাশ্য, শূন্যতা, ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনা (বন্ধ্যাত্ব-চেতনা) প্রভৃতি আরো অনেক কবিতায় স্থান পেয়েছে। 'প্রথম গ্রীষ্ম' কবিতায় ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনা :

দিগন্ত প্রসারী ক্ষেত তীব্র রৌদ্রালোকে ধূ-ধূ করে।
ছায়া নেই, দগ্ধ মাটী, ভ্রূকুটি কুটিল নভোনীল।
স্তম্ভিত গরুর দল বজ্রাহত, শূন্যে ওড়ে চিল,
শুষ্ক মাঠ থেকে ধূলি উড়ে উড়ে মিশেছে অম্বরে।

(স্বর ও অন্যান্য কবিতা)

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১। 'রবীন্দ্রনাথ ও এলিঅট', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৩, পৃ. ৪৯

২। 'সূচনা', নবজাতক, পৃ. ৭

৩। Wordsworth and Coleridge, *The Use of Poetry and the Use of Criticism*, p. 75

৪। 'ভূমিকা', পূনশ্চ

৫। সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ২৬ ৬। ঐ, পৃ. ৩৮

৭। 'The Music of Poetry', *Selected Prose*, p. 65

৮। Ibid, p. 58

৯। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আ. স., পৃ. ৭৮

১০। 'বর্তমান ইংরেজি কাব্য উগ্রভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী-ভাবে নূতন।'—সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ২১-২২

১১। ঐ, পৃ. ২০

১২। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আ. স., পৃ. ২০

১৩। 'এই কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়, তাই মনে হয় তিনি এটির অনুবাদ করেন।'— রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়, পৃ. ১৫১

১৪। গ্রন্থপরিচয়, পূনশ্চ, পৃ. ২০৬

১৫। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য, পৃ. ৭৪

১৬। 'Sishutirtha is rich in symbols and suggestions, some of these non-Indian. The murder of the leader reminds one of Freud's theory about Moses and the Oedipus Complex.' *The Later Poems of Tagore*, p. 72

১৭। লীলা রায়-এর 'শিশুতীর্থ' অনুবাদের সঙ্গে 'জার্নি অব দি মেজাই'-এর আশ্চর্য সাদৃশ্য।—*A Challenging Decade*, p. 84

১৮। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আ. স., পৃ. ৭৪

১৯। কবি জীবনানন্দ দাশ, পৃ. ১৯

২০। কবি জীবনানন্দ, পৃ. ১৪

২১। কবিতার কথা, পৃ. ৩৪

২২। 'Tradition and Individual Talent'

২৩। কবিতার কথা, পৃ. ৩২

২৪। '? ভূমিকা', জীবনানন্দ দাশের শ্রে. ক. পৃ. ৫

২৫। কবি জীবনানন্দ, পৃ. ১৬

২৬। কবিতার কথা, পৃ. ২৯

২৭। কবি জীবনানন্দ দাশ, পৃ. ১৮
২৮। 'নজরুলের কবিতা', জীবনানন্দ (পরিশিষ্ট), পৃ. ৪৫
২৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-৪, পৃ. ৩৬০
৩০। 'ভূমিকা', জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ-১, পৃ. ৩
৩১। 'বেদুঈন', জীবনানন্দ (পরিশিষ্ট), পৃ. ৪
৩২। 'আজ', ঐ, পৃ. ৩০
৩৩। কবি জীবনানন্দ দাশ, পৃ. ১৮
৩৪। জীবনানন্দ (পরিশিষ্ট), পৃ. ৭৯
৩৫। কবি জীবনানন্দ, পৃ. ৫০ ৩৬। ঐ, পৃ. ৫০
৩৭। কবিতার কথা, পৃ. ২৩ ৩৮। ঐ, পৃ. ৬৭
৩৯। ঐ, পৃ. ১৮-১৯
৪০। 'The voyage in 'Marina' discovers in the ocean an island, and sees again a beloved face Its theme is not the immortality of the soul, but resurrection.'—*The Art of T. S. Eliot, p.* 126
৪১। এলিঅট ও জীবনানন্দের কিছু অদ্ভুত সাদৃশ্যের উল্লেখ আছে 'একটি নক্ষত্র আসে' গ্রন্থে পৃ. ১৭৬-১৮০।
৪২। জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ কবিতা, শারদীয়া যুগান্তর ১৩৮৪, পৃ. ৬
৪৩। 'অর্কেস্ট্রা'-র ভূমিকা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কা. সং., পৃ. ৫
৪৪। ঐ, পৃ. ৩
৪৫। '…his style is severely classical and his diction sanskritic. …Nearest to him is Vishnu De, though not exactly of the same set.'—*Bengali Literature*, p. 86
৪৬। 'সুধীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে রোমান্টিক কবি, এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক।'—ভূমিকা (বুদ্ধদেব বসু), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কা, সং, পৃ. বারো ৪৭। 'সংবর্ত'-র ভূমিকা, ঐ, পৃ. ১৭২
৪৮। 'Mr. Eliot Among the Arjunas', *T. S. Eliot*, p. 100
৪৯। 'টমাস্ স্টার্নস্ এলিঅট', এলিঅটের কবিতা (প্র, সং) পৃ. ৯
৫০। স্বগত, পৃ. ২৩ ৫১। ঐ, পৃ. ৩৬ ৫২। ঐ, পৃ. ২৫-২৬

৫৩। ক, 'Mr. Eliot Among the Arjunas,' *T. S. Eliot*, p. 100
খ, 'সুধীন্দ্রনাথ' (নিরঞ্জন হালদার), সুধীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৫১;
গ, 'দত্ত পরিবার, সুধীন্দ্রনাথ ও 'পরিচয়'-এর প্রকাশ' (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত), ঐ, পৃ. ২১৩

৫৪। 'ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিঅট', স্বগত, পৃ. ১৪৬

৫৫। ঐ, পৃ. ১৫০

৫৬। ঐ, পৃ. ১৫৮-৫৯

৫৭। কবিতা, পৌষ ১৩৫৫, পৃ. ৯৪ (রেডিয়োয় প্রচারিত ইংরেজি রচনাটির বুদ্ধদেব বসু কৃত অনুবাদ)

৫৮। ভূমিকা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কা, সং, পৃ. ১২

৫৯। 'তন্বী'-র ভূমিকা, ঐ, পৃ. ৩২৭

৬০। 'অর্কেস্ট্রা'-র ভূমিকা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কা, সং, পৃ. ৬

৬১। *The Invisible Poet : T. S. Eliot*, pp. 26-27

৬২। টি. এস. এলিঅট, পৃ. ৫৪

৬৩। এই গ্রন্থের ভূমিকা দ্র.

৬৪। 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী' (শামসুর রহমান), সুধীন্দ্রনাথ, পৃ. ৪০

৬৫। *The Cocktail Party*, Act Two, p. 118

৬৬। আধুনিক কবিতার ভূমিকা, পৃ. ৮০

৬৭। আধুনিক বাংলা কবিতার ভূমিকা, পৃ. ১০
আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মর্তব্য : 'সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লব তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করলেও তেমন ক'রে অধিকার করে নি যেমন করেছে সুধীন্দ্র দত্ত কি বিষ্ণু দে-র চিত্তকে।'—কবিতা, কার্তিক ১৩৪৭

৬৮। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', নতুন সাহিত্য র. শ. সং, পৃ. ২

৬৯। শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা (ভূমিকা), পৃ. ৪-৫

৭০। কঙ্কাল-প্রীতি বা নেক্রোফিলিয়া-চেতনা সম্ভবতঃ বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে সংক্রমিত বোদলেয়ার ও ফরাসী কাব্য-আন্দোলনের দৃষ্টান্ত থেকে (শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, পৃ. ২২২)।

৭১। অষ্টম পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা

৭২। রচনাকাল ১৯৫৩

৭৩। 'ঝড়', 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' প্রভৃতি কবিতা দ্র.

৭৪। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল, পৃ. ১২৯

৭৫। আ, বাং, কবিতার রূপরেখা, পৃ. ৪৩৩

ছয়

বাংলা কাব্যতত্ত্বের পুনর্বিন্যাসে এলিঅটীয় কাব্যতত্ত্বের ভূমিকা

এলিঅট বলেছেন :

> **Every nation, evry race, has not only its own creative, but its own critical turn of mind.**[১]
>
> —প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় কেবল নিজস্ব সৃষ্টি ক্ষমতারই নয়, পরন্তু নিজস্ব ধরনের সমালোচন মানসিকতারও অধিকারী।

বাঙালী জাতি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। এক বিশেষ ধরনের নৃতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার বাঙালীর রক্তে, তার ফলে ভারতের পূর্ব প্রত্যন্তের এই বিশেষ জনপদের মানুষদের সৃষ্টিকর্মে—তাদের শিল্পে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, সংগীতে সর্বত্র একটা নিজস্ব ধরণ বা রীতি বিকাশলাভ করেছে। আর্যাবর্তের (কিংবা ভারতের) অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে বাঙালী যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে তা তার এই বিশেষ ধরনে যা তার রুচিতে, তার নান্দনিক দৃষ্টিতে অভিব্যক্ত। বাঙালী নিজস্ব ধরনকেই আবহমান কাল ধ'রে রূপায়িত করেছে তার নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চায়, ব্রত-পার্বণে, আলিম্পনকলায় ও অন্যান্য কারুকর্মে; নিজস্ব ধরনেই কল্পনাকে রূপদান করেছে ছড়ায় গাথায় রূপকথায় ব্রতকথায়। পরবর্তীকালে যুগপৎ গাথা ও ব্রতকথা বাঙালীর নিজস্ব ধরনে পরিণত সাহিত্যকর্মের রূপ পায় মঙ্গলকাব্যে; যুগপৎ গাথা ও সঙ্গীত মিলিত রূপ পায় মধ্যযুগীয় কীর্তনে, বৈষ্ণব কবিতায় ও শাক্ত পদাবলীতে। আধুনিক কালের বাঙালী জাতিও স্বকীয় ধরনে গড়ে তুলেছে তার আধুনিক সাহিত্য, আধুনিক সংস্কৃতি। যেমন মধ্যযুগের ব্যাপক আর্যপ্রভাব (উত্তরাধিকারও অবশ্যই) কিংবা ইসলামী প্রভাব, তেমনি আধুনিক কালের প্রবল পাশ্চাত্য প্রভাব কোনোকিছুই বাঙালীকে তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বধর্মচ্যুত করতে পারে নি,[২] তবে তার প্রাণবন্ত ধারাকে বেগবান করেছে নিশ্চয়ই।

সৃষ্টিকর্মে বাঙালীর নিজস্ব স্বভাববৈশিষ্ট্য স্বতস্ফূর্ত হ'লেও, সমালোচন মানসিকতার প্রকাশ বাঙালীর জীবনচর্যায় সম্ভবতঃ তত সুপ্রকট নয়।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য তো নিতান্তই আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাঙালীর নিজস্ব সমালোচনা পদ্ধতি কিংবা অলঙ্কার শাস্ত্র গড়ে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। সংস্কৃত সমালোচনা পদ্ধতিতেই বাঙালী সমালোচক নিজ সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন করেছে, আর তার সমালোচনা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রক হয়েছে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে এখনো এই বিশের শতকেও রবীন্দ্রকাব্যের গতানুগতিক কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণে প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিক দণ্ডী বা বিশ্বনাথ কবিরাজেরই শরণাপন্ন হ'তে হয়। গতানুগতিক এবং সনাতন কাব্য-দৃষ্টির জন্যই বাংলা কাব্যতত্ত্বেরও অনুরূপ দুরবস্থা—কাব্য সম্পর্কে পুরাতন ধারণা যতদিন বলবৎ থাকবে, পুরাতন কাব্যবিচার ধারাও ততদিন অব্যাহত থাকতে বাধ্য।

যুগপৎ কাব্যে এবং সমালোচনায় এলিঅটের সক্রিয় আবির্ভাবের পর ইংরেজি সাহিত্যে কাব্য সম্পর্কে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। বাংলায় অনুরূপ পরিবর্তন সূচিত হয় কল্লোল যুগে, এই শতাব্দের তিরিশের দশকের গোড়ায় এলিঅটীয় কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত কবিগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায়। তার পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে একটা স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল : সে-কাব্যাদর্শের মূলে ছিল প্রাক্-এলিঅটীয় ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের রোমাণ্টিকতার প্রভাব। তাহলেও বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে-ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তা অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যে অনন্য। ছন্দের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত কাব্য ও ভাষার প্রভাব কাটিয়ে উঠে স্বতন্ত্র ধারা আনয়নে সফল হয়েছিলেন, ছড়ার ছন্দকে বাঙালীর জাতীয় ছন্দ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতেও পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তথা কবিকৃতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কাব্যবিচারে সর্বপ্রথম গতানুগতিকতা অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখালেন মনস্বী সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রাচ্য আদর্শে দুর্লভ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর 'জীবনদেবতা', 'রাজা', 'ডাকঘর' প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিনির্ভর উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রবন্ধ। প্রকাশিত কাব্যসমূহের আন্তর্বিশ্লেষণের সাহায্যে রবীন্দ্র কবি-মানসের এক অবিতথ সুসম্বন্ধ ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। ইংরেজি সমালোচনা ও সৃষ্টিধর্মী উভয় সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তি তাঁকে ইংরেজি সমালোচনার আদর্শে রবিপ্রতিভা মূল্যায়নে সাহায্য করেছিল। অজিতকুমারকে অনুসরণ ক'রে অচিরেই কাব্য মূল্যায়নের একটা উল্লেখযোগ্য ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধারার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কাব্য মূল্যায়ন কালে কাব্যকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে কবির সমগ্র সৃষ্টির

পটভূমিকায় তথা সমগ্র কবিসত্তার এক আংশিক প্রকাশরূপে দেখতে হবে। মন্তব্যটা একটু রূঢ় শোনাতে পারে, কিন্তু যথাযথ সত্যের উপস্থাপনে একথা বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে রোমান্টিক যুগের ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য-বিশ্বাসের মূলে এলিঅট চরম কুঠারাঘাত হানলেন। কোনোরকম ভণিতা না ক'রে তিনি সোজাসুজি ফতোয়া জারি করলেন, কবিতাকে মূলতঃ কবিতারূপেই গ্রহণ করতে হবে, অন্য কোনোরূপে নয় :

> ···with the repeated assertion that when we are considering poetry we must consider it primarily as poetry and not another thing.[৩]

কথাটা খুব সহজ মনে হ'লেও এবং ততোধিক হাল্কা মেজাজে কথিত হ'লেও এর নিহিতার্থটা হাল্কা নয়, এর গভীর প্রতিক্রিয়া অবশ্যই অনুমেয়। ঐ সাধারণ ছোট্ট কথায় এক যুগান্তকারী ইঙ্গিত দিলেন এলিঅট, কবিতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী সমগ্র বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই বিষয়বস্তু অভিমুখে ঘুরিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। কবিতাকে কবিতারূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে কাজে লাগে না সমালোচনায় এমন সব অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণাও সেই সঙ্গে রহিত হল। মনে হয় শব্দের মধ্যে অনেক কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা নিহিত আছে এরকম সম্ভাবনার প্রতি একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত এলিঅটের এই উক্তির মধ্যে ছিল। যাই হোক, কবিতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা না দিয়ে কবিতাকে কবিতারূপেই গ্রহণ করতে বলার যৌক্তিকতা নেই, তাই ঐ আলোচনারই পরবর্তী অংশে এলিঅট কবিতা সম্পর্কে একটা স্পষ্টতর ধারণা দিয়েছেন :

> And certainly poetry is something over and above, and something quite different from, a collection of psychological data about the minds of poets, or about the history of an epoch ; for we could not take it even as that unless we had already assigned to it a value merely as poetry.

এলিঅটের এই প্রয়াস নেতির মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া। বলা-বাহুল্য, এলিঅট তাঁর 'প্রুফ্রক', 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' প্রভৃতি কবিতায়ও নেতির সূত্রে অনুস্যূত কাব্যিক আক্রমের মধ্য দিয়েই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কবিতা কী নয় সে-সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দেওয়ার মধ্য দিয়েই কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে পাঠক-মনে একটা নিশ্চিত বোধ জাগিয়ে তুলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে

এরই মধ্যে আর একটু খোঁচা দিয়ে বসলেন প্রচলিত কাব্যতত্ত্বের ওপর, কবিতা অবশ্যই কবিমনের মনস্তাত্ত্বিক তথ্যসমূহ থেকে অনেকখানি ঊর্ধ্বের এবং অনেকখানি ভিন্নও। এর পাশাপাশি অজিতকুমার চক্রবর্তীর সমালোচনা প্রবন্ধ 'গীতিমাল্য' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ উৎকলিত হচ্ছে এলিঅটের বক্তব্যের গুরুত্ব ও পার্থক্য অনুধাবনের জন্য :

> পাশ্চাত্যদেশে অধুনা মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় subliminal consciousness বা মগ্নচৈতন্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিচিত্র তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন ইহার যেরূপ সুস্পষ্ট উদাহরণ এমন বোধহয় দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। কোনো কবির কাব্য যে তাঁহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কোনো কবির জীবনে ঘটিয়াছে কি না জানি না। সেই জন্যই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার সময়ে তাঁহার জীবনের কথা বেশি করিয়া পাড়িতে হয়। ইহাকে অনেকে ব্যক্তিগত আলোচনা মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুত ইহা তাহা নহে।[৪]

অজিতকুমার এবং এলিঅট উভয়েই সমসাময়িক, সাহিত্য সৃষ্টিতেও সময়ের ঐক্য আছে,[৫] কিন্তু মানসিকতায় দুস্তর ব্যবধান অনস্বীকার্য। রোমান্টিক যুগীয় সমালোচনা ও মূল্যায়ন রীতিতে বিশ্বাসী অজিতকুমার রবীন্দ্র-কাব্য তথা কবিমনের মূল্যায়নে কবির 'মগ্নচৈতন্যের ক্রিয়া' ও 'জীবনের কথা'-র ওপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে রোমান্টিকতা-বিরোধী রীতির প্রবক্তা এলিঅটের অকপট ঔদাসীন্য কবিতাকে কবির মানস-বিবর্তনের ফলশ্রুতিরূপে গ্রহণে। এলিঅটের পাঠকেরা জানেন যে তিনি এখানেই ক্ষান্ত হন নি। পরবর্তী স্তবকে 'জীবনের কথা'-র বিরুদ্ধেই প্রতিবাদের খড়্গ তুলেছেন কাব্যতত্ত্বের ধড় থেকে জীবন-তথ্যের অংশটুকু ছেঁটে ফেলতে :

> We can only say that a poem, in some sense, has its own life ; that its parts form something quite different from a body of neatly ordered biographical data ; that the feeling, or emotion, or vision, resulting from the poem is something different from the feeling or emotion or vision in the mind of the poet.[৬]

সুচারুরূপে গ্রথিত জীবনতথ্য থেকে কবিতার ভিন্নতর নিজস্ব অস্তিত্ব

স্বীকার ক'রে নেওয়া কিংবা কবিমনের অনুভূতি বা আবেগ বা কবিদৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করা প্রাক্-এলিঅটীয় যুগে সম্ভব ছিল না। রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে' উক্তির সঙ্গে এলিঅটের উপর্যুক্ত চিন্তাধারার আপাত সাদৃশ্য আছে ব'লে মনে হ'তে পারে। বিশ্বকবি কবিসত্তাকে কবির ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিন্দা-প্রশংসার অতিরিক্ত ব'লে অনুভব করেছেন। সংসারের গণ্ডিতে যে ব্যক্তি-মানুষটি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা, বস্তু-সংসারের বোঝায় প্রতিনিয়তই পর্যুদস্ত এবং নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত, সে আর যেই হোক কবি নয়।

বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।...
মানুষ-আকারে বন্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে, ('২১', উৎসর্গ)

রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীত ও বৈষ্ণব কবিতার নজির টেনে সর্বত্রই কবির প্রতি অনুরূপ আধ্যাত্মিক আরোপ প্রবণতার 'অ-সম্যগ্‌দৃষ্টি' দেখেই বাইরের দিক থেকে বিচার না করার সকাতর কাকুতি নিয়েই এই কবিতাটি রচিত।[৭] কবিসত্তা বাস্তব ব্যক্তিসত্তার অন্তরালে গোপনচারী 'স্বপন-মুরতি', যার স্বরূপ কবির নিজের কাছেই অবোধ্য, অন্যকে বোঝানোও দুঃসাধ্য।

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে।

কবিতার স্বরূপ বোঝানোও যে সহজ নয়, এলিঅটের আলোচনা থেকে ত প্রতিপন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিসত্তাকে ব্যক্তিসত্তা থেকে পৃথক ক'রে দেখেছেন, এলিঅট উপর্যুক্ত উভয় সত্তা থেকেই কবিতাকে পৃথক ক'রে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিহিত কবিসত্তা কবির অনুভূতি বা আবেগ বা কবিদৃষ্টিরই সংহত রূপ:

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘগর্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে রাজে
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া—
আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে
গরজি ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে মাতিয়া ;

এলিঅট কবির এই অনুভূতি বা কবিদৃষ্টি থেকেই কবিতাকে পৃথক ক'রে দেখেছেন। একই কারণে তিনি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য সম্পর্কিত অভিধাও, emotion recollected in tranquillity, গ্রহণ করতে পারেন নি, ব্যক্তিগত অনুভূতি-রোমন্থনের ব্যক্তিবিশেষীয় রীতির ছাপ-মারা ব'লেই। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা কবি ও সমালোচকের কাছে এটাই ছিল অপেক্ষিত। কবির মনস্তাত্ত্বিক তথ্য ও জীবনতথ্য দুটোকেই তিনি পরিহার করেছেন কবিতার যথার্থ নৈর্ব্যক্তিক মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্য। কবিতাকে মুক্ত আবেগের কিংবা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ না ক'রে আবেগ ও ব্যক্তিত্বমুক্ত সৃষ্টিরূপে গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি,

> Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion ; it is not the expression of personality, but an escape from personality.[৮]

ঐতিহ্যবিরোধী এলিঅটীয় কাব্যতত্ত্বের রীতিমতো অনুচারণার ফলে বাংলা সাহিত্যেও কাব্যতত্ত্বের পুনর্বিন্যাস ঘটল। কাব্য সম্পর্কে ধারণা কি রকম পরিবর্তিত হল এবং কিভাবে কাব্য মূল্যায়নে পরিবর্তিত কাব্যতত্ত্ব প্রভাব বিস্তার করেছে তার সামান্য নমুনা দিচ্ছি পরবর্তী কালের প্রখ্যাত ছান্দসিক ও সমালোচক ড. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদের বাংলা কবিতার মূল্যায়ন বিষয়ক আলোচনা থেকে :

> ···আধুনিক বিবেচনায়, গদ্যের অনুসরণে একটা সুসম্বদ্ধ প্রস্তাব রচনা করা কাব্যের কাজ নয়, আমাদের গভীরতর সত্তাকে মন্থন ক'রে যে রসের সৃষ্টি হয় বা যে উপলব্ধির উদ্রেক হয় তারই আভাস দেওয়া কাব্যের কাজ। সচেতন মনের যুক্তিবদ্ধ রচনা দিয়ে আমাদের

অবচেতন মনের গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করা যায় না, সে কেবল 'পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।' এই ইঙ্গিতেই 'মিলয়ে তারে, তর্কে বহুদূর।' সুতরাং ইঙ্গিতের কৌশলই হল কাব্যকলা এবং সেই ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য হল আমাদের অবচেতন মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিল্পীর যাদুস্পর্শে একটা সুর জাগিয়ে তোলা। চিরাচরিত বহুপ্রযুক্ত কাব্যালংকারের এমন ক্ষমতা নেই যে, আমাদের এই অবচেতন সত্তাকে প্রবুদ্ধ করতে পারে। তাই কবিকে কিছু কিছু নূতন কৌশল অবলম্বন করতে হয় যাতে একটা অভাবনীয় হঠাৎ স্পর্শে, একটা আকস্মিক ভাবের সংঘাতে আমাদের চিত্তে একটা আন্দোলন দেখা দেয় এবং সেই আন্দোলনের তরঙ্গ আমাদের সত্তার গভীরতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। এইজন্য আধুনিক কবিরা অনেক সময়ই এমন সব উপমা ও রূপক প্রয়োগ করেন যাদের মধ্যে ঔচিত্য ছাড়া একটা অভাবনীয়তাও আছে। কাব্যের চিরাচরিত প্রথা ও ঐতিহ্যের রীতি ইচ্ছা করেই কবি উল্লঙ্ঘন করেন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের শিল্প সংস্কারকে আঘাত ক'রে মনে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করা এবং আমাদের অনুভূতির পরিধি প্রসারিত করা। [৯]

উদ্ধৃতাংশটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও এখানে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যকলা ও প্রকরণের পার্থক্যের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। অতীতে কাব্যের উদ্দেশ্য যা ছিল আজ আর তা নেই। একদা মনের ওপরতলার সুকুমার বৃত্তির প্রতিক্রিয়াই ছিল কাব্যের উপাদান, আধুনিক কালে অনুসন্ধানী দৃষ্টি আরো গভীরে প্রসারিত। ফলে কবিতা শুধুই আর শব্দ কিংবা ছন্দচাতুর্যেরই প্রকাশ ব'লে বিবেচিত হল না, অবচেতন মনের অনুভূতির বার্তাও বহন ক'রে নিয়ে এল। বলা বাহুল্য, আধুনিক কবিতায় মনস্তত্ত্বের যে-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা উপযুক্ত আলোচনায় যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনাটি ষাটের দশকের প্রাক্কালে লিখিত হলেও উদ্ধৃতাংশে আলোচ্য তিরিশের দশকের কাব্যবৈশিষ্ট্যেরই আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক কবিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে কবি বিষ্ণু দে রচিত 'টপ্পা-ঠুংরি' (১৯৩৫) কবিতার সবিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গেই ঐ মন্তব্য। অনুরূপ মন্তব্য অনায়াসে কবি এলিঅটের

প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' কিংবা 'জেরনশান' প্রসঙ্গেও সমভাবে প্রযোজ্য। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আর কোনো বাধা থাকে না যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে বিশের দশকে যে কাব্যবৈশিষ্ট্য (আলংকারিক অভিধায় কাব্যতত্ত্ব) ইংরেজি কাব্যে ফুটে উঠেছিল, তা-ই আলম্বন রূপে দেখা দিয়েছিল তিরিশের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতায়। এলিঅট তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত অভিনব ও অ-গতানুগতিক কাব্যবৈশিষ্ট্যকে (ফরাসী কবিতার ধারা স্মরণে রাখলে অবশ্য এলিঅটীয় কাব্যবৈশিষ্ট্যকে অভিনব বলা অ-সমীচীন) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর কাব্যালোচনায়। বাংলা কাব্যধারায়ও অভিনব তথা অ-গতানুগতিক কাব্যবৈশিষ্ট্যের পক্ষ সমর্থনে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ তিরিশের দশকেব কবিকেও এলিঅটের কাব্যতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবে এলিঅটের মতো সব্যসাচী-ভূমিকা নেওয়া কোনো বাঙালী কবির পক্ষেই সম্ভব হয় নি ব'লে অনেকে মিলে সামগ্রিকভাবে তাঁরা রক্ষণশীল আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প'ড়ে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তিরিশের দশকের বাংলা কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কাব্যতত্ত্বের ভিত্তিভূমি রচনায় এফ. আর. লীভিসের মতো ডঃ অমলেন্দু বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ বিদগ্ধ সমালোচকের সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। পরবর্তী কালে এলিঅটীয় কাব্যতত্ত্বালোচনার ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

সমালোচনা সাহিত্য মৌলিক সাহিত্যের অনুসরী। কবিতা, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি সাহিত্যের সৃজনী শাখায় উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এলে কিংবা সমৃদ্ধি এলে তবেই সাধারণতঃ সমালোচনার উদ্ভব হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কাব্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। বৃন্দাবন প্রবাসী তিন বাঙালী বৈষ্ণব মহাজন সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী বৈষ্ণবীয় কাব্য, দর্শন, তত্ত্ব ও রসের ভাষ্য রচনা করেছিলেন সংস্কৃতে। বাংলায় কাব্য-রচয়িতারা পূর্বসূরীর বিশিষ্ট গ্রন্থাদির উল্লেখ মাঝে-মধ্যে করলেও তার মধ্যে মূল্যায়নের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সশ্রদ্ধ উক্তি বা প্রশস্তিবাচন মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইংরেজি সাহিত্যেব সংস্পর্শে আসার ফলে বাংলা সাহিত্যেও নব-নব সৃষ্টির উৎস খুলে যায়। ঐ শতাব্দীরই মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে গদ্যে পদ্যে যে-জোয়ার আসে তা ইংরেজি

সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অভিঘাতেরই ফলশ্রুতি। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যও ইংরেজি অভিঘাত থেকেই উৎসারিত।[10] সূত্রপাতের পশ্চাতে যে-কারণই নিহিত থাক অত্যল্প কাল মধ্যেই আধুনিক বাংলা কাব্য কিংবা কথাসাহিত্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে একাধিক স্রষ্টার প্রতিভাস্পর্শে, সমালোচনা সাহিত্যও ধারা-স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পেয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলা সাহিত্যের সব কটি ধারাই সমৃদ্ধ, সমালোচনার ধারাটিও হয়ে উঠেছে অবশ্যই স্বীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যনির্ভর।

মহাযুদ্ধোত্তর কালে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যও, বিশেষত; কাব্য, বাঁক নিতে সুরু করে। এলিঅটীয় কাব্যাদর্শের অভিঘাতে তিরিশের দশকে বাংলা কাব্য পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের নির্মোক ঝেড়ে ফেলে নূতনতর ঐতিহ্য বরণ ক'রে নেয়। এই ঐতিহ্যের কবিতা বর্তমান সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করেই হল দুরূহ, তাতে ভর করল যন্ত্রযুগের জটিলতা ও বৈচিত্র্য। সে-কারণেই এ-যুগের কাব্যের ভাষ্যরচনায় প্রাক্-যুদ্ধকালীন সমালোচনা পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি অসম্পূর্ণ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মৌলিক সাহিত্যের পরিবর্তিত ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন প্রয়োজন :

> যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টাতেই পদ্ধতি কালোপযোগী হওয়া দরকার নতুবা সত্যানুসন্ধান বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সেজন্য বাঙালী সমালোচকের পক্ষে আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অনবহিত থাকা শোচনীয়।...টেকনিকের সঙ্গে সমাজ-বিবর্তনের অসাঙ্গী সম্পর্ক, এ কথা যেমন অর্থনৈতিক উৎপাদনের বেলায় সত্য, মননক্রিয়াতেও তেমনি অধিকাংশে গ্রাহ্য। অতএব সমালোচনায় নব্যপদ্ধতি-অবলম্বন বাঙালী সমালোচকের পক্ষে ফ্যাশান নয়, প্রয়োজন। বাঙালী সমালোচকের হাতিয়ার বাড়াতে হবে। তাঁর তূণীরে বাণ হবে বহুসংখ্যক, কালোপযোগী।[11]

কবি টি. এস. এলিঅট স্বীয় কাব্যাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, নিজ বিশিষ্ট কাব্যতত্ত্বের ভাষ্য রচনা ক'রে তাদের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেছিলেন এবং সর্বোপরি স্বীয় কাব্যাদর্শের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী কবিদের পুনর্মূল্যায়ন করেছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁর পুনর্মূল্যায়নের জন্যই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের সাহিত্যরসিকেরা নূতন ক'রে ভাবতে

সুরু করে ডন, ড্রাইডেন, মিলটন কিংবা মেটাফিজিকল্ পোয়েটস্ অথবা জ্যাকবিয়ান ডামাটিস্টদের সম্পর্কে। সমালোচনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে এলিঅটের কবিখ্যাতির মতোই সমালোচক-খ্যাতিও অবিসংবাদিত। অত্যল্প কালের মধ্যেই তাঁর এই খ্যাতি স্বদেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। দুটি ইতালীয় সাময়িক পত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এলিঅটীয় ভূমিকা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ থেকে ইয়োরোপীয় ধারণার একটা স্পষ্ট আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। ১৯৪৯ সালের '*The Partisan Review*'-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় Delmore Schwartz এলিঅট সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

> When we think of the character of literary dictators in the past, it is easy to see that since 1922, at least, Eliot has occupied a position in the English-speaking world analogous to that occupied by Jonson, Dryden, Pope, Samuel Johnson, Coleridge, and Mathew Arnold. [১১]

১৯৫৬ সালের '*The Sewance Review*'-এর জুলাই সংখ্যায় Rene' Wellek লিখেছিলেন (ঐ গ্রন্থেই সঙ্কলিত, পৃ ২৬২-৬৩) ;

> T. S. Eliot is by far the most important critic of the twentieth century in the English-speaking world. His influence on contemporary taste in poetry in most conspicuous : he has done more than anybody else to promote the 'shift of sensibility' away fron the taste of 'Georgians' and to revalnate the mojor figurers and periods in the history of English poetry.

এলিঅট তাঁর কাব্যাদর্শের ভাষ্য রচনায় অনেকগুলি অভিধা রচনা করেছিলেন। 'objective correlative', 'unified sensibility', 'association of ideas', 'tradition', 'historical sense' প্রভৃতি অভিধা পরবর্তীকালে কাব্যমূল্যায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

একথা স্বীকার্য বাংলা সাহিত্যের সমালোচকরূপে এলিঅট সদৃশ

ভূমিকা[১৩] নেওয়া সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু কিংবা জীবনানন্দ দাস কারুর পক্ষেই সম্ভব হয় নি। এমন কি, সমালোচনার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ উল্লেখযোগ্য কোনো বিশিষ্ট রীতির প্রতিষ্ঠাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। জীবনানন্দ কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয় 'এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনা' সঞ্চারিত করেছিলেন, অনুরূপ 'উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনা' সঞ্চারিত হয়েছে কবিতা ও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। এই সমস্ত প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে এলিঅটের কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিধা ও সিদ্ধান্তের অনুরণনও অনুভূত হয়; কিন্তু কাব্যতত্ত্বের কোনো ধারা প্রবর্তনে ঔদাসীন্য জীবনানন্দের, স্বীয় কাব্যতত্ত্বের নিরিখে প্রাচীন অর্বাচীন কবি ও কাব্যের পুনর্মূল্যায়ন ক'রে স্বকীয় কাব্যধারার প্রতিষ্ঠায়ও ততোধিক অনাগ্রহ। কাব্যরীতি ও সমালোচনায় সুধীন্দ্রনাথের ধারাস্বাতন্ত্র্য অবিসংবাদিত. কিন্তু অনুগামীর অভাবে তাঁর এই ধারা বাংলা সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রেই একক রীতির স্বীকৃতি অতিক্রম ক'রে বিশিষ্ট ধারারূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সুধীন্দ্রনাথের বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতার গভীর ব্যাপকতা অনস্বীকার্য। স্বদেশ ও বিদেশের সমসাময়িক ও পূর্বসূরী উল্লেখযোগ্য কবিদের কাব্যরীতি ও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও অনুশীলনে তিনি নিরলস। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যতত্ত্ব তাঁর কাব্যরীতির মতোই একক প্রাতিস্বিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিষ্ণু দে কিন্তু কাব্যালোচনায় ও কাব্যমূল্যায়নে কাব্যতত্ত্বের এমন কিছু সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করেছেন যা থেকে এলিঅটীয় কাব্যতত্ত্বের অনুরণন সহজেই অনুভূত হয়। ঐতিহ্য তথা ইতিহাস চেতনার কাব্যতত্ত্ব বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যেও রূপায়িত করেছেন ঃ

ও নয় সমুদ্রযাত্রী সপ্ত সমুদ্রের পারে
বাণিজ্য চণ্ডীর দীর্ঘ আরাধনা,
খালের পুঁটি কি দেখে কমলে কামিনী,
দাস পায় প্রভুর সাধনা ?
কোথায় চার্চিল কোথা সেসিল্ রসেল
মাউণ্টবাটেন হেস্ অভিজাত ইংরেজের ফরাসীর
কোথায় তুলনা এই সোনার বাঙলায় ?
কোথায় নর্মান্ ক্ষিপ্র লুটেরার বংশধর সুজলা সুফলা

ভারতের নরম পলিতে হারুণ আল্ রসিদও স্বপ্ন—
এখানে কিছুই নেই সামন্তবিলাস শুধু ধোঁয়া
আবুহোসেনের স্বপ্ন এখানে কাহিনী শুধু ফাঁকি
বহরের স্ফীতি আর পানাহার নারীর দেহের শুধু নির্লজ্জ সন্ধান
এখানে বুর্জোয়া বাবু নববাবু, ব্যবসা চালাকি,
সাম্রাজ্য বুদ্বুদ, সার্থক জনম মাগো
হুতোমের খেয়াল অদ্ভুত, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া
('টাইরেসিঅস'/না ম রে খে ছি কো ম ল গা ন্ধা র)

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বাংলা কাব্যের দীর্ঘ উত্তরাধিকার অঙ্গীকার ক'রে নিয়েই এই কবিতা রূপ গ্রহণ করেছে। মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্য থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে উনিশ শতকীয় ভবানীচরণ-কালীপ্রসন্ন-মধুসূদন পর্যন্ত যে-দেশজ ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যের তার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত যেন নিহিত এই কবিতায়। বাঙালী কবির ঐতিহ্যানুরক্তি যে এলিঅট প্রভাবিত সে-সিদ্ধান্তের সমর্থন আছে বিষ্ণু দে-রই সাক্ষ্যে:

> It is not a paradox to say, and such is the measure of Mr Eliot's influence, that Mr Eliot has been of great help in realising this active, creative, dialectic of our tradition.[১৭]

সক্রিয় নির্মাণক্ষম বিবর্তনশীল বঙ্গীয় ঐতিহ্য অনুধাবনে তিরিশের দশকের কল্লোলযুগীয় কবিদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল এলিঅটের ইতিহাস-চেতনা সম্পৃক্ত ঐতিহ্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কাব্যতত্ত্বের সেই বিখ্যাত সিদ্ধান্তটি:

> · the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order.

এলিঅট ব্যাখ্যাত পরম্পরা বা ঐতিহ্যবোধ বিষ্ণু দে-র কাব্যস্বভাবে সঞ্চারিত। ১৯৪৪ সালের 'কেন লিখি?' পর্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি

অকপটেই তাঁর কবিসত্তায় বঙ্গীয় ঐতিহ্য অঙ্গীকরণের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। যে-ঐতিহ্য অনুসৃত হয়েছে আদিযুগের চর্যাপদ থেকে উনিশ শতকের ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধু পর্যন্ত এবং বাংলা সাহিত্যের ভবিতব্যও এই পথেই নিহিত।

> আর চেষ্টা করি চর্যাপদ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু অবধি যে বাংলা লৌকিক সাহিত্য পাই তার মধ্যে উৎস খুঁজে পেতে। ঐ ঐতিহ্যেই ব্যাপক বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সেখানেই বাংলার জনসাধারণ নিজের মনকে, মেজাজকে, সরস বস্তুবাদকে রূপ দিয়েছে। [১৫]

বিষ্ণু দে বাংলা কাব্যের এই প্রকৃত ঐতিহ্য তথা দেশজ রীতির নিরিখে যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্তের পুনর্মূল্যায়ন ক'রে তাঁকে কাব্যমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধে। [১৬] প্রতিপাদ্য এই : 'গত শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত বাঙালী···পরম উৎসাহে নতুন শিক্ষায়' মেতেছিল। 'সমাজব্যবস্থায় মোড় ফেরার সময় তখন, নতুন শিক্ষায় ছিল জীবিকার ভরসা এবং নতুন জীবনযাত্রার আশা।' ফলে 'আজ আমরা শিক্ষিত শ্রেণীর বিড়ম্বিত কাব্যসাধনার চূড়ান্তে এসেছি।' রোমান্টিক ধারার অনুশীলনই 'বিড়ম্বিত কাব্যসাধনা'। 'ঐতিহাসিক বোধের অভাব এবং মধ্যবিত্ত কুরুচি'-র ফলে রোমান্টিক ধারা আশ্রয় ক'রে বাংলা কাব্য তার ঐতিহ্য তথা দেশজ রীতি থেকে দূরে সরে গেছে।

জীবিকার এবং নতুন জীবনযাত্রার 'সে আশাভরসার চেহারা আজকে স্পষ্ট হয়েছে অনেক নৈরাশ্যের সংঘর্ষে'। মোহভঙ্গ হয়েছে রোমান্টিকতা সম্পর্কেও। আজ 'আমাদের সংস্কৃতির ক্ষুরধার চূড়ায় সামাজিক সমর্থনের আশ্রয় নেই অথচ সমাজ জীবনের মরিয়া তাগিদে আমাদের ব্যক্তিত্ববাদের দোরগোড়ায় হানা দিচ্ছে। আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা' এবং 'তাই আজকে আমাদের উত্তরাধিকার আবিষ্কার করতে হলে যাঁদের রচনাবলী বিচার করতে হবে, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ মর্যাদা।' কারণ, 'দেশজরীতি বা কনভেনশনেই তাঁর কবিত্বের শক্তি।' শুধু তাই নয়, 'গত শতাব্দীর কণ্টকিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই ঐতিহ্যরক্ষায় এক দিকপাল।···বাক্য-বিন্যাসের দেশজরীতি আজও আমরা ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে খুঁজতে পারি, যেমন

পারি বস্তুনির্ভর সাধারণ সুস্থবুদ্ধির সরসতা।'

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য-প্রতিভার পুনর্মূল্যায়ন তথা অনুরূপ ঐতিহ্য-অন্বীক্ষা বিষ্ণু দে এলিঅটীয় নিদর্শন থেকেই আহরণ করেছিলেন ব'লে অনুমিত হয় ঃ

> ইংরেজি, ইওরোপীয় এবং আমাদের নিজেদেরই সাহিত্যের ঐতিহ্য সন্ধানে তাই এলিঅটের নিদর্শন শ্রদ্ধেয়। এবং এ সন্ধান একরকম নির্মাণ, কর্মিষ্ঠ পরিবর্তন. একথা এলিঅটই অত ভালো ক'রে সাহিত্য-প্রসঙ্গে বলেন প্রথমে।[১৭]

অবশ্য পুনর্মূল্যায়ন রীতি আহরণ করেছেন এলিঅটের 'দি মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস' থেকে। ঐ প্রবন্ধে এলিঅট ডন্, ক্র্যাশ, ভন্, হার্বার্ট, প্রমুখের 'মেটাফিজিক্যাল' অপবাদ ঝেড়ে ফেলে তাঁদের কাব্যধারাকে ইংরেজি কাব্য-ধারার প্রত্যক্ষ স্রোতের অঙ্গীভূত রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন ঃ

> **May we not conclude, then, that Donne, Crashaw, Vaughan, Herbert and Lord Herbet, Mervell, King, Cowley at his best, are in the direct current of the English Poetry, and that their faults should be reprimanded by this standard rather than coddled by antiquarian affection.**

পরবর্তী কালে রোমান্টিক ধারার অভ্যুত্থানের ফলে ডন প্রমুখের ভূমিকা খর্ব ক'রে দেখার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এবং জনসন প্রমুখের সমালো-লোচনার ফলে ডনেরা অনেকাংশে অবজ্ঞেয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের এই অবজ্ঞার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে ইংরেজি কাব্যধারায় স্থায়ী পুনর্বাসন মুখ্যতঃ সমালোচক এলিঅটের একক কীর্তি। বাংলা কাব্যধারায়ও রবীন্দ্র-প্রভাবিত রোমান্টিকতার প্রাদুর্ভাবে গুপ্তকবির ভূমিকা অবহেলিত হয়েছিল। এলিঅটের মতো পুনর্বাসন না হলেও গুপ্তকবির যথার্থ ভূমিকা নির্দেশের আন্তরিক প্রয়াস করেছেন বিষ্ণু দে। আর একটা দিকও আছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি বিষ্ণু দে রোমান্টিক ধারা-উত্তরণ প্রয়াসী। তাঁর অনুশীলিত কাব্যধারার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ধারার একটা সাদৃশ্য ছিল। উভয়েরই লক্ষ্য আবেগমুক্ত বস্তুবাদ এবং 'বাক্যবিন্যাসে দেশজরীতি' তথা 'দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধন'। তাই বাংলা কাব্যধারায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিষ্ঠা পক্ষান্তরে

বিষ্ণু দে-র স্বীয় কাব্যধারারই প্রতিষ্ঠা ; ডনের পুনর্বাসনের মধ্যেও অনুরূপ এলিঅটীয় বাসনা :

> Hence we get something which looks very much like the conceit – we get, in fact, a method curiously similar to that of the 'metaphysical poets', similar also in its use of obscure words and of simple phrasing

পুনর্মূল্যায়ন প্রয়াস থেকেই বুদ্ধদেব বসুর 'মাইকেল' এবং বিষ্ণু দে-র 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স' প্রবন্ধ দুটি রচিত। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিকৃতির মূল্যায়নে যে-নঙর্থক প্রবণতা অবলম্বিত হয়েছে[১৮] তা অনেকাংশে এলিঅটের মিল্টনের কবিকৃতি মূল্যায়নে রচিত প্রথম প্রবন্ধটির (রচনাকাল ১৯৩৬) অনুরূপ। উভয় আলোচনার যে-সমস্ত বক্তব্যে নৈকট্য প্রকটিত সেগুলি এখানে পাশাপাশি তুলে দিচ্ছি :

> While it must be admitted that Milton is a very great poet indeed, it is something of a puzzle to decide in what his greatness consists. On analysis, the marks against him appear both more numerous and more significant than the marks to his credit. (*Selected Prose*, p. 123)

> মাইকেলের খ্যাতির সঙ্গে মাইকেলের কীর্তির সমমাত্রা-সূত্রের সম্বন্ধ নয়।·· তাঁর ঘটনাবহুল নাটকীয় জীবন, জীবনের শোকাবহ সমাপ্তি তাঁর প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেছে ; এবং সম্প্রতি আমাদের সাহিত্য ও বঙ্গমঞ্চে পুনরুজ্জীবিত মাইকেলের যে ছবি ফুটেছে তার দিকে ভালো করে তাকালে এ কথা মনে না করে পারা যায় না যে বাঙালী আসলে তাঁর কবিকর্ম সম্বন্ধে ততটা উৎসাহী নয়, যতটা তাঁর জীবনীর অসামান্য চিত্রলতা সম্বন্ধে উৎসাহী। (সা হি ত্য চ র্চা, পৃ. ২৮)

> His greatness as a poet has been sufficiently celebrated, though I think largely for wrong reasons, and without the proper reservation. (p. 123)

সত্যি বলতে, মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার। কর্মফল তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে সেই ভুল স্বর্গে, যেখানে মহত্ত্ব নিতান্তই ধরে নেয়া হয়, পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না।···আধুনিক বাঙালী পাঠকে মাইকেলের রচনাবলী পড়ে এ মীমাংসায় আসতে বাধ্য যে তাঁর নাটকাবলী অপাঠ্য···, মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমনকি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাঙ্গনা কাব্যেও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। (পৃ. ২৮)

At no period is the visual imagination conspicuous in Milton's poetry. (p. 124)

···whereas Milton may be said never to have seen anything. (p 129)

মৃত শব্দরাজিতে আকীর্ণ বলেই মাইকেলি কলরোল কানেই শুধু পৌঁছায়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না···(পৃ. ৩৭)

For Milton, therefore, the concentration on sound was wholly a benefit. (p. 129)

(মাইকেল) কখনোই চোখে দেখে লিখতে পারেন নি। (পৃ. ৩৭)

Thus it is not so unfair, as it might at first appear, to say that Milton writes English like a dead language. (p.126)

মাইকেল শুধু ভাষার আওয়াজ শুনতেন।···আর আওয়াজটাও খুব কড়া রকমের হওয়া চাই···তার ছবিটা দেখতেন না, ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ অনুভব করতেন না। (পৃ. ৩৬)

The full beauty of his long periods can hardly be enjoyed while we are wrestling with the meaning as well ; and for the pleasure of the ear the meaning is hardly necessary, except in so far as certain key-words indicate the emotional tone of the passage (p. 129)

···তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতে কলাকৌশল যেন কলকব্জার মতো কাজ করে ; এইজন্যই তাঁর অনুপ্রাস শিশুতোষ, উপমা দ্যুতিহীন,

পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। (পৃ ৩৬)

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে একথা স্বতঃই প্রমাণিত যে উভয় প্রবন্ধে পূর্ববর্তী কবির কবিকৃতির পুনর্মূল্যায়নে একই ধরণের আলোচনাধারা অনুসৃত। প্রতিষ্ঠিত কবির প্রতিষ্ঠা নশ্যাৎ ক'রে কাব্যের, কাব্যরীতির ও কবিপ্রকৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা অপূর্ণতার দিকটি উদ্ঘাটিত করার প্রবণতা উভয়তঃ। এলিঅট মিল্টনের যে-ক্ষতিকারক প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, অনুরূপ সিদ্ধান্ত বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধেও অনুভূত। তবে মাইকেলের ধারা যে বাংলা কাব্যে ফলপ্রসূ হয় নি সে-ইঙ্গিত আছে ঃ

> মেঘনাদি ডঙ্কানাদে তাই আগামীর আগমনী বাজলো না, তা নির্বীজ ঐশ্বর্যের উদাহরণ হয়েই থাকলো,...[১৯]

বিষ্ণু দে তাঁর 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স' প্রবন্ধে এলিঅটীয় ঐতিহ্য-চেতনার আলোকে মাইকেল প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন। ইয়োরোপীয় আদর্শে মহাকাব্য রচনার স্বপ্ন মধুসূদনের জীবনের ব্যর্থতা, করুণ ভ্রান্তি। প্রকারান্তরে দেশজ রীতির উজ্জীবন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে ; কারণ, 'তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছিল ভাষার কথনছন্দ, ভাষার দেশজ ব্যবহারের স্মৃতি।'

> বড় কথা হচ্ছে ঐ কবিত্ব, মাইকেলের মানসে কবিতা ভর করেছিল। এবং এ কবিতা প্রাণ পেয়েছিল ইএটস্-কথিত সেই মহাজননীতে, যুগ-যুগান্তব্যাপী জাতীয় জীবনে তার ভাঙন সত্ত্বেও, সমগ্র দেশের মানুষের স্মৃতিমন্থনে মিথসে বা পুরাণকাহিনীতে, মাতৃভাষায়, লৌকিক কাব্যে, রূপকথায়, যে স্মৃতির ঐশ্বর্যবিস্তার ও তীব্রতা ইঙ্গ-জাগরণের আগে ও তার পরিধির বাইরে দেশ-কালে ব্যাপ্ত।[২০]

এতদ্‌সত্ত্বেও দেশজ রীতি থেকে বাংলা কাব্য দূরে সরে গেছে মধুসূদনের পরেই। মাইকেলের দৃষ্টান্ত দেশীয় ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর করলেই আসবে বাংলা কাব্যে প্রকৃত রেনেসান্স।

> শতাব্দীতেও তাঁর প্রতিভান্বিত শিক্ষা আমরা আত্মস্থ করতে পারি নি। অথচ তা যদি করতে পারি তবেই ফিরবে আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি, রচনা করতে পারব ভবিতব্যতায় নিশ্চিত ইতিহাস, আমাদের প্রকৃত রেনেসান্স। পশ্চিম ইওরোপের স্বপ্নে আমাদের মুক্তি নেই, না ভাড়া-করা পাপের সন্ধানে, না অস্মিতার জীবন্মৃত ক্লান্তিতে, না সাম্রাজ্যবাদের বা স্বাধীন সংস্কৃতির ছদ্মবেশী হাহাকারে।

বাংলা কাব্যতত্ত্বের ধারা পরিবর্তনে উত্তররৈবিক কালের এলিঅটমাগী কবিরা সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন এখন কথা বলা সর্বাংশে সমীচীন নাও হতে পারে, কিন্তু তাঁরা উত্তররৈবিক বাংলা কাব্যতত্ত্বে এলিঅটীয় কাব্যতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পরাঙ্মুখ নন এবং এলিঅটীয় প্রথা-প্রকরণ সম্বন্ধ উত্তররৈবিক আধুনিক বাংলা কবিতা বিচারে সনাতন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব যে যথেষ্ট নয় এই আলোচনা তারই সাক্ষ্য দেয়। বাংলা কাব্যতত্ত্বের পুনর্বিন্যাসে এলিঅটের ভূমিকার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিলে বিষ্ণু দে-র এবম্বিধ বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবনও সহজতর হয় : And then came the impact of his poetry and criticism.[২১]

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. 'Tradition and the Individual Talent,' *The Sacred Wood.* p. 47

২. 'বাংলা সমালোচনার স্বকীয়তা,' সা হি ত্য চি ন্তা, পৃ. ৪০

৩. 'Preface to the 1928 Edition,' *The Sacred Wood, p. viii*

৪. কা ব্য প রি ক্র মা, পৃ. ১৩০-৩১

৫. অজিতকুমার চক্রবর্তীর জীবৎকাল ১২৯৩-১৩২৫ ; 'কা ব্য প রি ক্র মা'-র প্রবন্ধগুলি '*The Sacred Wood*,-এর প্রবন্ধগুলির সমসাময়িক কালে অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রচিত।

৬. *The Sacred Wood*, p. x

৭. র বী ন্দ্র - প্র তি ভা র প রি চ য়, পৃ. ৬৩

৮. *The Sacred Wood, p. 58*

৯ 'বাংলা কবিতা ১৯২৬-৫০,' দে শ সা হি ত্য স ং খ্যা ১৩৬৪, পৃ. ১৬৪

১০. 'ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সৃজনী অভিঘাতের অন্যতম ফল বাংলা সমালোচনা।'— 'সমালোচনার পদ্ধতি', সা হি ত্য চি ন্তা, পৃ. ৫৩

১১. ঐ, পৃ. ৫৪-৫৫

১২. 'T. S. Eliot as a Critic' (Mario Praz), *T. S. Eliot : The Man and His works, p. 262*

১৩. এলিঅটের সামালোচন প্রতিভা অস্বীকার করা হয়েছে ত্রিশ দশকের

এমন বাংলা সমালোচনারও নজির আছে।—পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪১, পৃ ১৪১-৪৪ (লেখিকা লীলা মজুমদার) দ্র.

১৪. 'Mr Eliot Among the Arjunas,' *T. S. Eliot, p. 99*

১৫. 'কেন লিখি', দৈনিক কবিতা, শরৎ

১৬. জনসাধারণের রুচি, পৃ. ৫৩-৫৯ দ্র,

১৭. 'এলিঅট প্রসঙ্গে', জনসাধারণের রুচি, পৃ ১৭৭

১৮. মধুসূদনের প্রতি বীতরাগ অবচেতন মনে ছেলেবেলা থেকেই ছিল। আমার ছেলেবেলা, শারদীয়া দেশ পত্রিকা

১৯. 'মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, পৃ ৪৩

২০. 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স', মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, পৃ. ১২

২১. 'Mr Eliot Among the Arjunas', *T, S, Eliot, P. 96*

সাত

এলিঅটে প্রতিফলিত ইয়োরোপীয় মনসিকতা
ও
বাংলা কবিতার প্রসারিত দিগ্বলয়

শিল্পবিপ্লবের উন্মাদনার পুঁজি নিয়ে ইয়োরোপ যতই বিংশ শতাব্দীর দিকে এগোচ্ছিল ততই তাব কৃষ্টি সভ্যতা জীবনদর্শন ধর্মীয়চেতনা প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রাচীন মূল্যবোধের নমনীয়তায় চরম টান পড়ছিল। ক্ষীণ যোগসূত্রটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধের চরম আঘাতে। মহাযুদ্ধোত্তর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া গেল না প্রাচীন ইয়োরোপকে। প্রাচীন মূল্যবোধগুলোও হারিয়ে গেল। মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত নড়ে উঠল, জীবনদর্শন সম্পর্কে ধারণাটাই বদলে গেল। ফলে যুদ্ধ পরবর্তী আত্মসচেতন মানসিকতায় এক অনিবার্য শূন্যতার সৃষ্টি হল; নিরালম্ব মনোভাব, অনিশ্চয়তা, সন্দিগ্ধতা, বিশ্বাসহীনত্ব প্রভৃতি মনের ওপর চেপে বসল; এবং সর্বোপরি এক তির্যক বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সব কিছুর ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের আত্মিক যোগ ছিল না। উভয়ের মধ্যে গভীর ব্যবধান ছিল ধর্মীয় চেতনায়, জীবনদর্শনে, কৃষ্টি ও সভ্যতায় এবং তৎসম্পর্কিত মূলবোধে। শিল্প বিপ্লবোত্তর কালে ভারত ঘনিষ্ঠতর নৈকট্যে উপনীত হল ইয়োরোপের। বাণিজ্যিক পণ্যের সঙ্গে-সঙ্গে আদান-প্রদান সুরু হল কৃষ্টি, সভ্যতা ও জ্ঞান-গরিমার। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ভাষা ও সাহিত্যের আদান-প্রদান সুরু, হল, সহজতর হল কৃষ্টি ও সভ্যতার আদান-প্রদান। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা ইংরেজি ভাষারীতি থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে বালা সাহিত্যচর্চার দুর্গম পথকে সুগম করলেন। সে-পথে দুঃসাহিক পদক্ষেপ ঘটল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের। উভয়েই নির্দ্বিধায় সাহিত্যরীতি আহরণ করলেন ইঙ্গ তথা ইয়োরোপীয় সাহিত্য থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের আহরণ ইঙ্গ সাহিত্যের মধ্যেই সীমায়িত থাকলেও মধুসূদন কিন্তু তাঁর মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহে সমানে

ইংরেজির সঙ্গে গ্রীক-রোমান জগতেও বিচরণ করেছেন। মধুসূদনের কাব্যে ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণ-ঐতিহ্যের সমন্বয় নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অনুমিত হয় মিল্টনের আদর্শে গভীর অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্যই গ্রীক পুরাণ ঐতিহ্যের ভারতীয়করণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল মধুসূদনের পক্ষে। সমসাময়িক কালে এর বিপরীত প্রয়াসও কিন্তু সমান সক্রিয় ছিল। ভারতে (তথা বঙ্গে) খৃষ্টধর্ম প্রচার অব্যাহত থাকলেও এবং নানাভাবে তার প্রচারকার্য চলতে থাকলেও হিন্দুধর্ম তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থকদের প্রতিরোধ প্রয়াসও ছিল সমান সক্রিয়। ধর্ম সম্পর্কে কতকাংশে অন্ধ গোঁড়ামিমুক্ত ব্রহ্মবাদী ঔদার্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের সাহিত্য-অঙ্গনে আবির্ভূত হলেও তাঁর বিশ্বপ্লাবী প্রতিভার পক্ষপুটে ভারতীয় ঐতিহ্যই প্রশ্রয় পেয়েছিল। তাঁর সৃষ্টির পশ্চাৎপটে রয়েছে উপনিষদ্‌ তথা ভারতীয় পুরাণ থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্যযুগীয় মরমিয়া সাধনার মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের বৈষ্ণব বাউল পর্যন্ত যে-ভারতীয় ঐতিহ্য প্রবাহিত সেই ঐতিহ্য। সকল ধর্মীয় সাধনার লক্ষ্য অভিন্ন এরকম ধর্মীয় চেতনার কথা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বারা ঊনবিংশ শতাব্দীতেই প্রচারিত হলেও ভারতীয় ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে ইয়োরোপীয় ধর্ম-চেতনার সমান্তরাল ব্যবধান অক্ষুণ্ণ ছিল প্রথম মহাযুদ্ধ এমনকি তারও পরে এক দশক কাল পর্যন্ত, অক্ষুণ্ণ ছিল ইয়োরোপীয় ধর্ম (খৃষ্ট ধর্ম) তথা কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কে গুপ্তকবির ঊনিশ শতকীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি।

নানাবিধ যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং শিল্প-নির্ভর জীবনচর্যা বিশ শতকের ইয়োরোপীয় মানুষকে, বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবীদের, প্রাচীন সংস্কার বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করেছিল এবং এগিয়ে দিয়েছিল বিচার ও তর্কের দিকে। এতদিন যা নির্দ্বিধায় ধ্রুব ব'লে গৃহীত হয়ে আসছিল এখন তাকেই মুখোমুখি হতে হল বিচার ও তর্কের। যুক্তির ব্যাখ্যায় গ্রহণীয় হলে তবেই তা অন্তরের দরজায় প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে, এরকম ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হল। ফলে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হল ধর্ম-চেতনা। ধর্মচেতনাটা যেহেতু আগাগোড়াই মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাস-প্রসূত, তাই বৈজ্ঞানিক অন্বেষার মুখে প'ড়ে তাকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হল : সর্বাধিক আঘাত হানলেন দার্শনিক ও মনোবিদেরা। ধর্মবিৎ John Omar দেখালেন যে Kant-এর সময় থেকে ধর্ম সাধারণভাবে মনোজগতের ব্যাপার

ব'লে অভিহিত হয়ে আসছে যা অনেকাংশে বিশুদ্ধ দার্শনিক বিচার তথা অনুভূতি-সংবেদ্য। বিভিন্ন দার্শনিক অন্তরের বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে ধর্মের স্থাননির্দেশ করলেন : Kant ধর্মের স্থাননির্দেশ করলেন ইচ্ছাশক্তির মধ্যে, Schleiermacher করলেন অনুভূতির মধ্যে এবং Hegel করলেন যুক্তির মধ্যে।[১] অস্তিবাদের (existentialism) প্রবক্তা সোরেন কীর্কেগার্ড ধর্মের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করলেও নীৎসে এবং জাঁ পল সার্ত্র-এর মতো অস্তিবাদীদের প্রচারিত নাস্তিবাদ থেকে ধর্মসম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাস বিপন্নই হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়েছিল মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কার সমূহের দ্বাবা, মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মনোজগতের ভাষ্যসমূহ প্রকৃতই ধর্মতত্ত্বের টুঁটি টিপে ধরেছিল। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় ধর্মকে নামিয়ে আনা হল স্নায়বিক বিকারের পর্যায়ে।[২]

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় বিশ শতকীয় আধুনিক বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা এবং জীবনের যান্ত্রিকতা ইয়োরোপীয় মানসে যে-অস্থিরতা এনে দিয়েছিল তার আঘাতে ধর্ম কেন প্রাচীন কোনো বিশ্বাসের ভাবমূর্তিই আর অক্ষত রইল না। ইয়োরোপীয় মানসের এই অস্থিরতা সাত সমুদ্র পারে বঙ্গের কবি রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়েছিল একেবারে বিশ শতকের গোড়াতেই।

> একটা সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি য়ুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; তাহাকে সে দেশের লোকে বলে world-weariness। লোকের স্নায়ু বিকল হইয়া গেছে, জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে, নব নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই অসুখ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য কিছুই বুঝিবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে পুরুষ উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছে। ('আবরণ', শিক্ষা)

এলিঅট পাউন্ড প্রভৃতির প্রথম যুগের কবিতার প্রবণতা সম্পর্কেও প্রায় অনুরূপ মন্তব্যই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে ইয়োরোপের মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি হয় নি সত্য, দর্শন মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্বাদি আবিষ্কৃত হয় নি তাও সত্য, কিন্তু বিশ শতকের ভারতবর্ষ ইয়োরোপের অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। তাই ইয়োরোপের অসুখ, ইয়োরোপের বিকলতা ভারতবর্ষের মানসে সংক্রমিত হয় অতি সহজেই। বাহ্য

জগৎ নিয়ে ব্যস্ত ইয়োরোপ একান্ত উদাসীন অন্তর্জগৎ সম্পর্কে, ধর্ম তার কাছে বাহুল্য ব'লেই অবজ্ঞেয়। অনুরূপ মানসিকতায় পীড়িত বিশ শতকের বাঙালী জাতিও। নব্য সভ্যতাভিমানী ব্রাহ্মদের ধর্ম সম্পর্কে ঔদাসীন্যের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়েই অনুরূপ তথ্য উদঘাটন করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং:

> পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অভ্যস্ত যে, অন্তরের দিকে রিক্ততা আসিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য যে কী নিদারুণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না ; বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিবার মত্ততা দিনরাত্রি আমাদিগকে দৌড় করাইতেছে। এমন কি, আমাদের ধর্মসমাজ-সম্বন্ধীয় চেষ্টা-গুলিও নিরন্তর-ব্যস্ততাময় উত্তেজনা পরম্পরার আকার ধারণ করিতেছে। অন্তরের দিকে একটুও তাকাইবার যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম, তাহা গ্রীষ্মকালের বালুকাবিস্তীর্ণ নদীর মতো— সেখানে অগভীর ধর্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার নিতান্ত এক পাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না। আমরা নবযুগের মানুষ, আমাদের জীবনযাত্রায় সরলতা নাই ; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও অত্যন্ত প্রবল ; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। ('ধর্মশিক্ষা', ঐ)

বৈজ্ঞানিক অন্বেষাই ইয়োরোপীয় মানসকে ধর্মীয়-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। প্রথমে ধর্মবিশ্বাস, উপাখ্যান, অনুশাসন প্রভৃতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ক'রে বৈজ্ঞানিক অন্বেষা ও ধর্মীয়-চেতনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় নি, তাই শেষে সে-চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছিল:

> এখন এমন একটা অসামঞ্জস্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে বর্তমান কালে য়ুরোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। (ঐ)

অনুরূপ অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছিল ভারতে তথা বঙ্গে। এখানে হেতু শিক্ষার প্রসার। আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ফলে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল :

> আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্যা ক্রমশই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। কেন না, বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে।…কেবলমাত্র শাস্ত্র-লিখিত মত ও কাহিনীগুলি নহে, শাস্ত্রীয় সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও আধুনিক কালের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগতরূপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। (ঐ)

ইয়োরোপীয় মনোরাজ্যে যে ব্যাপক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল এবং 'স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির যে প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্য' সৃষ্টি হয়েছিল তা আরো প্রবলতর হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটনের ফলে। 'কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে।' ('আবরণ', ঐ)। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও বঙ্গীয় এবং ইয়োরোপীয় উভয় মানসিকতার মধ্যে নৈকট্য স্থাপিত হওয়ার মতো পরিবেশ যে উভয়তঃ বিশ শতকের গোড়া থেকেই গড়ে উঠেছিল তার সাক্ষ্য বিশ্বকবির রচনা থেকে ইতিপূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বঙ্গীয় মনোরাজ্যের অস্থিরতা যে 'দেশজ' নয়, সেকথা স্বীকার্য। তাছাড়া মনোরাজ্যের অস্থিরতার ব্যাপারটা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে যতখানি স্বাভাবিক বঙ্গের ক্ষেত্রে ততখানি স্বাভাবিক ছিল না। সে যাই হোক, বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষতঃ প্রগতিশীল কবি ও লেখকেরা, ইয়োরোপীয়সুলভ অস্থিরতায় আলোড়িত হয়েছিলেন একথা ঐতিহাসিক সত্য। ইয়োরোপে ধর্মবিশ্বাসের ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে মোক্ষম আঘাত হেনেছিল[৩] অনুরূপ প্রত্যক্ষ আঘাত ভারতীয় জীবনে না এলেও মহাযুদ্ধ পরবর্তী কালে এখানেও আধ্যাত্মিক (তথা ধর্মীয়) জীবনের ভিতে গভীর ফাটল দেখা দিয়েছিল।

আস্তিক্যবাদী এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ বর্তমান থাকলেও ধর্মীয়-চেতনায় নেতিবাদী সুর প্রবল হয়ে ধরা পড়েছিল বিশের দশকের রবীন্দ্রবিরোধী কবিগোষ্ঠীর মধ্যে। মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ নজরুল প্রমুখেরা যাঁরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম করেছিলেন,

তাঁরা সজ্ঞানেই আস্তিক্যবাদী ঐতিহ্য থেকেও স্খলিত হয়েছিলেন। মোহিতলালের সোচ্চার সমর্থন বর্ষিত হল কালাপাহাড়ের প্রতি। তাঁর কাছে কালাপাহাড় প্রচলিত অন্ধ সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক গোঁড়ামি ও অনুশাসনগত কুসংস্কারের প্রতি বিদ্রোহের প্রতীক।

কল্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবের নবক ভয়—
নিবারণ করি' উদিল আজিকে দৈত্য-দানব-পুরঞ্জয়!
দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্বিষহ!
অন্তরে হ'ল বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ!
স্তম্ভিত হৃদ্‌পিণ্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ প্লানি মানবসিংহ যুগাবতার
—কালাপাহাড়! ('কালাপাহাড়', বি স্ম র ণী)

পরবর্তী স্তবকে কবির বিদ্রোহের সুর আরো উচ্চগ্রামে উঠেছে। মানুষে-মানুষে বিভেদ কিংবা মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ধর্মীয় যন্ত্র অর্থাৎ মঠ-মন্দির প্রভৃতি ভেঙে ফেলার বাসনা প্রকাশ করেছেন, জেহাদ ঘোষণা করেছেন পূজা-অর্চনার বিরুদ্ধে।

ভেঙে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা কর নিমজ্জন।
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন।
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে! মানুষের বুকে রক্ত চাই।
ছাড়ি লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার।
ভয়ংকরের ভয় ভেঙে যায়,—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়া,
—কালাপাহাড়।

বাংলা কাব্যে মার্কসবাদ অনুপ্রবেশের প্রাক্কালে বিশের দশকের মূল সুর সম্ভবতঃ ধর্ম-বিরোধিতা নয়, মানুষের জয়গান—'যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে!' যতীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে কি নাই।' নজরুল গেয়েছিলেন,

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্‌;
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
('সাম্যবাদী', স র্ব হা রা)

বিশের দশকের কবিদের এই মানবতাবাদই স্পর্ধা যুগিয়েছিল প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করতে, ঔদ্ধত্য দিয়েছিল মন থেকে ধর্মীয় অন্ধ সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলতে।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন!
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন।
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।
('বিদ্রোহী', অ গ্নি বী ণা)

দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ জগতে দুঃখকেই চরম সত্য রূপে দেখেছিলেন, দুঃখেভরা জগতের অস্তিত্বের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়েই তাঁর অভিমানভরা অবজ্ঞা কিংবা 'স্রষ্টা আছে কি নাই' বিষয়ে ঔদাসীন্য।

দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি দেবতার দান;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান।
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের সুর দিনে দিনে পড়ে চাপা!
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি?
('ঘুমের ঘোরে', ম রী চি কা)

সৃষ্টির ফাঁকি যাদের চোখে ধরা পড়ে স্রষ্টার নিষ্ঠুর আঘাত নেমে আসে তাদেরই পরে, পুরুষকারের অধীশ্বরকে কাপুরুষে পরিণত করাতেই তাঁর আনন্দ। মানবতাবাদী কবির তাই তীব্র অভিযোগ স্রষ্টার প্রতিই:

সৃষ্টির পচা ঝুনা নারিকেল যে জনা দেখিল নাড়ি',
হাটের মাঝারে স্পর্ধা করিয়া যে জন ভাঙিল হাঁড়ি;
তোমার বিধান,—অঙ্কুশ 'পরে হানি' ঘন অঙ্কুশ
মত্তহস্তিসম সে চিত্তে করিয়াছে কাপুরুষ।
আজি দুর্বল অক্ষম আমি ভয়-সংশয়-যুত,
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু? হ'ল কি মনঃপূত?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের 'পরে হানিছ রুদ্র রোষ,
ঘাড়ে ধ'রে মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ!
('ভক্তির ভারে', ম রু শি খা)

মন্ত্রতন্ত্র এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিও কবির গভীর অনাস্থা ফুটে উঠেছে ঃ

ধ্যানের জ্ঞানের ওপার হতে বিফল ফিরিল যারা,
নিয়ত বিকট ওঁ হ্রীং ফট্ প্রলাপ বকিছে তারা।
('জীবন ও মৃত্যু', ঐ)

বিশের দশকের নজরুল-যতীন্দ্রনাথের মানবতাবাদই তিরিশের দশকের কবিদের মার্কসবাদে পৌঁছে দিয়েছে। যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী তাঁরা তো অবশ্যই, যাঁরা নন তাঁরাও আর প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের পথে ফিরে যেতে পারেন নি। তবে ধর্ম সম্পর্কে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা নয়, সজ্ঞান ঔদাসীন্য তাঁদের। তাঁদের প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের কোনো ধর্ম সম্পর্কেই কোনো দুর্বলতা নেই, বরং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত বিশ্বাসহীনত্বের শূন্যতার জগতে তাঁদের বিচরণ। সে-শূন্যতার নিরালম্ব মানসিকতা থেকে কোনো ধর্মের প্রতিই আসক্তি সম্ভব ছিল না, পক্ষান্তরে অনেক বেশি সহজ ছিল শ্লেষ কিংবা তির্যক দৃষ্টিক্ষেপ। অবশ্য নজরুল মোহিতলাল প্রমুখেরাও বিশের দশকেই এমন একটা মানসিকতায় পৌঁছেছিলেন যেখান থেকে সমান নিরপেক্ষ-ঔদার্যে ভারতীয়, ইরানীয় কিংবা খৃস্টীয় ঐতিহ্য তথা ধর্মীয় প্রসঙ্গ গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না।

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ-মর্ত্য করতলে,
তাজী বোর্‌রাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে !...
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি',
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্‌ঘুম্
ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম্
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী !
আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্তনরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া,... ('বিদ্রোহী')

নজরুলের অনুরূপ মানসিকতা মোহিতলালেও সঞ্চারিত। তাঁর 'নারীস্তোত্র' কবিতায়

ছুটিয়াছে পিছে-পিছে ধরিবারে রূপ-মরীচিকা
কত কবি, কত ঋষি হেরিয়াছে ও নয়নে লিখা
চির-শান্তি মানবের—তনু তব নরকের দ্বার।
'শয়তানে'র মোহমন্ত্র, তুমি তার সহজ-সাধিকা—
আদি-মাতা 'ইভ' সেই শিখাইল সহচরে তার
রসাল ফলের স্বাদ, হ'ল যাহে চিরতরে স্বর্গ-বহিষ্কার। (স্ম র-গ র ল)

প্রুফ্রক কবিতায় সম্ভবতঃ এলিঅট বিশ শতকের ধর্মীয় চেতনার আভাস দিয়েছেন। এই শতকে ধর্মজিজ্ঞাসার অপমৃত্যু ঘটেছে। মৃত ধর্ম-জিজ্ঞাসা যদি লাজারাসের মতো আবার বেঁচে উঠে বিশ শতকের উদ্যত প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে আসে তাহলেও তা শোনার আগ্রহ ইয়োরোপের নেই : 'That is not what I meant at all. That is not it, at all'. মহাযুদ্ধোত্তর কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মতোই ইয়োরোপের ধর্ম-চেতনাও বন্ধ্যাত্বের মুখোমুখি হয়েছে, চতুর্দিকের পীড়াদায়ক প্রদাহময় পরিবেশে তার একটিই আর্ত প্রার্থনা :

Burning burning burning burning
O Lord Thou pluckest me out
O Lord Thou pluckest

এলিঅটের The Hippopotamus কবিতায়, Four Quartets কবিতা চতুষ্টয়ে, নাটকাবলী অথবা ধর্মীয় প্রবন্ধাবলীতে আভাসিত ধর্মীয়-চেতনার সঙ্গে উপযুক্ত ধারণার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে এলিঅটের দুর্বলতা সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাহলেও বিশের দশকের ধর্মীয়-চেতনা সম্পর্কে প্রুফ্রক কবিতায় কিংবা 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ ফুটে ওঠা ধারণা আদৌ অলীক নয়, বরং যথার্থ বাস্তব।

তিরিশের দশকের যুগচেতনাব কবি বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ কিংবা সমর সেন ধর্মীয় চেতনার তলে এলিঅট থেকে ব্যবধানে হলেও অনেকাংশে প্রুফ্রক বা ওয়েস্ট ল্যান্ড যুগের দৃষ্টিভঙ্গির সমরৈখিক অবস্থানে বিরাজ করছেন। তাঁদেরও ধর্মবিশ্বাসের ভিত নড়ে গেছে। এলিঅট ভারতীয় উপনিষদিক তত্ত্বে আশ্রয় খুঁজলেও বিষ্ণু দে কিন্তু সে আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

তবুও ভরে না চিত্ত, রথযাত্রা লোকারণ্য ঘুরে
মেলায় মেলায় ঈদমুবারকে জনসাধারণে
গায়ে গায়ে কোলাহলে ঈদ্‌গায় মন্দিরে প্রাঙ্গণে
মেলে নাকো দেখা তার, কাঁসর ঘণ্টার উচ্চস্বরে
শোনা তো গেল না সেই হিরণ্ময় সত্যের আখর
যে কথা সদাই কানে যে স্বর পশেছে মর্মে মর্মে।
তবুও ভরে না চিত্ত, কত যাগযজ্ঞে ধর্মে কর্মে
দেউলে মসজিদে ঘুরি, মেলে নাকো পরশ পাথর।

('রথযাত্রা ঈদমুবারকে', না ম রে খে ছি কো ম ল ··)

মানবতাবাদী কবির পক্ষে ধর্মীয় সংস্কার বা অনুশাসনকেই অনন্য সহায় ব'লে আঁকড়ে ধরা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবেই সম্ভব নয় ভারতীয় ধর্মচেতনার সোহহম্‌ বা তৎসৎ তত্ত্বকে গ্রহণ করা। ব্রহ্মবাদী শংকরের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' তত্ত্বের দর্পণ দিয়ে জগৎকে দেখায় বিষ্ণু দে-র স্পষ্টতঃই অনৌৎসুক্য। তাই তিনি দেখেন ঃ

তৎসৎ ঃ চৈতন্যের শূন্যে দ্বীপ। নিরালম্ব নীলে
জীব বস্তু বীজ দ্রব্যে প্রজননে স্বেদাক্ত নিখিলে
মৃত্তিকার প্রাণময় ভিড়ে একা, অমাবস্যা রাকা।

তাঁর মনে হয়েছে মৃত্যুই বাস্তব এবং এই বাস্তবের বজ্রের আঘাতে তত্ত্ব-নির্ভর ব্রহ্মবাদী ধর্মচেতনার তাসের প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে জগৎ এবং জীবনকে দেখার প্রাচীন দর্পণ অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিটাই।

মনে হল মৃত্যু যেন মুষ্টি হানে প্রাসাদের ভিতে,
প্রচণ্ড আওয়াজে বজ্রে ভেঙে পড়ে তত্ত্বের দর্পণ। ('একজন দুঃস্বপ্ন', ঐ)

'নাস্তিরই বিবর্তবাদে' বিশ্বাসী সুধীন্দ্রনাথও অনুরূপ চেতনায় উপনীত।

এবং চক্রান্তভুক্ত পূর্বাপর নিপাত, উদ্ধার
যেহেতু, আমাকে তাই অনুযোগ, শোচনা ঈর্ষাদি
ক্ষেপাতে পারে না আর। চরাচরে নৈতির বিস্তার
নির্বিকার, হয়তো বা নিরাকার ব্রহ্মের সমাধি ঃ
অন্ততঃ এ-পরিবেশে মানুষের প্রার্থনাসমূহ
জাতিস্মর অভিমন্যু ; ('যযাতি', স ং ব র্ত)

মানব এমন এক জাগতিক পরিবেশের অধীন যেখান থেকে নিষ্ক্রমণের পথ

তার অনধিগম্য ও অজ্ঞাত, এরকম উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার পর কবির মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

হয়তো ঈশ্বর নেই : স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ ;
কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিব্যক্ত হ্রাসে ;
বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে ;
জঙ্গমের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত। ('বিপ্রলাপ', ঐ)

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়ে 'নাস্তিরই বিবর্তবাদের' কৈবল্যে নিবদ্ধ দৃষ্টি কবির 'সোহংবাদ' আশ্রয় নিয়েছে 'সোহম্‌বাদ'-এর বিপরীত কোটিতে —ব্রহ্ম নয় আত্মবাদী কবি পক্ষান্তরে মানবতাবাদী।

নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত ;
বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দুরান্ত তারায়
উধাও মনের আগে ; মাতরিশ্বা নিয়ত ধারায়
ফলায় যে-কর্মফল, তা আমারই বুভুক্ষাজনিত ; ('সোহংবাদ', ঐ)

নাস্তিবাদ থেকে সহজেই সুধীন্দ্রনাথের উত্তরণ ঘটেছে ধর্মীয় চেতনার শূন্যবাদে। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অলীকত্বের ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছে।

তিলভাণ্ড সর্বনাশ : অতিদৈব বিশ্বের দেউল ;
প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা,
প্রতিজ্ঞাবিস্মৃত কল্কি ; কিংবদন্তী শিবের ত্রিশূল ;
শূন্যকুম্ভ পুরাণ, সংহিতা। ('উপসংহার', ঐ)

এই শূন্যতা কিন্তু কবির অন্তরকে পীড়িত করে, স্বার্থের নগ্ন সংঘাতে লিপ্ত যুযুধান মানব সমাজের ঘৃণ্য স্বরূপ কবির বিবেককে ক্ষতবিক্ষত করে। কবি বিধাতার অস্তিত্ব অলীক জেনেও কাতর প্রার্থনা জানাতে বাধ্য হন এই দুঃসহ পরিবেশ থেকে নিষ্কৃতির প্রত্যাশায়।

জানি স্বর্গ মিথ্যা কথা, তথাপি অলীক বিধাতারে
রাত্রি-দিন মিনতি জানাই। ('দুঃসময়', উত্তর ফাল্গুনী)

অথবা,

ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,
অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ। ('প্রার্থনা', ক্রন্দসী)

দৃষ্টান্ত আর না বাড়িয়েও বলা চলে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের এই ধর্মীয় চেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নয়, পুরোপুরি এলিঅটের ধর্মীয় চেতনারও সমগোত্রীয় নয়। কিন্তু এ-চেতনা অবশ্যই ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার উত্তরাধিকার। ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা, মার্কসীয় দর্শন, নীৎসে ও সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ প্রভৃতির দ্বারা বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রনাথের ভারতীয় মানসিকতাও গভীরভাবে আক্রান্ত। ইয়োরোপীয় প্রগতিশীল চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে তাঁদেরও মানস গঠন হয়েছে এলিঅটীয় ধারার উপযোগী। চিন্তাধারার নৈকট্যও অনস্বীকার্য। ফলে এলিঅটের মতো বিষ্ণু দে-রাও ইয়োরোপীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার কাব্যরূপায়ণে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। বর্তমান সভ্যতার কৃত্রিমতাটুকুর প্রতি ইঙ্গিত করতে তাঁরাও তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন এলিঅটের মতোই, অধিকন্তু তাঁদের ধর্মীয় চেতনাও এই তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি কবলিত। সুধীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' কবিতায়

এলে পরে লাভের সময়
সদসৎ-নির্বিচারে, সকলই তোমার দান ব'লে,
নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষসংরক্ষিত কোষাগারে।
শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি ; অবিমৃষ্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে ; নিরন্তর, নিষ্কাম প্রসবে
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিনীর ক্লিন্ন অন্তকালে
তোমার প্রতিভূ সেজে উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্গতি যেন করি।
ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে
তোমারে পাসরি,
দারুণ দুর্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই ?"

জীবনানন্দের মতো আত্মমুখী কবিও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ব্যঙ্গবাণ-নিক্ষেপে পরাঙ্মুখ নন।

কখন সে বজেট-মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস, মার্মালেড ছেড়ে,
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলো ;

('জন্হু', সাত টি তা রা র তি মি র)

বিষ্ণু দে-র ধর্মীয় চেতনার প্রতি কটাক্ষ ইঙ্গিতধর্মী, ব্যঙ্গের সুর অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

উন্মনা আজ ? মানি।
কিন্তু বলি শোনো
তার পিছনে আদি-অন্ত নেই।
এ প্রসঙ্গে
কৃশ্চিআনের অনুশাসন মাথায় করেই আছি।
প্রতিবেশীর পাশ ঘেঁষিনে। ('উন্মনা', চো রা বা লি)

কিংবা,

সৎপাত্র সন্দেহ নেই নামাবলী বাঁড়ুজ্যের ছেলে,
যার পায় হেসে খেলে ছয় অঙ্কও যেখানে সেখানে,
রাত্রে বাড়িই ফেরে, গাড়ি থেকে নামে অবহেলে।

('টাইরেসিঅস', না ম রে খে ছি···)

অথবা,

তাই খোদা নিরঞ্জন থেকে থেকে ক্ষুধার্ত গাজনে
বাতাসে বাতাসে মত্ত অপলাপ আছড়ে ছড়ায়,
তাই ধর্মরাজ মৃত্যু, তাই মাতে মহিষ আকাশ,
প্রাণতীর্থে জনস্রোতে মৃত্যুভয় পায়ে দ'লে দ'লে
শূন্যে শূন্যে ভ'রে তোলে শূন্যের সরকারী হাহাকার—
জীবনই মৃত্যুর বলি, শূলে চড়ে জুডাসের হাঁকে।

('বারোমাস্যা', ঐ)

কবি সমর সেনের ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি সূক্ষ্মের ধার ধাবে না, যেমন সহজ তেমনই সোজাসুজি।

একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি।
দারুণ গ্রীষ্মে অভীপ্সা-ব্যাকুল মন
তোমার আদেশে সন্ন্যাসীর সাধনা-সঙিন দিনগুলি
যুবতী-সংকুল আসরে

সান্ধ্য-সঙ্গীতে সংহত।
প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
('একমাত্র তোমাকে সত্য…', গ্র হ ণ ও অ ন্যা ন্য…)

'বকধার্মিক' কবিতায়

গাত্রদাহ শুধু নিষ্ফল আক্রোশ।
সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধ'রে
ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরী যাব।…
সন্ধ্যায় ভিড়াক্রান্ত মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা
দেবতার চোখে অনিদ্রা আনে;
পূজার পচা ফলে ফুলে পিচ্ছিল পথে
রক্তচক্ষু পুরোহিত হাঁকে,
হাঁকে জগদ্দল বৃষভ। (ঐ)

ধর্মীয় চেতনার প্রতি অনুরূপ ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি কিংবা কটাক্ষ এলিঅটের মতো ধর্মসচেতন কবির রচনায় প্রকৃতই সুলভ নয়, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও বাংলা কবিতার তিরিশের দশকের কবিদের অনুরূপ প্রবণতার পশ্চাতে এলিঅটের জের টানা নিতান্ত অযৌক্তিক নয় একথা বলা চলে। বিষ্ণু দে এবং অন্যান্য কবিদের রচনায় এলিঅটীয় প্রভাব নিরূপণ কালে এ-তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে যে, জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তিরিশের দশকের কবিদের অবলম্বিত তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি এলিঅটীয় কাব্য-সংশ্রব-সঞ্জাত। পরিবর্তিত মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারকে, তা জীবন সম্পর্কিতই হোক অথবা ধর্মসম্পর্কিতই হোক, উপহাসাস্পদ ক'রে তোলার জনপ্রিয় এলিঅটীয় রীতি বাঙালী কবিদের মধ্যেও গভীরভাবে সংক্রমিত হয়েছিল। কাব্যরীতি সূত্রে অধিগত তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে সর্বত্র এলিঅটীয় গণ্ডি মেনে চলেছে এমন কথা বলা চলে না, ধর্মের মতো দেশ-কালোপযোগী আরো অনেক কিছুকেই ছুঁয়ে যেতে দ্বিধা করে নি। এলিঅটীয় দৃষ্টান্ত এভাবেই বাঙালী কবিদের (বিষ্ণু দে প্রমুখকে) পরোক্ষে সাহায্য করেছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় কৃষ্টির সমতলে উপনীত হতে।

২.

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ধারা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কেবল অক্ষুণ্ণই ছিল না, তাদের সমান্তরাল ব্যবধানটুকুও অব্যাহত ছিল এবং উভয় ধারা নির্দ্বিধায় পরস্পরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলাকেই পুরুষার্থ ব'লে গ্রহণ করেছিল। জগৎ ও জীবনবিষয়ক ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল উপনিষদিক ভূমিতে প্রোথিত। 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়' এই হল ভারতের সনাতন প্রার্থনা। ভারতীয় উপনিষদিক দৃষ্টিতে মৃত্যুতে জীবনের শেষ নয়, তাই মৃত্যু বিষাদেরও নয়; মৃত্যু জীবনকে অমৃতত্বে উন্নীত করে, ইহলোকের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে লোকান্তরে সার্থকতায় মণ্ডিত করে। তাই ভারতের মৈত্রেয়ীর স্পষ্ট ঘোষণা, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।' লোক-লোকান্তরে জীবনের পরিধি অনুরূপ প্রসারিত ক'রে দেখে নি ইয়োরোপ। তার জীবনদর্শন ইহলোকের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না ব'লেই ভোজ্য-পানীয়ের হর্ষের প্রাবরণী-অন্তরালে সংকুচিত জীবনকে গুটিয়ে নিয়েছে গুটিপোকার মতোই। 'ও' ক্রতো স্মর কৃতম্ স্মর' ঔপনিষদিক মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় জীবনদর্শনে অনুরূপ জড়বাদের কোনো মূল্য নেই, পার্থিব নশ্বর ভোগবিলাস অমৃতত্বলাভের পরিপন্থী ব'লেই তা পরিত্যাজ্য। তার সাধনা অমরাভিমুখী, ভূমাবিধৃত শাশ্বত সুখই তার চরম লক্ষ্য: 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' রবীন্দ্রনাথ (তাঁর অনুসারী কবিসমাজও) এই ঔপনিষদিক দর্শনেরই প্রবক্তা, তাঁর কবিসত্তাও ছিল উপনিষদের রসধারায় পুষ্ট।

তিরিশের দশকের কবিরা কিন্তু অগ্রাহ্য করলেন ভারতীয় জীবনদর্শন। তাঁদের কবিতায় কেবল ইয়োরোপীয় কৃষ্টিই ধরা পড়ল না, ইয়োরোপীয় জীবন দর্শনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে দেখা দিল। সুধীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, ইহলোকই তাঁর অন্বিষ্ট, লোকান্তরের অমৃতত্বের প্রত্যাশী তিনি নন।

কেমনে তাদের বলি নই আমি অমরাবিলাসী,
মর্ত্যে সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অন্বিষ্ট আমার;
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সে-সবে এ-হৃদয় উদাসী,
উত্থান, পতন মম ক্ষণিকার নিষ্ঠায় অসার।

('মাধবী পূর্ণিমা', উত্তর ফাল্গুনী)

ইহলৌকিক জীবনকেই চরম মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল গ্রীক জীবনদর্শনে,

এই জীবনদর্শনই পরবর্তীকালে সমগ্র ইয়োরোপে চারিয়ে যায়। ইহজীবনকে চরম মর্যাদা দেওয়া থেকেই কামু-সার্ত্রের ক্ষণবাদী চিন্তাধারাও ইয়োরোপের মনোজগতকে অধিকার করে, ক্ষণিককে মর্যাদা দিতে গিয়েই ইয়োরোপের আসক্তি ইহজীবনে। ইয়োরোপীয় জীবনদর্শনে বিশ্বাসী হয়েই সুধীন্দ্রনাথও ক্ষণবাদে বিশ্বাসী।

> আমি ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায় নিমেষে তামাদী
> আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথা তাতে যার জের, সে-সংসারও। অথচ
> সময় ভূত থেকে ভবিষ্যতে ধাবমান নয় ; এবং যদি বা তার সাক্ষ্য
> থাকে অব্দে কি নাড়ীতে, তবু সে-নিভৃতে হৃদয়বানের মতো, বুভুক্ষুও
> নিষিদ্ধপ্রবেশ।
> ('উপস্থাপন', দ শ মী)

যদ্যপি সুধীন্দ্রনাথের এই আত্মঘোষণা পঞ্চাশের দশকের কবিতায় অভিব্যক্ত, তথাপি একথা সত্য যে, তাঁর জীবন এবং জগৎসম্পর্কিত মতবাদের বিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। 'স ং ব র্ত'-এর ভূমিকায় তিনি এর আভাস দিয়েছেন :

> ···এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে আজ আমি যে-দার্শনিক মতে উপনীত, তা যখন প্রাচীন ক্ষণবাদে'ই সাম্প্রতিক সংস্করণ, ··[৭]

পঞ্চাশোর্ধে অর্জিত দার্শনিক মতবাদকে তিনি প্রাচীন ক্ষণবাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করলেও এবং 'বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক ব'লেই, আমি যেমন কর্মে আস্থাবান' এরকম ঘোষণায় পশ্চাৎপদ না হলেও এর সঙ্গে ইয়োরোপীয় জড়বাদের সংশ্রব উপেক্ষণীয় নয় ; বিশেষতঃ সুধীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ এবং প্রগতিশীল কবি সমসাময়িক ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার ছোঁয়া সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়ে কেবল প্রাচীন মতবাদেরই প্রতিফলন খুঁজবেন নিজের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত প্রশ্রয়যোগ্য নয়। বরং তাঁর ক্ষণবাদ যে নীৎসে-কামু-সাত্রে'র অস্তিত্ববাদের সাযুজ্যে লালিত এমন অনুমানই সঙ্গত ব'লে মনে হয়। পঞ্চাশের দশকে ক্ষণবাদ সুধীন্দ্রনাথের সচেতন স্বীকৃতি পেলেও এর উন্মেষ ঘটেছিল তিরিশের দশকেই। 'স ং ব র্ত' কাব্যগ্রন্থের 'উপসংহার' কবিতায় তিনি ক্ষণবাদেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন :

> আমাদের পটভূমি নিরপেক্ষ, নিষ্কল নৈমিষ।

তিরিশের দশকের কবিতায় অন্যত্রও জড়বাদের প্রকাশ ঘটেছে। 'উত্তর-ফাল্গুনী' কাব্যগ্রন্থের 'দ্বন্দ্ব' কবিতায়

সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ, সে কেবলই সম্ভব স্বপনে ;
বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্যসত্য জাগ্রত জগতে ;
ছুটি মোরা মর্ত্যচর আত্মঘাতী আবর্তের স্রোতে,
ফেনিল সম্মোহে মেতে, লুব্ধকেন্দ্র নাস্তির শোষণে।

কবিতাটির প্রথম স্তবকে জড়বাদ সম্পর্কিত আস্থা অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে :

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে :
গ্রহ তারা নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে ;
বস্তুর দুর্দান্ত চিতা অনির্বাণ শূন্যের সৈকতে ;
কালের অদৃশ্য গতি ব্যক্ত শুধু বিপন্নবর্ধনে।

'মৃত্যোর্মামৃতং গময়' প্রার্থনায় কবির আস্থার অভাব সে-কথা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান। তাঁর আস্থা মরজগৎকেন্দ্রিক, তাঁর ভাবনাও তাই মরজগৎ অতিক্রম ক'রে লোকান্তরে ধাবিত হয় না, মনও জড়বাদ বিসর্জন দিয়ে কোনো আস্তিক্যবাদে নির্ভর করে না কোনো অতিলৌকিক সান্ত্বনার খোঁজে।

জড়বাদী মানসিকতায় কবি বিষ্ণু দে-ও আচ্ছন্ন। তবে তিনি এলিঅটীয় কাব্যরীতিতে দীক্ষিত ব'লেই তাঁর কাব্যে জড়বাদের ব্যাপক বর্ণনামূলক বহিঃপ্রকাশ সম্ভবতঃ ঘটে নি, ক্বচিৎ ইঙ্গিতাত্মক প্রকাশ ঘটেছে। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের 'পঞ্চমুখ' কবিতায়

জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ
ক্ষান্তি মেনেছে নীড় সন্ধানী মন।
থেমে গেছে আজ অশনায়ী অন্বেষা।
তপস্যা আজ নিদ্রার আরাধনা।
বাস্তু মনুকে আশ্রয় করি শেষ।...
ভঙ্গুর স্নায়ু কণ্টক অগণন।
স্বপ্নেরা হল ফণিমনসার বন।
জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ।

কেবল তিরিশের দশকের কবিতাই নয়, পরবর্তী দশকের কবিতায়ও জড়বাদের ছাপ আছে। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'কালের

রাখাল বিশ্বাসের 'শিশু' ঃ ২১শে ডিসেম্বর'-এর মতো চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের সন্ধিক্ষণে রচিত কবিতায়ও জড়বাদী চেতনার অস্তিত্ব অনুভূত হয় ঃ

শোনো শিশু শোনো

মিলাও প্রসাদ তার অসত্যে ভঙ্গুর স্থাবরের এই পাড়ে—

জড়বাদের আবেশ এসেছে বুদ্ধদেব বসুরও কবিজীবনে, কিন্তু একেবারে উত্তরপর্বে। তিরিশের দশকে রোমান্টিকতা তাঁর মানসিকতাকে ঘিরে রেখেছিল। 'ম র চে প ড়া পে রে কে র গা ন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ষাটের দশকে রচিত 'আরোগ্যের তারিখ' কবিতায়

এ-ই বাস্তুভিটা। এ-ই সনাতন, বদ্ধমূল, স্থায়ী।
এখানেই মুক্তি আছে, মৃত্যু আছে (কিন্তু তুমি একদা যেমন
ভেবেছিলে, সেই মতো নয়)।…
অনুজ্জ্বল বেঁচে থাকা—তা কেবল মৃত্যুর আস্বাদে পূর্ণ,
তা কেবল আবেগের নির্বাপণ, বিচ্ছেদবোধের অবসান :
জয় নয়—বর্ধিষ্ণু নির্বেদ শুধু ; ধৈর্য নয়—নিঃশেষিত উত্তাপ,
উৎসাহ ;
শান্তি নয়—শুধু এক ধূসর, নিঃসাড় রূপে সহজ নিশ্বাস।
—এই মুক্তি প্রতিশ্রুত, অনিশ্চিত অন্য সব সম্ভাবনা।

মুক্তি-সম্পর্কিত অনুরূপ নেতিবাদী চেতনার উন্মেষ কিন্তু দেখা গিয়েছিল বিশের দশকেই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায়

জীবনে মরণে কোনোখানে কভু সত্য মুক্তি নাই।
ব্রহ্মা জপিছে মুক্তিমন্ত্র বিফলে কল্প ব্যেপে',…
সৃষ্টি ত শুধু মুক্তির গায়ে বন্ধন পাকে পাক,—
শুনিস্ নে ভাই মুক্তির লাগি' কাঁদিছে স্বয়ং ভূমা।

('মুক্তিঘুম', ম রু মা য়া)

জড়বাদী চেতনারও উন্মেষ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে—

অসীম জড়ের মাঝে
চেতনাশক্তি—ঘুমের ভিতর স্বপনের মতো রাজে।
শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায় ;
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তি পানে ধায়।
বন্ধু, বন্ধুবর !

সকল শক্তি সংহত ক'রে হয়ে আছে মহাজড়।

('ঘুমের ঘোরে', ম রী চি কা)

এলিঅট তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' কবিতায় দুঃসাহসিক চিত্রকল্প প্রয়োগ করেছিলেন টাইরেসিঅস প্রসঙ্গে :

…when the human engine waits
Like a taxi throbbing waiting,
I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,

টাইরেসিঅসের মতো পৌরাণিক চরিত্রের মুখে কোনো পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা না ক'রে একেবারে বিশ শতকীয় যন্ত্রসভ্যতার চিত্রকল্প জুড়ে দিয়ে চিত্রকল্পের জগতেই আলোড়ন তোলেন নি, পৌরাণিক ইয়োরোপীয় মানসিকতাটাকেই ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন বাস্তব জড়বাদের অভিমুখে। অনুরূপ ভাবেই ঐ কবিতারই অন্যত্র আর একটি প্রসঙ্গে বর্তমান সভ্যতার বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তুললেন লণ্ডন সেতুকে উপলক্ষ ক'রে :

Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many,

এলিঅটের বিশ শতকীয় যন্ত্রযুগের অনুরূপ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি তিরিশের দশকের বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কারণ ততদিনে বিজ্ঞানের আধুনিক সভ্যতায় ও যন্ত্রযুগের প্রায় একই সমতলে বিরাজ করছে ভারত ও ইয়োরোপ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, যুগান্তকারী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোড়নে ইয়োরোপের পাশাপাশি ভারতীয় মানসও সমানে আন্দোলিত হয়েছে। তাই উপর্যুক্ত দুটি জড়বাদী প্রসঙ্গই ঘুরে ফিরে এসেছে বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়, এমন কি জীবনানন্দেও। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

১. a taxi throbbing waiting চিত্রকল্প :

(অ) বাইশটি বসন্তের সঞ্চিত সঙ্গীত
আমার স্নায়ুতে এসে কাঁপে থরোথরো
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাক্সির মতো ?

('প্রথম পার্টি', চো রা বা লি)

(আ) নীড়মুখী পাখির মতন
মৃত্যুহীন সমুদ্রের রুদ্ধহীন প্রাণের আবেগে

কলকাতার শূন্য পথে, ঊর্ধ্বশ্বাস নেভানো ট্যাক্সিতে
প্রাণের মর্মরে থরোথরো নৈর্ব্যক্তিক বেগে…[৫]

(ই) আড়মোড়া ভেঙে কবন্ধ বাস কেঁপে উঠে উদ্যত।
('তিনটি কান্না', না ম রে খে ছি…

(ঈ) স্তব্ধ অপেক্ষায় বসে হিংস্র থাবা পিপাসিত নখে
প্রস্তুতিতে থরোথরো, যেন রুদ্রবীণা তারে তারে
মোচড়ে মোচড়ে বাঁধা, প্রায়াসন্ন যুগান্তের শব্দ।
('শান্তির শরতে এসো', ঐ)

(উ) যেন কেউ আজন্মের চেনাশোনা ছেড়ে
প্রথম বেরিয়ে, কাঁপে :
তারপর হঠাৎ বিরাট
গর্জনের অন্ধকারে
টেনে
ছুঁড়ে
লুটিয়ে জগৎ
জেট-প্লেন উঠে যায় কোনো এক অন্তহীন রাত্রির হৃদয়ে ;
('সৃষ্টির মুহূর্ত', ম র চে প ড়া…

(ঊ) সাহসে এগো .. অস্ফুট শোনে
স্নায়ুর গোঙানি, মোটরের কম্পন
পার্ক স্ট্রিট আর চৌরঙ্গির মোড়ে ;
অস্থির ইস্পাতের দাঁতের ঘর্ষণ
বাড়ি-ফেরা পথে, দুপুর বেলায়।
('একটি অভিজ্ঞতা', ঐ)

২. death had undone so many প্রসঙ্গ :

(অ) জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন-মান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,

এত লোককে গোপন সঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে,
('টপ্পা-ঠুংরি', চো রা বা লি)

(আ) অবিরাম আনাগোনা
জীবনের স্রোত
নামে কোন্ মোহানায়, কোন্ ভরাটিতে ?···
জীবনের মরণের নাকি বুঝি মরণের জীবনের,
জীবিকার, জীবিকাহীনের, উদ্বাস্তুর, বুভুক্ষুর,···
('হাওড়া ব্রিজ', না ম রে খে ছি···)

(ই) ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হয়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হলো মানুষের বৃত্তি আদায়।
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহ দরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিম্বের মতন।[১]

(ঈ) পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে ;
ঝ'রে পড়ে।
এই সব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গ্লানি নিতে
ব্যাপ্ত হতে হয়।
নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।
('জনান্তিকে', সা ত টি তা রা র তি মি র)

যুগান্তকারী বিভিন্ন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার বিশ শতকীয় ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে জড়বাদী চেতনার দিকে সবেগে ঠেলে দিয়েছিল, এগিয়ে দিয়েছিল যন্ত্রনির্ভর মানসিকতার দিকে। ফলে ইয়োরোপীয় সভ্যতার পায়ের তলা থেকে জমি রাতারাতি সরে গেল, এতদিন খৃষ্ট, সভ্যতা, ধর্মীয় চেতনা প্রভৃতি যে-সমস্ত প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের ওপর আধারিত ছিল সে-সমস্ত অপসৃত হল। যুগ-সচেতন কবি ও শিল্পীরা প্রবল ভাবে আক্রান্ত হলেন এই বিশ শতকীয় যুগ-সমস্যায়, তাঁদের মানসিকতায় দেখা দিল অনিকেত (rootless) মনোভাব। এ'রা অতীত হাঁতড়ে আর কোনো আলম্বন খুঁজে পেলেন না, ভবিষ্যতের মধ্যেও কোনো ভরসা দেখতে পেলেন না, বর্তমান সভ্যতার ত্রিশঙ্কু রূপটাই একমাত্র সত্য হয়ে ধরা পড়ল তাঁদের চোখে। প্রুফ্রক, জেরনশান প্রভৃতি কবিতায়

ইয়োরোপের সভ্যতার ত্রিশঙ্কু মানসিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এলিঅটের অনুরূপ ত্রিশঙ্কু মানসিকতা তিরিশের দশকের কবিদেরও পেয়ে বসেছিল। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ত্রিশঙ্কু মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। তাঁর যযাতিও এলিঅটের প্রুফ্রক-জেরনশানের মতোই নেতির মধ্য দিয়ে অনিকেত মনোভাবের জগতে উপনীত হয়েছে।

কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে তথা ভাবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশঙ্কু এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে,

এ-অনিকেত মনোভাব বিষ্ণু দে এবং জীবনানন্দকেও বিপর্যস্ত করেছে। বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে এই মনোভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্বে। (এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়েও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।)

বিশ শতকের গোড়াতেই আইনস্টাইন আবিষ্কৃত আপেক্ষিকবাদ (থিওরি অব রিলেটিভিটি) বিশ্ব ও কালচেতনায় যুগান্তর এনেছিল। এলিঅটের মধ্যেও, বিশেষতঃ 'ফোর কোয়ার্টেটস্'-এর যুগে, এক অনাদ্যন্ত অনবচ্ছিন্ন অপরিবর্তনীয় মহাকালের প্রেক্ষাপটে সমস্ত কিছুকে স্থাপন ক'রে বিচারের প্রবণতা দেখা গেছে।[১] সে মহাকালে অতীত—বর্তমান-ভবিষ্যতের বিচার নিরর্থক। সম্ভবতঃ হিহরকেন্দ্রের কল্পনায় মহাকাল এবং জীবনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস করেছিলেন। হিহরকেন্দ্রের কল্পনা রবীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব-জীবনানন্দকে আকৃষ্ট না করলেও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিরপেক্ষ কালচেতনা সম্পর্কে তাঁরাও ছিলেন সচেতন।

অমেয় জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে তাল রেখে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিশ শতকে যে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করল তাকে আর কিছুতেই ইয়োরোপীয় গণ্ডির সংকীর্ণতায় আবদ্ধ ক'রে রাখা গেল না। জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাও ছড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে। এই কৃষ্টি ও সভ্যতাই সর্বত্র বয়ে নিয়ে গেল প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মচেতনা থেকে ইয়োরোপীয় বিচ্যুতি, ইয়োরোপীয় জড়বাদ, বিশ শতকীয় মনোভাব। আর একটা পরিবর্তন দেখা দিল। সাহিত্য, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার যুগও শেষ হয়ে গেল। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বাদি সাহিত্যের পরিধিতে কেবল ধরাই পড়ল না, তার পরিধি এবং দৃষ্টিভঙ্গিও প্রসারিত করল। এলিঅটের কাব্যে বিশ শতকীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার ধরা পড়ল, সেই সঙ্গে বিশ শতকীয় প্রগতিশীল তত্ত্ব-

নির্ভর ইয়োরোপীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাও ধরা পড়ল। অনুরূপভাবেই ইয়োরোপীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা বাংলা কাব্যে ধরা পড়েছে তিরিশের দশকে এলিঅট ভাবে ভাবিত কবিগোষ্ঠীর দ্বারা। তাঁদের প্রধান কীর্তি এই ইয়োরোপীয় পণ্যকে তাঁরা দেশের কাব্যপ্রাণধারার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সার্থকভাবে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে যে-কথা বলেছিলেন তিরিশের দশকের পুরোধা কবিদের ভূমিকা সম্পর্কেও সে-কথা সর্বাংশে প্রযোজ্য :

> বস্তুত নবযুগ প্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য-সম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে-ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে।

সূত্র ও টীকা নির্দেশ

১. 'Religion, as Oman himself pointed out, has generally, since Kant, been ascribed to a department of the mind which is to a large degree susceptible to a rational philosophical discussion. Kant placed it in the will, Schleiermacher in the feelings, and Hegel in the reason'.—*The Twentieth Century Mind-2*, p 155.

২. 'Although Freud continued to write works in which religion was reduced to neurosis, especially *The Future of an Illusion* (1927, trans. 1928), the direct onslaught, was not in the long run the most damaging to theology.'—Ibid., p. 154.

৩. 'Made by the German philosopher, Oswald Spengler

(1880-1936), in volume I of his celebrated '*The Decline of the West* (1918 ; trans. 1926), it offered historical support to the pessimistic view that the First World War had dealt the Christian faith a death blow' —Ibid., p. 160.

৪. 'মুখবন্ধ', সংবর্ত

৫. বছর পঁচিশ, পৃ. ৪৪৮

৬. 'আবহমান', জীবনানন্দ দাসের শ্রে. ক. পৃ. ৬০

৭. 'অ্যাশ ওয়েনসডে' কবিতায় আপেক্ষিকবাদের প্রভাব অনুভূত হয় ঃ

Because I know that time is always time
And place is always and only place
And what is actual is actual only for one time
And only for one place

৮. রবীন্দ্র রচনাবলী-১১, পৃ. ৭১৭

আট

এলিঅট
ও
বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য

১

Irving Babbitt ও T. E. Hulme অনুসৃত রোমান্টিক বিরোধিতাকে এলিঅট পুরোপুরি কাব্য-আন্দোলনের মর্যাদা দিয়েছিলেন, বাংলা কাব্যে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তুলে নতুন কাব্য-ঐতিহ্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রোত্তর কবিরা সফল হ'লেও এলিঅটীয় আদর্শে কাব্যনাট্য-আন্দোলন গড়ে তোলায় বাঙালী কবিদের অনীহা বিস্ময়কর। কাব্য এবং কাব্যনাট্য উভয় ক্ষেত্রেই এলিঅট স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অধিকারী, কিন্তু তাঁর কাব্যের মতো কাব্যনাট্য ঐতিহ্য বাঙালী কবিদের আকৃষ্ট করল না কেন এর সদুত্তর নেই। সম্ভবতঃ কাব্যনাট্যের সঙ্গে তাঁদের কবিখ্যাতি তথা অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত ছিল না ব'লেই এই ঔদাসীন্য।

বাংলা কাব্যে যখন এলিঅটীয় যুগ তখন এলিঅট কাব্য থেকে সরে গেছেন কাব্যনাট্যে, আর বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যে যখন এলিঅটীয় রীতির অনুবর্তন তখন এলিঅটের মুখর লেখনী চিরতরে নীরব। সে-কারণেই অপেক্ষাকৃত বিলম্বে এলিঅটচারণা সুরু ক'রেও কাব্যনাট্যসমূহে এলিঅটকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করতে বুদ্ধদেব বসুর কোনো অসুবিধে হয় নি— একদিকে তিনি নাট্যরীতি ও আঙ্গিকে নাট্যকার এলিঅটের সমধর্মা, আবার অন্যদিকে ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর কাব্যতত্ত্ব ও রূপকের নাট্যরূপায়ণ প্রয়াসী।

কাব্যনাট্য সম্পর্কিত এলিঅটীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা নাট্যরীতির ছাপ বহন করছে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যগুলি। গদ্যভাষা রহিত ক'রে নাটকীয় সংলাপে কাব্যভাষার ব্যবহার উভয় নাট্যকারকে এক অভাবনীয় সৈদ্ধান্তিক নৈকট্যে উপনীত করেছে। ভিত গড়ার কাজেও উভয় কবিকেই উপাদান যুগিয়েছে ধর্মীয় পুরা-কাহিনী। এলিঅট তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতাতেই

ক্রমশঃ এগিয়ে গেছেন আধুনিক নাগর-সভ্যতার অস্তিত্ব-সংকট ও বন্ধ্যাত্ব-চেতনা থেকে Sueeney Agonistes, The Rock তথা Murder in the Cathedral-এর ধর্মীয় চেতনায়। বুদ্ধদেব বসুর এরকম পরিণতি ঘটেনি সত্য, কিন্তু নাট্যকাব্য রচনার যুগে এসে মহাভারতের মতো ধর্মীয় পুরাণ-কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে এলিঅটীয় পরিণতির একটা ক্ষীণ প্রতিফলন আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়।[২] অবশ্য (ধর্মীয়) পুরাণ কাহিনী ব্যবহারে উভয় কবির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনস্বীকার্য। বুদ্ধদেব বসুর স্বাভাবিক অনীহা তাঁর নাটকগুলিকে এলিঅটসুলভ ধর্মীয় চেতনার বাহন ক'রে তোলায় কিংবা নাটকীয় চরিত্রগুলির সাহায্যে ধর্মীয় মতবাদ প্রচারে।[৩]

এলিঅটীয় নাট্যরীতি এবং আঙ্গিকের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিকের নাটকগুলির রীতি ও আঙ্গিকের সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকলেও অনুরূপ রীতি ও আঙ্গিকের পশ্চাতে এলিঅট-সদৃশ মতবাদ ও দার্শনিকতার একান্তই অভাব বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে। এলিঅট সজ্ঞানেই অনুরূপ রীতি ও আঙ্গিককে তাঁর নাটকের বাহন করেছিলেন। এর পশ্চাতে দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল তাঁর। নাটক ও নাট্যরীতি সম্পর্কে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পক্ষপাতের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন:

> Reviewing my critical output for the last thirty-odd years, I am surprised to find how constantly I have returned to the drama, whether by examining the work of the contempories of Shakespeare, or by reflecting on the Possibilities of the future.[৪]

নাটকের প্রতি এই পক্ষপাতের সমর্থন লুকিয়ে আছে এলিঅটের গোড়ার দিকে রচিত বিভিন্ন কবিতায় ও প্রবন্ধে। প্রুফ্রক, সুইনি প্রমুখ চরিত্রের প্রচুর নাটকীয় উপাদান, গোড়ার দিকের বিভিন্ন কবিতায় নাটকীয় বৈপরীত্যের (dramatic contrast) অভাবনীয় সমাবেশ, নাটকীয় একক সংলাপের (dramatic monologue) যথেচ্ছ ব্যবহার এবং এলিজাবেথীয় তথা জ্যাকবীয় নাট্যকারদের মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রবন্ধাদি অবশ্যই তাঁর নাট্যপ্রতিভার সম্ভাবনাসূচক। এই সমস্ত সম্ভাবনাই অবশেষে তাঁকে কাব্যনাট্যকারের অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। অন্ততঃ তাঁর কাব্যনাট্য সমর্থনে সুস্পষ্ট ওকালতি থেকে এরকম সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক। এলিঅটের এই বিশিষ্ট প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি রেখে···the signs were

evident both in his poetry and his criticism that he had the gifts of a playwright,[৫] এরকম মন্তব্য সহজেই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে; কিংবা কোনো এলিঅট-গবেষক যদি এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এলিঅটের প্রতিভা মূলতঃ নাট্যকারের, এমনকি, তাঁর কাব্য তথা শিল্পতত্ত্বও নাট্যধারণার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত,[৬] তাও মেনে নিতে দ্বিধা হয় না।

সাহিত্যজীবনের উত্তর পর্বে বুদ্ধদেব বসুও যথোচিত নিষ্ঠা নিয়ে নাটক রচনা ও তৎসম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মনোনিবেশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমগ্র কাব্য-প্রকৃতি কিংবা কবিকৃতি নাট্যভাবনা নিয়ন্ত্রিত এমন কথা বলা চলে না। একথাও বলা চলে না যে, তাঁর কাব্যসৃষ্টির অন্তরালে প্রচুর নাট্য-উপাদান পরিদৃশ্যমান, কিংবা তাঁর সাহিত্যজীবনের আগাগোড়াই নাটকের প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয়েছে। কাব্যনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ব্যাপারটা বুদ্ধদেব বসুর জীবনে একান্তই আকস্মিক বলে মনে হয়, বিশেষ ধরনের কাব্যনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পশ্চাতেও কোনো নাট্যচিন্তা বা নাট্য-দর্শন সক্রিয় ছিল কি না তারও সদুত্তর নেই। আন্তরিক প্রেরণার ফলশ্রুতি না হলেও এলিঅটীয় ভাবাদর্শে প্রুফ্রক-সদৃশ কাব্যিক চরিত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন বিষ্ণু দে, অনুরূপ চরিত্রে নাটকীয়তার উপাদান সঞ্চারেও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া কবিতায় নাটকীয় একক সংলাপ, নাটকীয়তা প্রভৃতি এলিঅটীয় কাব্যকৌশল প্রয়োগেও তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত। এ সমস্ত নেহাতই এলিঅটীয় আদর্শে কাব্যে অভিনবত্ব আনয়নের প্রক্রিয়া মাত্র না হলে বিষ্ণু দে-র মধ্যেও একটা কাব্যনাট্য পর্যায় পাওয়া যেত। পাওয়া যে যায় নি তার মূল কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এলিঅটে যা ছিল একান্তই কাব্যবিশ্বাস ও কবিস্বভাবের বহিঃপ্রকাশ, বিষ্ণু দে-র কাছে তাই ছিল নিতান্ত কাব্য-প্রকরণ মাত্র। কি কাব্যবিশ্বাসে, কি কবিস্বভাবে, এমন কি কাব্যকৌশল রূপেও, বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে নাটকীয়তার প্রাদুর্ভাব ঘটে নি। তাই এলিঅটীয় ধারায় কাব্যনাট্য রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যচর্চার সূত্রপাত হলেও[৭] শেষ পর্যন্ত কাব্যনাট্য ছেড়ে তিনি গদ্যনাট্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এলিঅটের বেলায় অনুরূপ আশ্রয়ান্তর গ্রহণ অকল্পনীয়। তার কারণ, কাব্যনাট্য এলিঅটের কাছে একটা প্রকরণ বা নাট্যকৌশল মাত্র নয়, এটা তাঁর কাব্যবিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ। কবিরও সামাজিক দায়িত্ব আছে যা তিনি এড়াতে পারেন না। এলিঅটের ধর্মীয় চেতনা এবং কাব্যনাট্য চেতনা এই সামাজিক দায়িত্ব চেতনারই

নামান্তর। কাব্যের যথার্থ সামাজিক ভূমিকার উপলব্ধি থেকেই তাঁর কাব্যনাট্যের পরিকল্পনা :

> The most useful poetry, socially, would be one which could cut across all the present stratifications of public taste—stratifications which are perhaps a sign of social disintegration. The ideal medium for poetry, to my mind, and the most direct means of social 'usefulness' for poetry is the theatre.[৮]

কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা এলিঅটের কাব্যের মধ্যেই নিহিত ছিল, বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহৃত পার্সোনা-কেন্দ্রিক সংলাপধর্মিতা তাঁর কাব্যনাট্যে অনুসৃত বিশিষ্ট কাব্যভাষারীতির প্রাক্‌রূপ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু কাব্য থেকে কাব্যনাট্যের জগতে অপসরণের পশ্চাতে যেমন এলিঅটের বিশিষ্ট মতবাদ ছিল, তেমনি তাঁর নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত কাব্যভাষাও বিশিষ্ট মতবাদ ও মননের ফলশ্রুতি। শেকসপিয়ার তথা এলিজাবেথীয় এবং জ্যাকবীয় নাট্যকারদের মূল্যায়ন থেকে এলিঅট এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন যে, বহু ব্যবহারে শেকসপিয়ারীয় নাট্যভাষা বা blank verse তার মাহাত্ম্য হারিয়েছে, জনসাধারণের ভাষা থেকেও তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তিনি এও বুঝেছিলেন যে, নাট্যভাষার কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের কাব্যনাট্য রচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।[৯] অনুরূপ ধারণা জন্মেছিল তাঁর নাটকের গদ্য-সংলাপ সম্পর্কেও। Blank-verse-এর মতো গদ্য-সংলাপকেও তাঁর মনে হয়েছে কৃত্রিম এবং জনগণের ভাষার সঙ্গে সম্পর্করহিত (it will appear that prose, on the stage, is as artificial as verse)। এই উপলব্ধি থেকেই এলিঅট বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, or alternately, that verse can be as natural as prose ; বলা বাহুল্য, নাটকীয় কাব্যভাষা সম্পর্কিত এইটিই মূল কথা। এলিঅটীয় বিধানে তাঁর কাব্যভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য :

i. It must justify itself dramatically,

ii. ··the essential was to avoid any echo of Shakespeare, এবং

iii. ···the versification of *Every man* অর্থাৎ touch with colloquial speech.

যে-কারণে এলিঅট নাটকে গদ্যভাষার স্থলে কাব্যভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী তাও তিনি ব্যক্ত করেছেন :

> The reason for writing even the more pedestrian parts of a verse play in verse instead of prose is, however, not only to avoid calling the audience's attention to the fact that it is at other moments listening to poetry. It is also that the verse rhythm should have its effect upon the hearers, without their being conscious of it. ('Poetry and Drama')

তাছাড়া চরম নাটকীয় মুহূর্তে কাব্যিক অভিব্যক্তিই তো স্বাভাবিক মানবীয় ধর্ম :

> It will only be 'poetry' when the dramatic situation has reached such a point of Intensity that poetry becomes the natural utterance, because then it is the only language in which the emotions can be expressed at all.

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য রচনার পশ্চাতে অনুরূপ মতবাদ ও মননের হদিস পেলে আমরা স্বস্তি পেতে পারতুম, কিন্তু তার একান্তই অভাব। তবে কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে এলিঅটের কোনো-কোনো মতবাদের দ্বারা বুদ্ধদেব বসু যে প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন নজির আছে। 'Poetry and Drama' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এলিঅট লিখেছেন :

> The first thing of any importance that I discovered, was that a writer who has worked for years, and achieved some success in writing other kinds of verse, has to approach the writing of a verse play in a different frame of mind from that to which he has been accustomed in his previous work.

ঐ প্রবন্ধেরই অন্যত্র লিখেছেন, যতদিন না কাব্যনাট্য সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা প্রমোদের সম্ভাব্য উৎসরূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে, ততদিন

> …the poet is likely to get his first opportunity to work for the stage only after making some sort of

reputation for himself as the author of other kinds of verse.

বুদ্ধদেব বসু এলিঅটের এই নির্দেশনামা মেনে চলেছিলেন ব'লেই অনুমিত হয়, কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তিনি কাব্যনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে প্রথম কাব্যনাট্য প্রকাশের ব্যবধান প্রায় চার দশকের।

এলিঅট স্বীয় কাব্যনাট্য 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, পুরা-কাহিনী বা সুদূর অতীতের আখ্যানবস্তু কাব্যনাট্যের অবলম্বন হওয়া উচিত।

> Verse plays, it has been generally held, should either take their subject matter from some mythology, or else should be about some remote historical period, far enough away from the present for the characters not to need to be recognizable as human beings, and therefore for them to be licensed to talk in verse.

এলিঅটের এই পরামর্শও বুদ্ধদেব বসু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' থেকে আরম্ভ ক'রে 'সংক্রান্তি' পর্যন্ত সব কটি কাব্যনাট্যেরই আখ্যানবস্তু সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতীয় পুরাণ-কাহিনী থেকে। এলিঅট কিন্তু তাঁর মতবাদ অনুযায়ী সমস্ত নাটকের ক্ষেত্রেই কাব্যভাষার মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্যটি ব্যতীত অন্য কোনোটিরই আখ্যানবস্তু পুরা-কাহিনী বা ঐতিহাসিক নয়। তাঁর *The Family Reunion*, *The Cocktail Party*, *The confidential Clerk* প্রভৃতি নাটকের কাহিনীর পটভূমি বর্তমানের বাস্তব জগৎ থেকে আহরিত। অবশ্য তাঁর সমস্ত নাটকেই প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা বাস্তব জগতের মধ্যেও একটা অন্তরাল সৃষ্টি করেছে, এনে দিয়েছে পুরা-কাহিনীসুলভ এক পরোক্ষ দূরত্ব। বুদ্ধদেব বসু কিন্তু বাস্তব কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে কাব্যভাষা পরিহার করেছেন, তাঁর 'কলকাতার ইলেকট্রা' 'সত্যসন্ধ', 'পুনর্মিলন' প্রভৃতি বাস্তব আখ্যানমূলক নাটকের মাধ্যম গদ্য-ভাষা। 'পুনর্মিলন' নাটকের কাহিনী বাস্তব হ'য়েও অবাস্তবতার কুহকাবৃত, এক অতিলৌকিক প্রতিবেশকে বিশ্বসনীয় বাস্তব রূপ দেওয়া

হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাব্যভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নি। অথচ এলিঅট অতি আধুনিক পরিবেশ ও চরিত্রের মুখ থেকেও কাব্যভাষা শুনতে দর্শকদের অভ্যস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন : they should be made to hear it from people dressed like ourselves, living in houses and apartments like ours, and using telephones and motor cars and radio sets.

বুদ্ধদেব বসু এলিঅটের blank verse বা নাটকে ব্যবহৃত কাব্যভাষার আঙ্গিকও অনেকাংশে অনুসরণ করেছিলেন। এলিঅটের কাব্যভাষার আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য ছিল :

i. a line of varying length and varying number of syllables, with a caesura and three stresses,

ii. flexibility which blank verse must have···to give the effect of conversation (and) the movement of modern speech, এবং

iii. An avoidance of too much iambic, some use of alliteration, and occasional unexpected rhyme, helped to distinguish the versification from that of the nineteenth century.

এলিঅটের কাব্যভাষার প্রাযুক্তিক দিকটির সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটের ভাষার প্রাযুক্তিক দিকটির মিল খুঁজতে যাওয়া অযৌক্তিক, কিন্তু উভয় কবির কাব্যভাষার প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। এলিঅটের কাব্যভাষার উপর্যুক্ত লক্ষণগুলি বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাষাতেও সহজেই চোখে পড়ে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাট্যে গদ্যকবিতা ধরনের যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন তারও মূল বনেদটাই অসম দৈর্ঘ্যের চরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যতি স্থাপনের অনিয়মিত রীতির দ্বারাই চরণ-দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রিত। এর ছন্দ পয়ারেরই একটি বিশিষ্ট রূপ হলেও প্রাচীন, এমনকি, উনবিংশ শতাব্দীর পয়ার ছন্দ থেকেও এর প্রকৃতি আলাদা। গদ্যকবিতার কিছুটা কাছাকাছি, কিন্তু গদ্যকবিতা থেকেও অধিকতর নমনীয়, বহুল পরিমাণে কথ্যরীতির লক্ষণাক্রান্ত। ছন্দোবন্ধনে শৈথিল্য এবং কথ্যধর্মিতা বুদ্ধদেব বসুরও কাব্যনাট্যের ভাষাকে পূর্ববর্তী কাব্যনাট্যসমূহের ভাষা থেকে সহজেই পৃথক করেছিল এবং অভিনব স্বাতন্ত্র্যও এনে দিয়েছিল।

২

শেকস্‌পিয়ারের মতো নাট্যোপযোগী কাব্যভাষাকে বাংলায় কৌলীন্য দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রবহমান গৈরিশ-ছন্দ প্রবর্তন ক'রে। মধুসূদনের প্রতিভাসিঞ্চিত হয়ে blank verse বাংলা কাব্যধারায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের রূপ পরিগ্রহ করলেও একে নাটকীয় সংলাপে ব্যবহারের দুঃসাহস তিনি দেখান নি। প্রতিভাধর অনুসরণীর অভাবে গৈরিশ-ছন্দ পরবর্তীকালে কৌলীন্যচ্যুত হয়েছিল। তদুপরি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অমিত্রাক্ষর ছন্দ ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে সমিল এবং অমিল প্রবহমান পয়ার রূপে নাটকের মাধ্যম হওয়ায় গৈরিশ-ছন্দের ধারা সম্ভবতঃ প্রতিহত হয়। এতদ্‌ সত্ত্বেও কিন্তু একথা সত্য যে বিশ্বকবির নাট্যকাব্যে নাটকীয়তার চেয়ে কাব্যত্বের উপাদানই তুলনামূলকভাবে বেশি। কাব্যভাষার প্রতি আস্থা শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেও হারিয়েছিলেন ব'লে মনে হয়; শেষের দিকের নাটকে কৃত্রিম কাব্যভাষা পরিহার ক'রে গদ্যভাষাই ব্যবহার করেছেন, নাট্যকাব্যকে রূপান্তরিত করেছেন গদ্য-নাট্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য রচনা অনেকাংশে এলিঅটের সমধর্মী—পূর্ববর্তী ঐতিহ্য উভয়ের কাছেই পরিত্যাজ্য, উপযোগী কাব্যভাষা সৃষ্টিই ছিল উভয়েরই প্রাথমিক কর্তব্য। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যও বাংলা সাহিত্যে অভিনব, কিন্তু অভিনবত্বের মর্যাদা এলিঅট যেমন পেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু তেমনটি পান নি। তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য শ্রব্যকাব্যই, দৃশ্যকাব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অভিনীত হওয়ার পরই এলিঅটের কাব্যনাট্যের অভিনবত্ব স্বীকৃত হয়েছিল:

> ···a poetic play was staged in the Chapter House which may well mark a turning point in English drama···
>
> One's feeling was that here at last was the English language literally being used, itself becoming the stuff of drama, turning alive with its own natural poetry.[১০]

New Yorker (3 July, 1935) পত্রিকায় Samuel Jeake, Jr.-এর এই মূল্যায়নের ঐতিহাসিক সত্যতা অনস্বীকার্য।

৩

'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' এলিঅটের এবং 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই কাকতালীয় সাদৃশ্যটুকু হয়তো বা উপেক্ষণীয়, কিন্তু নাটক দুটির আঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সাদৃশ্যগুলি উপেক্ষার নয়। ক্যান্টারবারি ফেস্টিভ্যালের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে 'দি রক'-এর মতোই 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' নাটকটিও রচনা করেন এলিঅট। ক্যাথিড্রাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে চার্চ-ইতিহাসের ঐ বিশেষ কাহিনী ছাড়া কিছু কিছু দৃশ্য-পরিকল্পনাও সরবরাহ করেছিলেন।[১১] জীবনের উত্তরপর্বে এলিঅট ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন, ধর্মীয় তত্ত্বের নানাভাবে সাহিত্য রূপায়ণ ঘটেছিল তাঁর বিভিন্ন রচনায়। অনুরূপ ফরমায়েসি রচনা তাই তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। তাঁর নাটকগুলি প্রত্যক্ষতঃই ধর্মীয় চেতনায় ঋদ্ধ। 'দি রক' এবং 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' নাটকে চার্চভিত্তিক কাহিনীই গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় নাটকটিকে তো খৃষ্টজীবনের রূপক ব'লে কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন।[১২] 'দি ফ্যামিলি রিয়ুনিয়ন' তৎপরবর্তী নাটকগুলিকেও খৃষ্টধর্মীয় তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করলে নাটকগুলির বিশিষ্ট গঠন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা উজ্জ্বলতর হয়।[১৩] বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে অনুরূপ ধর্মীয় চেতনা অনপেক্ষিত হলেও কাব্যনাট্যের যুগে তাঁর পৌরাণিক কাহিনীতে আশ্রয় গ্রহণের পশ্চাতে কোনো বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব সক্রিয় ছিল কি না তার সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী যুগে 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি' প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রভিত্তিক দু-একটি রূপক কবিতা রচিত হলেও পুরোপুরি মহাভারতীয় প্রভাব বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যজীবনে পড়েছে একেবারে কাব্যনাট্যের যুগেই। এই সময়ই তিনি আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে মহাভারতের ভাষ্য রচনা করেছেন তাঁর 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থে। মহাভারতের বিভিন্ন অংশের কাহিনী নিয়েই তাঁর বিভিন্ন নাট্যকাব্যের পরিকল্পনা। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে বুদ্ধদেব বসুরও পরিণত জীবনে এলিঅটের মতো হিন্দুধর্ম কিংবা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ প্রবলতর হয়েছিল এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা' কিংবা কাব্যনাট্যের কোনোটারই ধর্মীয় ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। 'মহাভারতের কথা' বিশুদ্ধ কাব্যালোচনা,

কাব্যনাট্যগুলি বিশুদ্ধ কাব্যনাট্যই। বুদ্ধদেব বসুর হিন্দু তথা ভারতীয় পুরাণাশ্রয় গ্রহণের ব্যাপারটাকে সে-কারণেই এলিঅটের খৃষ্টধর্মীয় আশ্রয় গ্রহণের প্রতিক্রিয়া কিংবা সমান্তরাল (সমগোত্রীয়) ঘটনা ব'লে ধ'রে নিলে ভুল হবে। এলিঅট তাঁর কাব্যনাট্যগুলিতে গ্রীক আদর্শের প্রতিষ্ঠা ক'রে নাট্যরচনায় শাশ্বত ও ধ্রুপদী রীতিরই অনুবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন, বুদ্ধদেব বসুও সম্ভবতঃ ধ্রুপদী রীতির প্রতিষ্ঠা কল্পেই শাশ্বত ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যনাট্যগুলিতে। এই প্রসঙ্গেই এমন অনুমানও সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় না যে বুদ্ধদেব বসুর নাটকগুলিতে গ্রীক নাটক তথা পৌরাণিক ঐতিহ্য সম্পর্কে যে সচেতনতা অনুভূত হয় তাও এলিঅট থেকেই সংক্রমিত। গ্রীক নাটকীয় ঐতিহ্য এই দুই নাট্যকার কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে প্রযোজনীয় আলোচনা করব 'দি ফ্যামিলি রিয়্যুনিয়ন' ও 'কলকাতার ইলেকট্রা' নাটক দুটির আলোচনা কালে।

কাব্যনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েই বুদ্ধদেব বসু এলিঅটের ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে তার অধিকার অবিসংবাদিত হলেও কাব্যনাট্য যুগে উপনীত হওয়ার পূর্বে এলিঅটীয় ঐতিহ্য অঙ্গীকরণ করা সম্ভব হয় নি। তাঁর রোমান্টিক কবি-স্বভাব ছিল এই অঙ্গীকরণের বাধাস্বরূপ। কাব্যনাট্য রচনা করতে গিয়েই তিনি পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পেলেন, এলিঅটীয় কাব্যরীতি এবং কাব্যচেতনারও যথার্থ উপলব্ধি ঘটল তাঁর। ফলে এই সময়েই নাটকের পাশাপাশি তাঁর কাব্যেও এলিঅটীয় তত্ত্বের ছায়াপাত ঘটেছে, বিভিন্ন গদ্য রচনায়ও তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'-র আঙ্গিক সাদৃশ্য 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'-এর সঙ্গে, আর তাত্ত্বিক সাদৃশ্য 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর সঙ্গে। স্পষ্টতঃই 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'-কে ওয়েস্ট ল্যাণ্ড তত্ত্বের নাট্যভাষ্য ব'লে অভিহিত করা চলে। মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনীটিও ফার্টিলিটি মিথ বা উর্বরতা তত্ত্বের ভারতীয় সংস্করণ। এ-সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুও অবহিত ছিলেন। 'মরচে পড়া পেরেকের গান' কবিতার গোড়ায় কবি ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনীর যে-অবতরণিকাটুকু জুড়ে দিয়েছেন তাতেই উর্বরতা তত্ত্বের স্বরূপটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

অঙ্গদেশে যখন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো, দৈবজ্ঞেরা বললেন,

আজন্ম-বনবাসী তরুণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে নিয়ে আসতে পারলেই দুর্যোগের অবসান হবে। ঋষ্যশৃঙ্গ কখনো কোনো নারীকে চোখেও দ্যাখেন নি, তরুণ হ'য়েও তপোবলে তিনি অগ্রগণ্য ; তাই এই অসাধ্যসাধন শুধু তাঁরই পক্ষে সম্ভব, কিন্তু সেজন্য তাঁর কৌমার্যনাশ প্রয়োজন। রাজমন্ত্রীদের আজ্ঞায় এক বৃদ্ধা বেশ্যা এই অপহরণের ভার নিলে। তারই রূপসী ও যুবতী কন্যা নিপুণ উপায়ে তপস্বীকে ব্রহ্মচর্য থেকে ভ্রষ্ট করলে ; তারপর তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে আসা কঠিন হলো না। তিনি নগরে প্রবেশ করা মাত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো, রাজা লোমপাদ তাঁর কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলেন।

এই উপাখ্যান মহাভারতের অনুসারী। 'ম র চে প ড়া পে রে কে র গা ন' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় নাম-কবিতার ও 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' নাটকের উৎস-ঋণ-স্বীকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ও মহাভারতের উল্লেখ আছে :

> ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের যে-সব কবিতা প্রথম প'ড়ে তারপর আর সারাজীবন ভুলতে পারি নি, তার অন্যতম হ'লো 'পতিতা'। পরবর্তী কালে কালীপ্রসন্ন সিংহের মধ্যস্থতায়, ঋষ্যশৃঙ্গ-কাহিনীটি আমাকে বার-বার মুগ্ধ করেছে ও ভাবিয়েছে ; লুব্ধ হয়েছি তা অবলম্বন ক'রে নিজে কিছু রচনা করতে। সে-সব জল্পনা কল্পনার ফলাফল এই বইয়ের নাম-কবিতা, এবং তার অনতি পরে রচিত 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' নাটক।

'মরচে পড়া পেরেকের গান' কবিতায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'-র ছায়া স্পষ্ট নয়। কবিতা দুটির উপস্থাপন-বৈপরীত্যও অনস্বীকার্য। 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' নাটকে যুগপৎ 'পতিতা' এবং মহাভারতের ছায়া সুপ্রকট। ছায়া যারই থাক, ঋষ্যশৃঙ্গ-কাহিনীর সঙ্গে ইয়োরোপীয় হোলি গ্রেইল উপাখ্যানের গভীর সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধদেব বসুও সচেতন ছিলেন সে-সম্পর্কে :

> য়োরোপীয় হোলি গ্রেইল উপাখ্যানের যেটি অখৃষ্টীয় ও প্রাচীনতর অংশ, অনেক পণ্ডিতের মতে তার আদি উৎস এই ঋষ্যশৃঙ্গ-কাহিনী।

অথচ গ্রেইল উপাখ্যানের সঙ্গে যে-কাব্যের নিকট সম্পর্ক, সেই 'দি ও য়ে স্ট ল্যা ন্ড' সম্বন্ধে এখানে বুদ্ধদেব বসুর নীরবতা স্বভাবতঃই আমাদের বিস্ময়োদ্রেক করে।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে উর্বরতা রূপকের দিকটি গোড়া থেকেই ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকার বদ্ধপরিকর। অঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি ও সূর্যের আক্রোশের ফলে দেখা দিয়েছে অজন্মা— বন্ধ্যাত্ব, কৌমার্যের ঘটেছে প্রাদুর্ভাব। নাটকের একেবারে গোড়ায় গাঁয়ের মেয়েরা সে-কথাই বলেছে :

আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নিঃ... পশুরা ঃ
শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পর দিন দীর্ণ, শূন্য বৃষ্টি নেই!
(তপস্বী ও তরঙ্গিণী, প্রথম অঙ্ক ঃ এক)

দেবতার অনুকম্পা ভিন্ন বৃষ্টি হয় না, বৃষ্টি না হলে বন্ধ্যাত্ব-মোচনও ঘটবে না। তাই গাঁয়ের মেয়েরা কাতরে প্রার্থনা জানায় দেবতার কাছে ঃ

হে দেব, ঐরেশ! মহান! মঘবান! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও—বৃষ্টি দাও! (ঐ)

রাজপুরোহিত আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন অঙ্গরাজ্যের বন্ধ্যাত্ব, বন্ধ্যাত্বের কারণ ও বন্ধ্যাত্বমোচনের উপায় :

অক্ষম আজ অঙ্গরাজ, বীর্য তাঁর নিঃশেষ,
শুষ্ক তাই মৃত্তিকা, রিক্ত নভোতল।[১৪]
পৃথিবীর যিনি পতি, তাঁর কোষে নেই বীজবিন্দু,
রুদ্ধ তাই ঋতু, নেই শস্য, গোবৎস, সন্তান।
সব একসূত্রে বাঁধা—নক্ষত্র থেকে তৃণ,
রুদ্র, মিত্র ও জন্তুরা, সোমপায়ী ও শ্রমজীবী;
একসূত্রে বাঁধা ভ্রূণ ও উদ্ভিদ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ।
ব্যাহত আজ শৃঙ্খলা, ক্লিষ্ট তাই নিখিল।

আদি উৎস জল। একই স্রোত অন্তরীক্ষে ও ভূতলে
ঔরসে ও বৃষ্টিতে, নির্ঝরিণী ও নারীগর্ভে;
জন্ম দেয় জল, অন্ন দেয় জল, জলে জাগে প্রাণস্পন্দ ও প্রেরণা।
ব্যাহত সেই প্রবাহ, আর্ত আজ নিখিল।

একদা বৃত্র বন্দী করেছিলো জলরাশিকে,
যেমন সার্থবাহকে স্তম্ভিত করে দস্যুরা;
বন্ধ্যার স্তন ও কৃপণের ধন যেমন নিষ্ফল,
তেমনি ছিলো জল, নিশ্চল, অন্ধকার কন্দরে।

কিন্তু জলকে মুক্তি দিলেন ইন্দ্র, ধ্বংস হলো অসুর তাঁর বজ্রে,
দীর্ণ হলো পর্জন্য, সপ্তসিন্ধু প্রবহমান ;
যেমন গোষ্ঠ থেকে গাভীরা, গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো বৃষ্টি,
বর্ধিত হলো স্রোতস্বিনী, যেমন দ্যূতজয়ীর বিত্ত।

আজ অঙ্গদেশে আবার জল রুদ্ধ, তাকে মুক্তি দাও ;
ধ্বংস করো ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য।
রাজা যদি রিক্ত, তবে লুণ্ঠন করো তপস্বীকে,
সিক্ত হোক নারী ও পুরুষ, ব্যক্ত হোক মৃত্তিকার প্রতিভা।

(তপস্বী ও তরঙ্গিণী, প্রথম অঙ্ক : এক)

ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যনাশের পর বন্ধ্যাত্বমোচন হল অঙ্গদেশের, উর্বরতা ফিরে পেল প্রকৃতি ও মানুষ। গাঁয়ের মেয়েরা এবং রাজপুরোহিত এই উর্বরতা প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন। গাঁয়ের মেয়েরা বলেছে :

১ম মেয়ে। বলবো কি ভাই, আমার এই তিন যুগ বয়স হ'লো—
এমন সুবৎসর আর দেখিনি।

২য় মেয়ে। গোলায় ধান ধরে না।

৩য় মেয়ে। পুকুরগুলোতে থৈ-থৈ জল।

১ম মেয়ে। জলে রুই কাৎলা কই।

২য় মেয়ে। পাড়ে-পাড়ে পুঁই পালং হিঞে।

৩য় মেয়ে। আমার বুড়ি গাই সেদিন আবার বিয়োলো।

২য় মেয়ে। আমার নিষ্ফলা জাম গাছটায় কী ফলন এবার!

১ম মেয়ে। কুমুদিনীর কথা তো জানিস—কত ওষুধ মন্ত্রতন্ত্র ওঝা বদ্যি—সব যেন ভস্মে ঘি ঢালা। আর সেই মেয়ের কিনা যমজ হ'লো সেদিন!

৩য় মেয়ে। আমার স্বামী যে বাতে অচল ছিলেন তা যেন ভাই ভুলেই গিয়েছি। কী প্রতাপ এখন! সারা গাঁয়ে অমন ঘর ছাইতে আর কেউ পারে না।

২য় মেয়ে। আমার মেয়েটার কেবল সম্বন্ধ আসে আর সম্বন্ধ ভেঙে যায়। ঘটক বলেছিলো জন্মদোষ। কিন্তু দেখলি তো ভাই—কেমন হেসে-খেলে ঘরে-বরে বিয়ে হয়ে গেলো।

১ম মেয়ে। পিত্তরোগে ভুগে-ভুগে আমার ছেলেটার যা দশা
হয়েছিলো তোরা তো দেখেছিস। এখন সে সাঁৎরে
দিঘি পার হয়। (ঐ, তৃতীয় অঙ্ক ঃ এক)

গাঁয়ের মেয়েদের অসংস্কৃত বাচন সংস্কৃত হয়েছে রাজপুরোহিতের মুখে। তাঁর চোখে উর্বরতার ছবি ঃ

মুক্ত হ'লো স্রোতস্বিনী, অঙ্গদেশ রজস্বল,

পুত্র এলো স্বরাজ্যে, পূর্ণ হ'লো প্রতীক্ষা ; (তৃতীয় অঙ্ক ঃ তিন)

'মা র্ডা র ই ন দি ক্যা থি ড্রা ল' নাটকে আর্চবিশপ টমাস বেকেটের যে-ভূমিকা 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গের অবশ্যই সে-ভূমিকা নয়, ঋষ্যশৃঙ্গের পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে বেকেটের ঐতিহাসিক কাহিনীর তুলনাও সঙ্গত নয় ; কিন্তু এসব সত্ত্বেও উপস্থাপন ও বক্তব্যে এই দুই নাটকের একটা দূর-সাদৃশ্য বেরিয়েই পড়ে এবং এই সাদৃশ্যের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটুকু ধরা পড়েছে 'মা র্ডা র ই ন দি ক্যা থি ড্রা ল'-এর Third Priest আর 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী'-র রাজপুরোহিতের দৃষ্টিতে। আর্চবিশপের প্রত্যাবর্তন সংবাদে Third Priest বলেছেন,

For good or ill, let the wheel turn.
The wheel has been still, these seven years, and no good.
For ill or good, let the wheel turn.

প্রায় সমার্থক উক্তি করেছেন রাজপুরোহিতও ঃ

তোমরা অবতীর্ণ মঞ্চে—প্রার্থী, মাতা, অমাত্য ;
কেউ কামার্ত, কেউ সহৃদয়, কেউ রাষ্ট্রপাল ;
চক্রনেমির মুহূর্ত-বিন্দুতে ঘূর্ণিত হবে তোমরা
বহু মঞ্চে, বহু ভূমিকায়, যতদিন আয়ু না হয় নিঃশেষ।...

কিন্তু এই চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লো দু'জনে,
অলক্ষ্য পথে, আত্মবশ, নিঃসঙ্গ ঃ
তাদের ভূমিকা আজ বিচূর্ণিত ঘট, ঘটনার অধীন তারা নয় আর।
এক তপস্বী-যুবরাজ, এক বারাঙ্গনা-প্রেমিকা।

আশা করছি এই চক্র-চিত্রকল্পের ক্ষীণ সূত্র ধ'রে বক্তব্য ও উপাখ্যানগত অনতিউজ্জ্বল সাদৃশ্যটুকু টেনে তুলতে পারব। আর্চবিশপ ক্যান্টারবারি থেকে চলে যাওয়ায় সেখানকার ধর্মীয় জীবনে চার্চের জগতে গতিহীনত্ব

নেমে আসে। চার্চ এবং সিংহাসনের বিবাদের কথা না তুললেও বলা চলে আর্চবিশপের অভাবে ধর্মীয় নির্দেশ ও পরিচালকহীন ক্যান্টারবারির ধর্মীয় জীবন আতঙ্কে ও নিরাপত্তার অভাবে রুদ্ধগতি। এই অবস্থা চলে দীর্ঘ সাত বছর। আর্চবিশপের প্রত্যাবর্তনই চার্চের জগতে গতির সঞ্চারক। ক্যান্টারবারির ধর্মীয় জীবনের গতিরুদ্ধতা তুলনীয় অঙ্গদেশের বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে। সেখানে চক্রের গতিরুদ্ধতার কারণ সূর্যের আক্রোশ ও অনাবৃষ্টি। উর্বরতার প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে চক্রে গতিসঞ্চার করতে অঙ্গরাজ্যে এসেছেন তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ, ক্যান্টারবারিতে ধর্মযাজক বেকেট। গতি পুনঃ সঞ্চারিত হওয়ার পর উভয়েই চক্র থেকে সরে গেছেন।

'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী'-র গাঁয়ের মেয়েরা 'মা র্ডা র ই ন দি ক্যা থি ড্রা ল'-এর ক্যান্টারবারির মেয়েদের কোরাসের অনুরূপ, রাজপুরোহিত Priest-দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোরাসের

> ...What danger can be
> For us, the poor, the poor women of Canterbury ?
> What tribulation
> With which we are not already familiar ?
> ...We wait, we wait,
> And the saints and martyrs wait, for those who shall be martyrs and saints.
> Destiny waits in the hand of God, shaping the still unshapen :
> I have seen these things in a shaft of sunlight.

এই সমস্ত চরণের একটা ক্ষীণ আভাস অনুভূত হতে পারে গাঁয়ের মেয়েদের সংলাপের কয়েকটি চরণে :

> দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী, মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ,
> তবু তো কিছু ভালো মেনেছি সংসারে জেনেছি দেবতারা বন্ধু—
> যেহেতু ফুলে ওঠে সোনালি ধান আর সোনার সন্তান মায়েরকোলে,
> এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃত স্বাদ পায় অন্ন।...
> যেমন বেঁচে থাকে কেন্নো, কেঁচো, আর মাটিতে বুক টেনে পন্নগ,
> যোজন পার হ'য়ে ক্লান্ত কূর্মেরা আবার ফিরে পায় সিন্ধু,
> তেমনি ঋতু আর শ্রমের আশ্রয়ে চিন্তাহীন বাঁচি আমরা—
> (ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী, প্রথম অঙ্ক : এক)

নাটকের শেষে কোরাসের মুখে যে-প্রার্থনা স্থান পেয়েছে,

Lord, have mercy upon us.
Christ, have mercy upon us.
Lord, have mercy upon us.
Blessed Thomas, pray for us.

-এর সঙ্গে নিকট সাদৃশ্য গাঁয়ের মেয়েদের প্রার্থনার,

১ম মেয়ে। ভগবান, আর আমাদের উপর রোষ কোরো না।
৩য় মেয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গ, আমাদের বাঁচিয়ে রেখো।...
১ম মেয়ে। ভগবান, আর রোষ কোরো না। ঋষ্যশৃঙ্গ, আমাদের উপর দয়া রেখো। (তৃতীয় অঙ্ক : এক)

Second Priest-এর 'You are foolish, immodest and babbling women'-এরই প্রতিধ্বনি যেন শুনি ১ম রাজদূতের মুখে, 'মূর্খ তোমরা! মূর্খ স্ত্রীলোক!' তরঙ্গিণী ও সখীদের ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধকরণ ব্যাপারটার সঙ্গে চারজন Tempter কর্তৃক বেকেটকে প্রলুব্ধকরণের সাদৃশ্য আছে। তবে ব্যাপার দুটির পরিণতি ও ফলাফল এক নয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত এই আলোচনায় একটি উদ্যত প্রশ্ন এড়িয়ে গেছি। 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' নাটকটিকে কাব্যনাট্য বলা চলে কি? 'মা র্ডা র ই ন দি ক্যা থি ড্রা ল' অবশ্যই কাব্যনাট্য, এলিঅটীয় কাব্যভাষা বা blank verse-ই এর বাহন, পরবর্তী নাটকগুলিতে এই কাব্যভাষা আরো পরিশীলিত হয়েছে। 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' গদ্যভাষাতেই রচিত, মাত্র তিনটি সংলাপ কাব্যভাষায়। সংলাপ তিনটির প্রথমটি গাঁয়ের মেয়েদের, অন্য দুটি রাজপুরোহিতের। প্রথম দুটি নাটকের প্রথম দৃশ্যে এবং অপরটি নাটকের শেষ দৃশ্যে সন্নিবিষ্ট। কাব্যসংলাপ তিনটির প্রতি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে বলতে হয়, নাটকটি গদ্য ও কবিতার মিশ্রণে প্রাচীন ধারানুসারে রচিত। অনুরূপ মিশ্রণ ঘটেছে 'মা র্ডা র ই ন দি ক্যা থি ড্রা ল' নাটকেও। এই কাব্যনাট্যের কিছু কিছু সংলাপ গদ্যে রচিত, দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথিত চারজন নাইট-এর সব কটি সংলাপ গদ্যে রচিত। কিন্তু এলিঅটের এই গদ্যসংলাপ নিছক গদ্য নয় যেমন, তেমনি 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' নাটকের গদ্যসংলাপও নিছক গদ্য নয়। এই গদ্য কাব্যধর্মী, 'লি পি কা'-র গদ্যের মতো। এলিঅট John Millington Synge-এর গদ্য ভাষাকে কাব্যধর্মী বলেছিলেন, 'because they are based upon the

idiom of a rural people whose speech is naturally poetic, both in imagery and in rhythm.[১৫] অনুরূপ অর্থে বুদ্ধদেব বসুর নাটকটির গদ্যভাষাকেও কাব্যধর্মী বলতে আমরা বাধ্য। 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী'-র উপাখ্যান কাব্যিক আবেদনে সমৃদ্ধ, ঘটনা এবং চরিত্রে কাব্যময় আবেগের অবকাশ সুপ্রচুর, ব্যবহৃত গদ্যও ছন্দোময়। আমাদের একথাও ভুললে চলবে না যে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে এই নাটকে, প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরবর্তী পদক্ষেপে 'প্র থ ম পা র্থ' পূর্ণাঙ্গ ও অবিমিশ্র কাব্যনাট্য রচনা সহজ হয়েছে।

'অ না মনী অ ঙ্গ না' নাটকেও উর্বরতা প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। মূল বক্তব্য কুরুবংশের বন্ধ্যাত্ব আশংকা ও উর্বরতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

তরুণ রাজা বিচিত্রবীর্য
যেন অগ্রজের কৌমারব্রতের শোধ নেবার জন্য
ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুই পত্নীর অঙ্গে
এমন উত্তালভাবে যে ছিদ্রান্বেষী মৃত্যু
বাঁধলো তাঁকে যক্ষ্মার রজ্জুতে, যৌবনেই ছিনিয়ে নিয়ে গেলো।
—এদিকে রানীরা রইলেন নিঃসন্তান!

সত্যবতী এই বন্ধ্যাত্ব থেকে কুরু রাজবংশকে উদ্ধার করতে নিয়োগ করলেন আপন কানীন পুত্র ব্যাসদেবকে। কিন্তু 'দুর্ভাগ্যে প্রহত···কুরুকুল' তাই জ্যেষ্ঠা মহিষী অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র,

তার চক্ষুগোলক অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আশাহীন ভাবে।
আর অন্যজন—অম্বালিকার পুত্র—
রুগ্ণ সে, এমন পাণ্ডুবর্ণ
যে দৈবজ্ঞ বলেছেন পুত্রের জনক হতে সে কখনো পারবে না।

কুরু রাজবংশের ধারা অব্যাহত রাখতে অম্বিকার গর্ভে সুস্থ ও অক্ষুন্নকায় সন্তান উৎপাদন করতে সত্যবতী ব্যাসদেবকে পুনর্নিয়োগ করতে চাইলেন; কিন্তু অম্বিকার অনিচ্ছায় ও ষড়যন্ত্রে দাসী অঙ্গনার গর্ভে জন্ম নিলেন বিদুর।

উর্বরতা তত্ত্ব ও ঋষ্যশৃঙ্গ-কাহিনী যে বুদ্ধদেব বসুর মন গভীরভাবে অধিকার করেছিল তার প্রমাণ জাপানি 'নো-নাটকের অনুলিখন' 'ই ক্কা কু সে মি ন'। ইক্কাকু ঋষ্যশৃঙ্গেরই জাপানি অবতার। এই নাটকেরও আলম্বন

উর্বরতা তত্ত্ব। কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হলেও অনেকাংশে 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী'-র অনুরূপ। তপস্বী ইক্কাকু-ঋষ্যশৃঙ্গ 'মন্ত্রের জোরে'

দৈত্যদের বন্দী করলেন গুহার মধ্যে, গুহার মুখ বন্ধ।
কিন্তু দৈত্যরাও দেবতা, তাঁদের দান বৃষ্টি,
তাঁরা যেহেতু বন্দী, তাই বহুকাল বৃষ্টি নেই।
রাজার মনে শোক, মাটির বুক শুকনো,
(সংক্রান্তি…ই ক্কা কু সে ন্নি ন, পৃঃ ১০৪)

বৃষ্টি ও উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে বারাণসীর রাজা 'ইক্কাকুর মনে ভ্রান্তি জাগাতে' এবং জাদুবিদ্যা খর্ব করতে 'তুলনাহীন সুন্দরী' শ্রীমতী সেন্দাকে পাঠালেন 'অতি কঠিন পথ পেরিয়ে পর্বতচূড়ায়'। 'কার্য সিদ্ধ হলো'—নেশাচ্ছন্ন ইক্কাকু এলেন বারাণসী ধামে। তাঁর 'আর নেই মায়াবল…তিনি ভুলে গেছেন মন্ত্র'। দৈত্য-দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হলেন। ফলে

উল্লাসে দৈত্য-দেবতারা স্বর্গ মর্ত ছাপিয়ে
ধ্বনিত করলেন বজ্র, চমক তুললেন বিদ্যুতে,
আকাশটাকে ফাটিয়ে দিয়ে ঝর্ঝর
ঝর্ঝর বৃষ্টি নামিয়ে আনলেন, বন্যার মতো শব্দে। (পৃঃ ১১৫)

অনুরূপ প্রসঙ্গের ইঙ্গিত ছিল 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী'-র রাজপুরোহিতের উক্তিতে (প্রথম অঙ্ক ঃ এক) ঃ

একদা বৃত্র বন্দী করেছিলো জলরাশিকে,…

'প্র থ ম পা র্থ' এবং 'কা ল স ন্ধ্যা' নাটকের কোনো-কোনো সংলাপে এলিঅটের কোনো-কোনো বক্তব্যের ক্ষীণ অনুরণন অনুভূত হয়। 'প্র থ ম পা র্থ' নাটকের কৃষ্ণের একটি সংলাপে যুদ্ধান্তের বন্ধ্যাত্ব আভাসিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের যে-বন্ধ্যাত্বের ছবি এলিঅট দেখেছিলেন তার সঙ্গে এর একটা আংশিক সাদৃশ্য আছে বলেই মনে হয়।

কর্ণ, তুমি কি দেখছো না
কুরুবংশের এই গৃহবিবাদ
আজ বিস্তীর্ণ হলো পৃথিবীতে
চীন, যবন, বাহ্লিক রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত ?
সব নদী যেমন সমুদ্রে মেশে
তেমনি সর্বদেশের সৈন্যদল মিলিত হ'লো
এই ব্রহ্মাবর্তে, কুরুক্ষেত্রে ?

আর তারপর—

হয়তো মদ্রদেশে হাহাকার, মৎস্যদেশে দুর্ভিক্ষ,
সুদূর কম্বোজপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব,
চেদিরাজ্য যুবকহীন, সিন্ধুরাজ্যে সধবা নেই—
ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত। (প্র থ ম পা র্থ, পাঁচ)

'কা ল স ন্ধ্যা' নাটকে কৃষ্ণের উক্তি (দ্বিতীয় অঙ্ক : ১)

কিন্তু, দ্যাখো, এ-মুহূর্ত এইমাত্র
অন্য এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো,
অন্য এক মুহূর্ত আবার।···
যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত,
যা নেই, তা কখনো ছিলো না।

কিংবা ব্যাসদেবের উক্তিতে (দ্বিতীয় অঙ্ক : ৩)

এই কি যথেষ্ট নয়, তুমি আজ অন্যদের স্মৃতি,
ভূর্জপত্রে অবিরল নবজাত,
ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ অতীত—এক চিরবর্তমান ?

এই ধরনের উক্তির সঙ্গে 'বার্নট নর্টন'-এর Time present and time past ···প্রভৃতির একটা ক্ষীণ সাদৃশ্যের সম্ভাবনা এড়ানো যায় না।

ঐ নাটকেরই কৃষ্ণের উক্তি (প্রথম অঙ্ক : ৪)

জেনো, এই ধ্বংস—এও ভালো। এরই সংযোজনে ফিরে এলো
বৃত্তবিন্দু পূর্ণ হলো কালের ঘূর্ণন।

কিংবা 'প্র থ ম পা র্থ' নাটকে কৃষ্ণের উক্তি (পাঁচ)

তাঁর স্থির কেন্দ্রে, তাঁর শান্তির অন্তঃপুরে।

এই সমস্ত সংলাপের 'বৃত্তবিন্দু' তথা 'স্থির কেন্দ্র' এলিঅটের still point-এর সমার্থক ব'লে গ্রহণ করা সম্ভবতঃ অসমীচন নয়।

যে-গ্রীক উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে এলিঅটের 'দি ফ্যা মি লি রি য়ু্য নি য় ন' নাটকটি রচিত, বুদ্ধদেব বসুর 'ক ল কা তা র ই লে ক ট্রা' নাটকটির পশ্চাতেও সেই একই উপাখ্যানেরই ছায়া। ট্রয় যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বীর আগামেমনন আর্গন প্রাসাদে পৌঁছোনর সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রী ক্লিটেমনেস্ট্রা ও তার উপপতি ঈজিসথসের হাতে হীনভাবে নিহত হন। পরে আগামেমনন-কন্যা ইলেকট্রার প্ররোচনায় পুত্র অরেস্টেস মাতা ও

বিপিতাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। এই ট্র্যাজিক কাহিনী ও তার গ্রীক উপাদান নিয়ে আধুনিক ইংলণ্ডের পটভূমিতে এলিঅট কাব্যনাট্য রচনা করেন।[১৬] কাহিনী ও পটভূমি রূপান্তরে এলিঅটের লক্ষ্য ছিল দুটি : এক, কাব্যনাট্যকে দিয়ে আধুনিক সভ্যতার উপকরণভিত্তিক ড্রয়িং-রুমের চৌকাঠ অতিক্রম করানো ; এবং দুই, খৃস্টীয় মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।[১৭]

বুদ্ধদেব বসুর 'কলকাতার ইলেকট্রা'-র সঙ্গে এলিঅটের 'দি ফ্যামিলি রিয়্যুনিয়ন'-এর মূল বৈসাদৃশ্যটুকু এই লক্ষ্যের মধ্যেই নিহিত। এলিঅট তাঁর এই দ্বিতীয় নাটকে কাব্যনাট্যকে ঐতিহাসিক কিংবা প্রত্যক্ষতঃ ধর্মীয় কাহিনীর আবেষ্টনী থেকে মুক্ত ক'রে কেতাদুরস্ত আধুনিক পারিবারিক পরিবেশেও সম্ভবপর ক'রে তুলেছেন। ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে অধিকতর সমসাময়িক কথ্যধর্মী। ধর্মীয় রূপকের বিচারে এই নাটকের নায়ক হ্যারি পাপকলঙ্কিত মানব। হ্যারির জন্মের তিন মাস পূর্বে তার বাবা স্ত্রী এমি-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই পাপস্পৃহা আদি পিতার পাপের মতোই হ্যারির মধ্যে সংক্রমিত, সে তার স্ত্রীকে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। পাপকলঙ্কিত হ্যারি পরম কারুণিক ঈশ্বরের করুণায় তথা মুক্তিদাতা যীশুর অনুগ্রহে ধাপে-ধাপে ঈশ্বরপুত্র হয়ে উঠেছে এবং ঐশজীবন লাভ করেছে।[১৮] খৃস্টীয় ধর্মতত্ত্বের মূল শিক্ষাই এই রূপক কাহিনীর সাহায্যে রূপায়িত। 'কলকাতার ইলেকট্রা' নাটকে অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় না। অতিবাস্তব এবং আধুনিক পারিবারিক পরিবেশে (এলিঅটের ভাষায় এখানে টেলিফোন প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার উপকরণ ব্যবহৃত) এই নাটকের কাহিনী পরিকল্পিত ব'লে বুদ্ধদেব বসু এখানে গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। ধর্মীয় তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়াস এই নাটকে নেই, যা আছে তা মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে এই গ্রীক কাহিনীকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস।

'ইয়োরোপীয় কবি'-র ঐতিহ্যের অনুসারী এলিঅট স্বীয় কাব্যনাট্যে গ্রীক নাট্যরীতি ও গ্রীক কাহিনীর ছায়া অনুসরণ করেছিলেন সম্ভবতঃ গ্রীক নাটকের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, কিংবা তাঁর কাব্যনাট্যকে গ্রীক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য। বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে নিছক সৃষ্টিস্পৃহা অথবা সাহিত্য-কৌতূহল ছাড়া অন্যরূপ কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল কি না সে-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

তবে অনুমিত হয় বনেদী ইয়োরোপীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার গভীর আগ্রহ যেমন এলিঅটকে গ্রীক ঐতিহ্যের সন্ধান দিয়েছে তেমনি ভারতীয় ও গ্রীক ধ্রুপদী কাহিনী আশ্রয় করে বুদ্ধদেব বসু কি ধ্রুপদী জগতে এক বিশ্বজোড়া ব্যাপকতার অনুসন্ধান প্রয়াসী? কিংবা ঐতিহ্যান্তরের আশ্রয়ে তিনি নিছকই ভিন্নতর ধ্রুপদী জগতের আস্বাদনবিলাসী?

ঈস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস সৃষ্ট ইলেকট্রা-কাহিনী নিয়ে দেশ, কাল ও জীবনদর্শন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের নাট্যকারেরা যে ধরনের নাটক রচনা করেছেন, বুদ্ধদেব বসুও অনুরূপ চেষ্টাই করেছেন 'ক ল কা তা র ই লে ক ট্রা' নাটকে। 'লেখকের ভূমিকা' থেকে সে-কথাই জানতে পারি:

> হোমর বা হেসিয়াডে আগামেম্নন-কন্যা ইলেক্ট্রার কোনো উল্লেখ নেই; এস্কিলসের অরেস্টেইয়ার দ্বিতীয় নাটকে সে উজ্জ্বলভাবে আবির্ভূত হ'লো, তারপর তাকে বিশ্বমানসে প্রতিষ্ঠিত করলেন সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস। আধুনিক কালে তাকে নায়িকা ক'রে নাটক লিখেছেন অস্ট্রিয়ার হুগো ফন হোফমানস্টাল ('Elektra'), আমেরিকায় ইউজীন ও'নীল ('Morning Becomes Electra') ও ফ্রান্সে জাঁ জিরাদু ('Electra')। জাঁ-পোল সার্ত্র-এর 'মা ছি রা' ('ল্যে মু শ্') নাটকেও ইলেক্ট্রার চিত্রণ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই স্বীয় দেশ, কাল ও জীবনদর্শন অনুসারে, গ্রীক পুরাণের এই করুণ, ভীষণ মোহিনীকে ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নতুনভাবে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন; আমিও, সমকালীন বাংলা-দেশের পটভূমিকায় সেই চেষ্টাই করেছি।

লক্ষণীয়, 'ম র চে-প ড়া পে রে কে র গান'-এর ভূমিকায় ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান প্রসঙ্গে এলিঅটের ওয়েস্টল্যান্ড প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নি, এখানেও ইলেক্ট্রা কাহিনী প্রসঙ্গে এলিঅটের 'দি ফ্যা মি লি রি য়ু্য নি য় ন' নাটক সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেন নি বুদ্ধদেব বসু।

কাব্যনাট্য রচনা পর্বের গোড়া থেকেই ইলেক্ট্রা-কাহিনী বুদ্ধদেব বসুর মনকে অধিকার করেছিল। 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' নাটকেই তার উল্লেখ আছে:

> শোনোনি সেই যবন দেশের কাহিনী। রাজা অগ্নিমাণিক্য দৈবজ্ঞের নির্দেশে আপন ঔরসজাত তরুণী কন্যা ফেনভাঙ্গিনীকে

পশুর মতো বলি দিয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়ী হয়ে যে-মুহূর্তে তিনি স্বরাজ্যে ফিরলেন, সে-মুহূর্তে তাঁর অসতী ভার্যা অক্লমশ্রী তাঁকে পাশবন্ধ মহিষের মতো নিধন করলে, এবং যুবক পুত্র অরিষ্টের হাতে মৃত্যু হলো পাপিষ্ঠা জননীর। (তপস্বী ও তরঙ্গিণী, প্রথম অঙ্ক ঃ এক)

এখানে যবন দেশের কাহিনী স্পষ্টতঃই গ্রীক কাহিনী ; আগামেম্‌নন, ইফিজিনিয়া, ক্লিটেম্‌নেস্ট্রা এবং অরেস্টেস্‌ যথাক্রমে হয়েছে অগ্নিমাণিক্য, 'ফেনভঙ্গিনী, অক্লমশ্রী এবং অরিষ্ট। যবন অর্থে গ্রীকের উল্লেখ আছে 'সংক্রান্তি' নাটকেও। সেখানেও ইলেক্‌ট্রা কাহিনীর ইঙ্গিত ঃ

গান্ধার-কন্যা, আমার সন্দেহ
তোমার রক্তে আছে সেই যবন কুলের মিশ্রণ,
যাদের ইতিহাসে কীর্তিত হয়, শুনেছি,
অমানুষিক নৃশংসতা,আর্যাবর্তে অবিশ্বাস্য ;
পত্নীর হাতে পতিহত্যা, পিতার হাতে কন্যার,
পুত্রের হাতে মাতার, মাতার হাতে সন্তানের।[১৯]

ঈস্‌কাইলাস-এর 'খোয়েফোরয়' (Choephoroe.) অবলম্বনে মুখ্যতঃ অরেস্টেস চরিত্রের ভিত্তিতে এলিঅটের নাটকটি পরিকল্পিত।[২০] কাহিনীর মাধ্যমে খৃস্টীয় ধর্মতত্ত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন বলেই কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য ফুটেছে এলিঅটের নাটকে ; ঈস্‌কাইলাস, ইউরিপিডাস কিংবা সফোক্লিস থেকেও দূরে সরে গেছেন। গ্রীক কাহিনীতে আগামেম্‌নন নিহত হয়েছিলেন স্ত্রী ও তার প্রণয়ীর ষড়যন্ত্রে। এলিঅটের নাটকে হ্যারির বাবা প্রণয়িনী শ্যালিকার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে স্ত্রী এমিকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। পরে অবশ্য রহস্যাবৃত কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে এবং এমিকে এই মৃত্যুর নিমিত্ত সন্দেহ ক'রে হ্যারি তাঁকে খুন করার কথা ভেবেছে। ইলেক্‌ট্রা কিংবা ঈজিস্‌থস্‌-এর মতো কোনো চরিত্রও এলিঅট সৃষ্টি করেন নি।

বুদ্ধদেব বসুর 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা'-র অবলম্বন ঈস্‌কাইলাস কিংবা ইউরিপিডাস নয়, সফোক্লিস। সফোক্লিসের 'ইলেক্‌ট্রা' নাটক থেকেই তিনি তাঁর কাহিনী এবং চরিত্রসমূহ আহরণ করেছেন। সফোক্লিস-এর ইলেক্‌ট্রার মতোই বুদ্ধদেব বসুর শম্পা দীনবেশিনী, মা ও বিপিতার চোখে পাগলিনী ; পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় উভয়েই দৃঢ়সঙ্কল্প, উভয়েই ভ্রাতাকে প্ররোচিতকরেছে হত্যাকার্যে। 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা'-র

অন্যান্য চরিত্রগুলিও সফোক্লিসের অনুরূপ। সফোক্লিসের ক্লিটেমনেস্ট্রা, ইজিস্থস, ক্রিসোথেমিস ও অরেস্টেস বুদ্ধদেব বসুর নাটকে হয়েছে যথাক্রমে মনোরমা, অজেন, কনক ও অদ্রি। উভয় নাটকের কয়েকটি ঘটনায় সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য আছে কিছু কিছু সংলাপেও। শম্পার উক্তি প্রায়শঃই ইলেকট্রার অনুরূপ সংলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উৎস এবং কাহিনীর অভিন্নত্ব না থাকলেও 'কলকাতার ইলেকট্রা' নাটকের অদ্রি এবং 'দি ফ্যামিলি রিয়ুনিয়ন'-এর হ্যারি অভিন্ন। স্বভাবে, সমস্যায়, অন্তর্দ্বন্দ্বে, এমন কি উপস্থাপনেও চরিত্র দুটির সমমুখিতা বিস্ময়কর। অদ্রিকে শিক্ষার জন্য বিলেতে পাঠানো হয়েছিল। কেম্ব্রিজের পড়া শেষে ইয়োরোপ দেখতে বেরিয়ে এথেন্স থেকে মাকে টেলিফোন ক'রে জানাল, সে বাড়ি ফিরছে প্লেনে। তারপরই হঠাৎ স্বপ্নে তার মৃত বাবাকে দেখল। ফলে তাড়াহুড়ো ক'রে সে বাড়ি পৌঁছোল নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই। নাটকে তার অনুপ্রবেশ এখানেই। Harry-ও নাটকের প্রারম্ভে নেপথ্যে আছে, প্রবাসে—কানাডায়। আকস্মিকভাবে সে বাড়ি ফিরল, যখন তাকে কেউ আশা করে নি। আসার আগে সে-ও টেলিফোন করেছিল। এমি-র উক্তি থেকে জানতে পারি সে-কথা :

> Harry telephoned to me from Marseilles,
> He would come by air to Paris, and so to London,
> And hoped to arrive in the course of the evening.
> (Part I, Scene I)

টেলিফোনে অনুরূপ উক্তি মনোরমার মুখ থেকেও শোনা যায় :

> হ্যালো···অদ্রি? অদ্রি কথা বলছিস?···হ্যাঁ, আমি মা। আমি মা বলছি।···কোত্থেকে?···আথেন্স? আথেন্সে কেন? ···কী বললি? তুই আসছিস? কলকাতায়? ···কবে?··· সাতুই? রোববার? তার মানে—কাল? ···আলইটালিয়া—ফ্লাইট নাম্বার—হ্যাঁ, বল—বি-টু-ও-থ্রী—অ্যারাইভিং দমদম সিক্স-টোয়েন্টি পি. এম··· (প্রথম অঙ্ক)

হ্যারি এবং অদ্রি উভয়েরই বাবার মৃত্যু রহস্যাবৃত এবং সে-রহস্য উভয়েরই অজ্ঞাত (হ্যামলেট-এর মতো)। অদ্রিকে তার দিদি শম্পা বাবার মৃত্যু সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ও ষড়যন্ত্র অবহিত করেছে এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধে প্রতিহত্যায় প্ররোচিত করেছে। অদ্রির বাবার মৃত্যুর পশ্চাতে ছিল তার

মা মনোরমা ও মা-র প্রণয়ী অজেনের ষড়যন্ত্র। হ্যারিকে অনুরূপভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ তার পিতার রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে নি। পিতার মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ দানা বাঁধতেই সে তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হয়ে নানাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তথ্য উদ্ধারের জন্য কখনো চেপে ধরেছে পারিবারিক চিকিৎসক ডা. ওয়ারবার্টনকে আবার কখনো বা মাসি তথা পিতার প্রণয়িনী আগাথাকে। ডা. ওয়ারবার্টনকে হ্যারি জিজ্ঞেস করেছে :

What you have to tell me
Is either something that I know already
Or unimportant, or else untrue.
But I want to know more about my father.
I hardly remember him, and I know very well
That I was kept apart from him, till he went away.
We never heard him mentioned, but in some way or another
We felt that he was always here.
But when we would have grasped for him,
there was only a vacuum
Surrounded by whispering aunts : Ivy and Violet—
Agatha never came then. Where was my father ?
(Part II, Scene I)

এ ধরনের কৌতূহলের অভিব্যক্তি অদ্রির সংলাপে সংযোজিত হলেও খুব বেশি অযৌক্তিক মনে হতো না, অবশ্য এরকম অনেক কথাই শম্পার সংলাপে স্থান পেয়েছে।

ডা. ওয়ারবার্টন হ্যারির মা-বাবার মনোমালিন্য এবং তাঁদের বিবাহিত জীবন যে সুখের ছিল না, এ তথ্যও জানিয়েছেন। সে-কারণেই হ্যারির বাবা বিদেশে চলে গিয়েছিলেন, তা-ও জানা গেছে তাঁর মুখ থেকেই :

...You know that your mother
And your father were never very happy together :
They separated by mutual consent

And he went to live abroad. You were only a boy
When he died. You would not remember.

অনুরূপ তথ্য অদ্রির মা-বাবা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। শম্পার সংলাপে অনুরূপ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে :

> বাবা যুদ্ধে যাবার আগে থেকেই অজেন। সেইজন্যেই তাঁর চলে যাওয়া।...আমি বলি, বাবা বেশ করেছিলেন। স্ত্রী ভালোবাসে না, তবু তার পাশে বসে থাকা! কোনো সত্যিকার পুরুষ তা পারে না। ...তুই কিছু জানিস না, অদ্রি, তুই ছোট ছিলি, অজ্ঞান ছিলি, ...আমি জানি—আমি দেখেছি। দেখেছি আমি বাবার চোখে বেদনা। আর মা'র চোখ—বাবার জন্য হিম, অজেনের জন্য ভ্রমর।[২১] (তৃতীয় অংক)

বাবার সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে গিয়ে হ্যারি জানতে পেরেছে তার চেহারার সঙ্গে তার বাবার চেহারার গভীর সাদৃশ্য :

Harry. ...Tell me
Did you know my father at about my present age?

Warburton. Why, yes, Harry, of course I did.

Harry. What did he look like then? Did he look at all like me?

Warburton. Very much like you. Of course there are differences:
But allowing for the changes in fashion
And your being clean-shaven, very much like you.
And now, Harry, let's talk about yourself.

Harry. I never saw a photograph. There is no portrait.
(Part II, Scene I)

অদ্রিও যে পিতা ইন্দ্রনাথের মতো দেখতে হয়েছে সে-কথা প্রকাশ পেয়েছে অজেন ও মনোরমার কথোপকথনে :

অজেন। ...লক্ষ্য করেছো, কী রকম ওর বাবার মতো দেখতে হয়েছে? ছেলেবেলায় কিন্তু বোঝা যায়নি। কপাল, ঠোঁট... প্রায় চমকে উঠতে হয়।

মনোরমা। ···হ্যাঁ···ঠিক বলেছো। এমন কি গলার আওয়াজটা—

অজেন। একেবারে ইন্দ্রনাথের। (কলকাতার ইলেক্‌ট্রা, দ্বিতীয় অঙ্ক)

অদ্রিও বাবার ছবি দেখে নি কখনো, তাই স্বপ্নে বাবার মুখ তার চেনা মনে হয় নি, 'মুখটা যে চেনা তা নয়, কিন্তু ঠিক বুঝলাম—বাবা'। শম্পার দেখানো ফটোগ্রাফও তাই পুরোপুরি চিনতে পারে নি :

শম্পা। স্বপ্নে তুই এই মুখ দেখেছিলি! কাল। আথেন্সে।

অদ্রি। ···এই মুখ—হ্যাঁ, তাই তো! না—ঠিক মনে পড়ছে না। (ঐ)

কাহিনীর উপসংহারে অদ্রি মাকে খুন করেছে এবং তারপরই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। মনোরমা অদ্রিকে নিজের কাছে রেখে স্নেহময়ী মাতা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। স্নেহবন্ধনে ধরা দেবার মতো মানসিক দুর্বলতা অদ্রির মনের কোণে উঁকি দিলেও শেষপর্যন্ত সে এই দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। অনুরূপ স্নেহের আহ্বান এমি-র কাছ থেকেও এসেছিল, কিন্তু তাতে ধরা না দিয়ে হ্যারিও উয়িশউড ছেড়ে চলে গেছে।

হ্যারি এবং অদ্রি উভয়ের মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক সংঘাত। হ্যারির জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তুলে ধ'রে আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন সোপান রূপায়িত করেছেন নাট্যকার। পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব বসু দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখিয়ে অদ্রির (হয়তো-বা শম্পাকেও) চরিত্রটিকে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেতে চেয়েছেন। নাটকের মধ্যে 'ম্যানিয়া', 'মনোম্যানিয়া', 'অবসেশন', 'ফিক্সেশন', 'নিউরটিক', 'স্কিৎসোফ্রেনিক', 'সাইকিয়াট্রি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের মধ্যে বোধহয় অনুরূপ ইঙ্গিতই নিহিত। স্পষ্টতঃই স্বীয় দেশ কাল ও জীবনাদর্শ অনুসারে গ্রীক কাহিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বমুক্ত অরেস্টেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়ণে এলিঅট ও বুদ্ধদেব বসু সমপ্রবণতার নৈকট্যে উপনীত।

'পুনর্মিলন' নাটকের সঙ্গে 'দি ফ্যামিলি রিয়্যুনিয়ন' নাটকের নামকরণ-সাদৃশ্য থাকলেও বুদ্ধদেব বসুর এই নাটকটির সঙ্গে কাহিনীগত একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে '*The confidential clerk*' নাটকের। এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক Colby Simpkins-কে (কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্কের

ভূমিকা তারই) ঘিরে এলিঅটের এই নাটক, তার পিতৃপরিচয় এবং জন্মরহস্য উদ্ঘাটনই মূল আখ্যানবস্তু। Sir Claude Mulhammer-এর কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্কের চাকুরি নিয়ে আসে তরুণ যুবক Colby Simpkins। তাকে দেখেই মুলহ্যামার-দম্পতির মধ্যে আকস্মিক ভাবে অপত্যস্নেহ জেগে ওঠে। তাঁরা জানতে পারেন যে তার পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত, মা Mrs. Guzzard। Sir Claude-এর মনে পড়ে যায় তিনি জনৈকা Mrs. Guzzard-এর ওপরই ভার দিয়েছিলেন তাঁরই অবৈধ প্রণয়জাত সন্তান মানুষ করার নিয়মিত মাসোহারার পরিবর্তে। ঘটনাচক্রে Lady Elizabeth Mulhammer-ও তাঁর কানীন-পুত্র গচ্ছিত রেখেছিলেন এই Mrs. Guzzard-এরই কাছে। Mrs. Guzzard-এর মুখ থেকে প্রকৃত তথ্য জানা যায়, Colby তারই গর্ভজাত সন্তান। Sir Claude-এর ছেলে শৈশবেই মারা যায়, তাঁকে সে-কথা জানানো হয় নি মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে। Mrs. Guzzard লেডী মুলহ্যামারের ছেলেকেও হস্তান্তর করেছিল এবং Sir Claude-এর দেওয়া মাসোহারায় নিজের ছেলেকেই মানুষ করেছিল।

'পু ন র্মি ল ন' নাটকের কাহিনীতে আছে, মৃত্যুর পরে (সম্ভবতঃ পরপারের) এক জাহাজঘাটায় সমবেত হয়েছে নীলকণ্ঠ (চৌধুরী), জয়া (ভট্টাচার্য), শিবু (শিবেন্দু), মদন পাল প্রভৃতি। দি ক ন ফি ডে ন্সি য়া ল ক্লা র্ক-এর মতো এই নাটকের মূল কাহিনী শিবুর পিতৃপরিচয় উদ্ঘাটন করা। এখানেই প্রথম আবিষ্কৃত হ'লো, যে মাসি-পরিচয়ে জয়া মানুষ করলেও আসলে সে শিবুর মা। শিবু জয়ার কানীন-পুত্র, নীলকণ্ঠর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের ফল। সামাজিক বাধা থাকায় তাদের বিয়ে হয় নি। জয়া অন্তঃসত্তা অবস্থায় অন্যত্র চলে যায়। পরে সে ছেলেকে মানুষ করার মানসে মদন পালের অফিসে চাকুরী নেয়, মদন পালের লালসার কাছে ধরাও দেয়। আরো পরে অবৈধ সম্পর্কের বিনিময়ে জয়া মদন পালের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেয়েছে চাকুরী না ক'রেও। জয়ার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ছেলেকে মানুষ করা, ঠিক Mrs. Guzzard-এর মতো।

"দি ক ন ফি ডে ন্সি য়া ল ক্লা র্ক"-এর Colby এবং Dady Elizabeth-এর দু-একটি সংলাপে বুদ্ধদেব বসুর 'প্র থ ম পা র্থ' নাটকের কর্ণ ও কুন্তীকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। Mulhammer দম্পতি যখন তাদের

সন্তানরূপে পেতে চেয়েছেন, তখন Colby-র মানসিক অবস্থা অনেকাংশে কর্ণের সদৃশ। তাই সে বলেছে:

I only wish it was more acute agony;
I don't know whether I've been suffering or not
During the conversation. I only feel···numb.
If there's agony, it's part of a total agony
Which I can't begin to feel yet. I am simply indifferent.
And all the time that you have been talking
I've only been thinking: 'What does it matter
Whose son I am?' You don't understand
That when one has lived without parents, as a child,
There is a gap that never can be filled. Never.
I like you both, I could even come to love you—
But as friends···older friends. Neither as a parent.
I am sorry. But that's why I say it doesn't matter
To me, which of you should be my parent. (Act Two)

আজন্ম বঞ্চিত কর্ণ যখন প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলেন তখন আর সে-পরিচয় গ্রহণ করার কোনো স্পৃহা নেই তাঁর, কুন্তীর মাতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল তাঁকে। কারণ, ততদিনে, সে-সবের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ততদিনে তাঁর ও কুন্তীর মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছে তা আর ঘোচবার নয়। তাই পরম ঔদাসীন্যে Colby-র মতোই কুন্তীর সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন:

কর্ণ

(নিস্তাপ স্বরে)

ক্ষমা করবেন। আমি কারোরই নই। কাউকে আমি
আমার ব'লে ভাবি না।
আমি বিশুদ্ধভাবে আমি। তাছাড়া আর কিছু নয়।

(প্র থ ম পা র্থ, দুই)

মাতৃত্বের দাবী নিয়ে Lady Elizabeth বলেছেন:

But a mother, Colby, isn't that different?

There should always be a bond between mother and son,
No matter how long they have lost each other (ঐ)

অনুরূপ সংলাপ কুন্তীর মুখেও অশোভন মনে হবে না, তবে 'প্রথম পার্থ' নাটকে কর্ণের সংলাপে অনুরূপ বক্তব্য স্থান পেয়েছে :

মাতা আর পুত্র, কুন্তী আর কর্ণ।
কী আশ্চর্য ভ্রূণের সঙ্গে গর্ভধারিণীর সম্বন্ধ!
এক দেহ, এক প্রাণ, এক অনুভূতি,
যেন জগতের মধ্যে অন্য এক জগৎ—
দুর্গের চেয়েও নির্বিঘ্ন, স্বর্গের চেয়েও তৃপ্তিকর।
(প্রথম পার্থ, দুই)

কর্ণের মানসিকতা এলিঅটের Colby-র আর একটি সংলাপেও স্থান পেয়েছে :

No, Lady Elizabeth. The position is the same
Or crueller, Suppose I am your son.
Then it's merely a fact. Better not know
Than to know the fact and know it means nothing
At the time I was born, you might have been my mother,
But you chose not to be. I don't blame you for that :
God forbid! but we must take the consequences.
At the time when I was born, your being my mother—
If you are my mother—was a living fact.
Now, it is a dead fact, and out of dead facts
Nothing living can spring. Now it is too late.

গ্রীক ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সন্ধানী এলিঅটও Colby চরিত্রে আধুনিক মানসিকতা তথা দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারে কুণ্ঠাহীন। অনুরূপ আধুনিকতার উন্মেষ কর্ণ চরিত্রে ('প্রথম পার্থ') দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

ইতিপূর্বে এলিঅট ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করতে দ্বিধা করি নি যে এই দুই কাব্য-নাট্যকার আঙ্গিকের দিক দিয়ে একটা অভাবনীয় নৈকট্যে উপনীত, যে-নৈকট্য কেবল কাব্যভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

আঙ্গিকের ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু এলিঅটের মতোই গ্রীক ঐতিহ্যের অনুসারী। গ্রীক ঐতিহ্যের প্রতি দুর্বলতা এলিঅটের কাব্যনাট্য প্রতিভার সহজাত। এই ঐতিহ্যকে আশ্রয় ক'রেই তিনি নাটকেও ধ্রুপদী রীতিতে পৌঁছোতে চেয়েছিলেন। গ্রীক ঐতিহ্য রূপায়ণে তিনি এতখানিই সনিষ্ঠ যে প্রথম দিকে 'কোরাস', 'অপদেবতা' (The Eumenides) প্রভৃতির ভূমিকা পর্যন্ত বর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে গ্রীক আঙ্গিক অনিবার্য হয়ে পড়েছিল তাঁর কাব্যনাট্যসমূহে মুখ্যতঃ কাহিনী-বৈশিষ্ট্যের জন্যই ; পুরাণ-কাহিনী নিয়ে কাব্যনাট্য রচনা করতে গিয়ে যেমন কাব্যভাষা ব্যবহারে তিনি এলিঅটকেই অনুসরণ করেছিলেন, তেমনি এই সমস্ত নাটকের আঙ্গিকের ব্যাপারেও সম্ভবতঃ তিনি এলিঅট থেকেই অনুপ্রেরণা আহরণ করেছিলেন। নাটক বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ বেশি বহন করছে তাঁর অতিবাস্তব কাহিনী সম্বলিত গদ্যনাটকগুলি, গ্রীক আঙ্গিকের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন ছিল ব'লেই কি কাব্যনাট্যগুলিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ অপেক্ষাকৃত কম ?

গ্রীক নাটক থেকে সোজাসুজি এলিঅটের মতো কোরাসকে তুলে এনে বাংলা নাটকে স্থাপন করা সম্ভব ছিল না, তাই বুদ্ধদেব বসু তাঁর গোড়ার দিকের কাব্যনাট্যগুলিতে কোরাসের পরিপূরক ভূমিকা সৃষ্টি করেছেন। 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' নাটকে গাঁয়ের মেয়েরা কোরাসের অনুকল্প। গাঁয়ের মেয়েদের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত, তাই কোরাসের ছবিটা দর্শকমনে জাগরূক রাখতে যে-সব দৃশ্য ও ঘটনায় গাঁয়ের মেয়েদের অনুপ্রবেশ সম্ভব ছিল না সেখানে কোরাসের ভূমিকা পালন করেছেন রাজপুরোহিত। 'প্র থ ম পা র্থ' নাটকে কোরাসের পরিপূরক কোনো সমবেত ভূমিকা নেই সত্য, কিন্তু দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকা সর্বাংশে কোরাসের অনুরূপ। গাঁয়ের মেয়েরা বা রাজপুরোহিত কোরাসের যে অধিকার এবং ক্ষমতা পায় নি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা

তাও পেয়েছে। এরা সর্বদাই মঞ্চে উপস্থিত, সমস্ত ঘটনারই এরা প্রত্যক্ষদর্শী, এদের দৃষ্টির অন্তরালে কোনো ঘটনা বা দৃশ্য অভিনীত হয় নি। এরা সমস্ত ঘটনাবলীর ভাষ্যকারও। এই ধরনের অধিকার গাঁয়ের মেয়েরা বা রাজ-পুরোহিতের ভূমিকায় আরোপিত হয় নি। অবশ্য দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কোরাস ভূমিকার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, আলো-আঁধারির মঞ্চকৌশল প্রয়োগে এদের সর্বদা মঞ্চে উপস্থিতিটুকুর মধ্যেও মাঝে-মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করার নির্দেশ দিয়েছেন নাট্যকার। 'কা ল স ন্ধ্যা' নাটকের প্রস্তাবনা অংশ 'পূর্বরঙ্গে' দুই যাদব বৃদ্ধ কোরাসের ভূমিকা পালন করেছে। তবে এই নাটকে এদের অধিকার সংকুচিত, মূল নাটকে এদের অনুপ্রবেশ ঘটে নি।

নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজনে বুদ্ধদেব বসু এলিঅটের মতোই নানা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। একই পদ্ধতি সচরাচর তাঁর একাধিক নাটকে পুনরাবৃত্ত হয় নি। এই বিভাজন বাংলা নাটকে অভিনবত্বের দাবীদার। এলিঅটের 'মা র্ডা র ই ন দি ক্যা থি ড্রা ল' ও 'দি ফ্যা মি লি রি য়্যু নি য় ন' নাটকে 'Act' স্থলে 'Part' ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটিতে কেবল দুটি 'Part', কোনো দৃশ্যবিভাজন নেই, অন্যটিতে সাধারণ নাটকের মতোই দৃশ্যবিভাগ রয়েছে। 'দি ক ন ফি ডে ন্সি য়া ল ক্লা ক' এবং 'দি এ ল্ডা র স্টে ট স ম্যা ন'-এ অংকবিভাগ আছে, কিন্তু দৃশ্যবিভাগ নেই। 'দি ক ক টে ল পা র্টি' নাটকে সাধারণভাবে তিনটি অংকবিভাগ আছে, কিন্তু প্রথম অংকে দৃশ্যবিভাজন থাকলেও অন্য দুটিতে তা নেই।

বুদ্ধদেব বসুর নাটকগুলিতেও অংক ও দৃশ্যবিভাজনের অনুরূপ নানা পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' প্রচলিত রীতির নাটক, এতে যথারীতি তিনটি অংক ও অংকগুলিতে দৃশ্যবিভাজন আছে। অংকবিভাগ আছে 'ক ল কা তা র ই লে ক ট্রা' এবং 'কা ল স ন্ধ্যা' নাটকেও। তবে প্রথমটিতে দৃশ্যবিভাগ নেই। অন্যটিতে দৃশ্যবিভাগ আছে, তাছাড়া গোড়ায় আছে প্রস্তাবনা অংশ 'পূর্বরঙ্গ'। 'প্র থ ম পা র্থ' ও 'অ না ম্নী অ ঙ্গ না' নাটক দুটিতে অংকবিভাগ নেই, কেবল পরপর কয়েকটি দৃশ্য। 'প্র থ ম পা র্থ' নাটকে পাঁচটি দৃশ্য শব্দের সাহায্যে চিহ্নিত: এক, দুই, তিন···। 'অ না ম্নী অ ঙ্গ না'-র চারটি দৃশ্য চিহ্নিত সংখ্যায়: ১, ২, ৩···। 'সং ক্রা ন্তি' নাটকে দৃশ্য বা অঙ্ক কোনো কিছুই নেই, একটি মাত্র দৃশ্য নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এই নাটকগুলির রচনার কালানুক্রম

অনুসরণ করলে আঙ্গিকের একটা সুস্পষ্ট ক্রমবিবর্তন অনুভূত হবে। দেখা যাবে প্রথম পর্যায়ে তিনি প্রথানুগ অংকবিন্যাসের ওপরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। প্রথম নাটকে তিনটি অংকও ছিল, যথারীতি দৃশ্যবিভাগও ছিল। দ্বিতীয় নাটকে কিন্তু অংকবিভাগ থাকলেও দৃশ্যবিভাগ নেই। আবার তৃতীয় নাটকে অংক ও দৃশ্যবিভাগ থাকলেও অংকসংখ্যা হ্রাস ক'রে তিন থেকে দু-য়ে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অংকবিভাগ অপসৃত, কেবল দৃশ্যবিভাগ। পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে অংক এবং দৃশ্য বিভাগ উভয়ই অপসৃত, কেবল নিরবচ্ছিন্ন একটানা ঘটনা ও সংলাপের সমাবেশ। লক্ষণীয়, গ্রীক নাট্যরীতিও তো তাই, সেখানেও অংক বা দৃশ্য-বিভাগের কোনো বালাই নেই। এলিঅটেরও নাটক রচনার কালানুক্রম অনুসরণ করলে দেখা যাবে, প্রথম পর্যায়ে তাঁর নাটকে অংশ (Part) ও দৃশ্য-বিভাগ আছে, দ্বিতীয় বা অন্তর্বর্তী পর্যায়ে অংক এবং দৃশ্যবিভাগ থাকলেও তার প্রবণতা দৃশ্যবিভাগ থেকে দৃশ্যবিভাগ না-করার দিকে। তাই পরবর্তী বা শেষ পর্যায়ের দুটি নাটকে শুধুই অংকবিভাগ, দৃশ্যবিভাগ নেই। এই ক্রমবিবর্তন ধারা অব্যাহত থাকলে পরবর্তী পর্যায়ে এলিঅটও দৃশ্য ও অংক-বিহীন গ্রীক আঙ্গিকের নাটকে উপনীত হতেন এমন সম্ভাবনার কথা উপেক্ষা করা যায় না।

এলিঅট ও বুদ্ধদেব বসুর নাট্যআঙ্গিকের এই বিশ্লেষণ থেকে একথা স্বতঃপ্রমাণিত যে উভয়েই প্রথানুগ নাট্যরীতির সঙ্গে গ্রীক আঙ্গিকের সহাব-স্থান ঘটিয়ে নাটক রচনা সুরু করলেও আঙ্গিকের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁরা অনেকাংশে বিশুদ্ধ গ্রীক আঙ্গিকের দোরগোড়ায় উপনীত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে আঙ্গিক সম্পর্কে এই দুই নাট্যকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও ঘটনার গতিবেগ-সংক্রান্ত সমাবেশ পুরো-পুরি গ্রীক ঐতিহ্য অনুযায়ী ঘটিয়েছেন। শেকস্‌পিয়ার-এর নাটকে এই রীতির চরম প্রকাশ। পরবর্তী কালে যখন নাটকের রূপ আরো সংহত হয়েছে তখনো কিন্তু ঘটনা সমাবেশ এবং গতিবেগ সঞ্চার বিষয়ে ঐ রীতিই অব্যাহত আছে। ঘটনার অবতারণা (exposition), সংঘাত (conflict), চরমক্ষণ (climax) বা সংকটক্ষণ (crisis), অবরোহণ (denouement) প্রভৃতির সমাবেশ এলিঅট এবং বুদ্ধদেব বসু উভয়েই প্রথানুগ রীতিতেই ঘটিয়েছেন তাঁদের নাটকে। ধরা যাক, 'মা র্ডা র ই ন দি ক্যা থি ড্রা ল' কিংবা 'ত প স্বী ও ত র ঙ্গি ণী' নাটকের কথা। 'মা র্ডা র ই ন দি ক্যা থি ড্রা ল' নাটকে

ক্যাণ্টারবারির মেয়ে বা কোরাস এবং ধর্মযাজকদের কথোপকথনের মাধ্যমে আর্চবিশপের আগমন সংবাদ দিয়ে ঘটনার অবতারণা দেখানো হয়েছে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে ঘটনার অবতারণায় বলা হয়েছে অঙ্গরাজ্যের অনাবৃষ্টিজনিত বন্ধ্যাত্ব ও ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নই বৃষ্টিপাত ঘটানোর একমাত্র সম্ভাবনা। নাইটদের আগমনে নাটকীয় ঘটনার সংঘাত দেখা দিয়েছে, চরম মুহূর্ত এসেছে নাইটদের দ্বারা বেকেট হত্যায় এবং তারপরই ঘটনার অবরোহণ। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে তরঙ্গিণী কর্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধকরণ এবং বিভাণ্ডক কর্তৃক প্রলোভন থেকে পুত্রকে রক্ষার চেষ্টা প্রভৃতির মধ্যে নাটকীয় সংঘাত, ঋষ্যশৃঙ্গের অঙ্গদেশে আগমন এবং বৃষ্টিপাত এই নাটকের চরমক্ষণ। তারপরই তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটনার অবরোহণ। ঘটনার পরিসমাপ্তিতে ঋষ্যশৃঙ্গ আবার তপস্বী জীবনে ফিরে গেছেন, তরঙ্গিণীও তাঁকে অনুসরণ করেছে। এইভাবে এলিঅট তথা বুদ্ধদেব বসুর যে-কোনো নাটকের ঘটনার সমাবেশ বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো যায় যে তাঁরা উভয়ে একই ঐতিহ্যের অনুসারী।

নাটকে ব্যবহারোপযোগী কাব্যভাষা সৃষ্টিতে এলিঅট এবং বুদ্ধদেব বসু সমধর্মী বলা বোধহয় সর্বাংশে সমীচীন নয়. এলিঅট যে-রীতিতে নাটকীয় কাব্যভাষা সৃষ্টি করেছেন, বুদ্ধদেব বসুও অনুরূপ রীতির অনুসারী এ কথা বলাই যুক্তিযুক্ত। এলিঅটের নাটকীয় কাব্যভাষার মূল কথাই হল চরণদৈর্ঘ্য ও অক্ষর সংখ্যা অনিয়মিত। বুদ্ধদেব বসুরও তাই। উভয় নাট্যকারের কাব্যভাষার উদাহরণ থেকে সহজেই বোঝা যাবে চরণ-সন্নিবেশ রীতিতে উভয়ের নৈকট্য কতখানি।

The cnes who don't get out in time
Find themselves in goal and not very comfortable,
Or before a firing squad.
You don't know what serious politics is like !
I said to my boys : 'Never touch politics.
Stay out of politics, and play both parties :
What you don't get from one you may get from the other'.
Dick, don't tell me that there isn't any whisky in the house ? (*The Elder Statesman*)

অনুরূপ অসম ও অনিয়মিত দৈর্ঘ্যের চরণ বুদ্ধদেব বসুও তাঁর নাটকীয় কাব্যভাষায় ব্যবহার করেছেন ঃ

সরল আমার প্রস্তাব।
আমি দেবো তোকে মুক্তি, বিনা পণে, কাল প্রত্যুষে.
তোর বিবাহে যৌতুক দেবো
শুল্করহিত উর্বর ভূমি, দুগ্ধবতী গাভী,
যা যজ্ঞের পরে প্রাপ্য হয় ব্রাহ্মণের।
অবিশ্বাসী দৃষ্টিপাত করিস না—
আমি সত্য বলছি।
শুধু
তোর মুক্তির বিনিময়ে
আমাকেও এক সংকট থেকে তোকে মুক্তি দিতে হবে।

(অনাম্নী অঙ্গনা)

লক্ষণীয় চরণদৈর্ঘ্যের তারতম্য এলিঅটের চেয়ে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাষায় বেশি। উভয়েই প্রাচীন ছন্দ থেকে দূরে সরে গেছেন। ভিত্তি blank verse হলেও আরো অনেক বেশি নমনীয় ও মুখের ভাষার অনেক কাছাকাছি এলিঅটের কাব্যভাষা। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাষাও পয়ারেরই রূপান্তর হলেও এলিঅটের মতোই আরো অনেক বেশি নমনীয় এবং অনেকাংশে কথ্যধর্মী।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. 'কাব্যনাট্য' কিংবা 'নাট্যকাব্য'—তৈলাধার পাত্র অথবা পাত্রাধার তৈল—এ কূট তর্ক এখানে অবান্তর বলেই অভিধা দুটি সমার্থক।

২. 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'মরচে পড়া পেরেকের গান' প্রভৃতি পুরাণভিত্তিক রূপক কবিতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত নই।

৩. 'All of Eliot's plays deal in on one way or another with this Christian conception of human freedom. Typically, the dramatic situation involves the hero's discovery of the 'catholic' view of life as the only tenable one, no matter how painful that recognition may be.'—*T. S. Eliot's Dramatic Theory and Practice*, p. 80

৪. 'Poetry and Drama', *On Poetry and Poets*, p. 72; *Selected Prose*, p. 67

৫. *The Making of T. S. Eliot's Plays*, p. 1

৬. 'A careful examination of Eliot's poetry shows that he has essentially a dramatic imagination. His interest in drama, in fact, regulates his theory of poetry and art'—*T. S. Eliot the Dramatist*, p. 27

৭. যৌবনারম্ভে সাময়িকভাবে নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করলেও মঞ্চস্থ না হওয়ার হতাশায় 'নাট্যকার-স্বপ্ন চৌচির' হয়ে যায় (আমার যৌবন পৃ. ২৯); সনিষ্ঠ গবেষকের পক্ষেও এই নাট্যচর্চাকে 'আমল' দেওয়া সম্ভব হয় নি (নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু, পৃ. ১১)

৮. *The Use of Poetry and the Use of Criticism* p. 152-53

৯. 'Poetry and Drama', *Selected Prose*, p. 77

১০. *The Making of T. S. Eliot's Plays*, p. 64

১১. 'T. S. Eliot in the Theatre' (E. Martin Browne), *T. S. Eliot : The Man And His Work*, p. 118

১২. *T. S. Eliot's Dramatic Theory and Practice*, p. 106

১৩. এলিঅটের নাটকগুলির ধর্মীয় ভিত্তি প্রসঙ্গে *The Making of T. S. Eliot's Plays* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

১৪. নভোতল বানানই আছে। — দেশ ১১ চৈত্র ১৩৭২ দ্র.

১৫. *Selected Prose*, p. 74

১৬. 'In *The Family Reunion* he conscripted a Greek tragedy, Furies and all, with partial success,'—*The Invisible Poet : T. S. Eliot*, p. 288

১৭. 'He translated the Orestes story from the palas at Argos to a country house in the north of England, and from the Greek to the christian basis of thought.' *The Making of a Play*, p. 3

১৮. *T. S. Eliot's Dramatic Theory and Practice* (p. 129-30) গ্রন্থে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

১৯. শারদীয়া দেশ ১৩৭৮, পৃ. ৭৭

২০. 'The result was *The Family Reunion*, a play based on Orestes' line in the *Choephoroe*···'—*The Making of a play*, p. 3

নয়

উপসংহার

টমাস স্টার্নস এলিঅটকে কেবল একজন কবি বললে তাঁর সম্যক পরিচয় হয় না, তিনি নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট কাব্যধারা; 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-ও একটি কাব্যমাত্র নয়, এক বিশিষ্ট কাব্য-আন্দোলন। সে-ধারা কাব্যে ধ্রুপদী রীতির, সে-আন্দোলন রোমান্টিক-বিরোধিতার। হতে পারে সে-কাব্যরীতি তথা রোমান্টিকতা-বিরোধী প্রবণতা তাঁর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল ফরাসী সাহিত্যের দৃষ্টান্ত থেকে, লাফর্গ করবিয়ের বোদলেয়ার প্রমুখের কাব্যপ্রকরণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতিই সে-রীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল তাও হয়তো সত্য, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইংরেজি কাব্যধারায় যে-মোড় ফেরা তার মুখ্যতঃ একক কৃতিত্ব কবি এলিঅট ও তাঁর যুগোপযোগী কাব্যরীতির, যার সার্থক উন্মেষ 'প্রুফ্রক' কিংবা 'জেরনশান' কবিতায় হলেও পূর্ণতা নিঃসন্দেহে 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ।

লাফর্গ প্রমুখ অনুসৃত কাব্যরীতি যে ভাবে দেশান্তরে সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল এলিঅটীয় কাব্য-অনুশীলনে, অনুরূপভাবেই এলিঅটীয় কাব্য-রীতিও ভাষান্তরে বাংলা কাব্যধারায় সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে ইংরেজি সাহিত্য সভ্যতা কৃষ্টি প্রভৃতির অঙ্গীকরণ সহজতর হয়েছিল শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে। দেশীয় ঐতিহ্য থেকে অপসরণের সূত্রপাতও সেই থেকেই। মঙ্গল কাব্য-পাঁচালী-উত্তর বাংলা কাব্যে দেশজ রীতি উপেক্ষিত হল, অনুপ্রবেশ ঘটল পাশ্চাত্য রীতির। যুগন্ধর কবি মধুসূদন স্বপ্ন দেখলেন দান্তে ট্যাসো ভার্জিল মিল্টন বায়রন-সুলভ এক মহাকাব্য রচনার। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রে তারই অনুবর্তন। রবীন্দ্রনাথ বরণ ক'রে নিয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী ও কীটসের রোমান্টিক কাব্যাদর্শ, এই ধারার চরম পরাকাষ্ঠাও ঘটে তাঁরই কাব্যানুশীলনে।

প্রায় অর্ধশতাধিক বর্ষের অনুবর্তনের ফলশ্রুতিতে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের রোমান্টিক-সর্বস্ব বাংলা কাব্যধারায় গতিরুদ্ধতা তথা কথ্য ও কাব্য-রীতিতে ব্যবধান অনুভূত হওয়ায় ভিন্নতর কালোপযোগী কাব্যধারার অঙ্গীকরণ বাংলা কাব্যে অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। মহাযুদ্ধোত্তর বাঙালী

কবিরা রবীন্দ্রনাথের অনপনেয় ছায়ায় কাব্যদীক্ষা সমাধা ক'রেও প্রয়াসী হলেন রোমান্টিকতা-বিরোধী কাব্য-ঐতিহ্যের। স্বভাবতঃই এ-ঐতিহ্যের শিকড় প্রোথিত ছিল রবীন্দ্রভূমিতে নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে।

···similarly one finds that Tagore, after all that he has done for us, is a magnificent interlude; and with his heritage enriching our minds we have to search for roots elsewhere, in the popular as well as highly esoteric literature of the past, and in the actual life of the present.[১]

তিরিশের দশকের আধুনিক কবি বিষ্ণু দে-র এই বক্তব্যে রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ হয়েই রবীন্দ্র-ধারা অতিক্রমণ তথা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং আধুনিক জীবনের তট ছুঁয়ে যাওয়ার উপযোগী এক কাব্যধারা-অনুসন্ধান প্রয়াসের মধ্যে আধুনিক কবিদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন যেমন জড়িত, তেমনি বাংলা কাব্যের প্রবহমানতারও অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ। আর এক তিরিশের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশ স্পষ্টতঃই সে-কথা স্বীকার করেছেন :

> বাংলা সাহিত্যে যা নেই অথবা শীর্ণভাবে রয়েছে সেই সব প্রাণ ও পরিসরের থেকে রশ্মি পেতে হলে ইউরোপীয় সাহিত্য ছাড়া আমাদের অন্য কোনো আলোভূমি নেই।[২]

পশ্চাৎপটের এই অনিবার্যতায় তিরিশের দশকের একেবারে ঊষালগ্নেই বাংলা কাব্যের জগতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে টি. এস. এলিঅটের, একাধারে অনুবাদে এবং মৌলিক রচনায়। প্রায় চার দশক ধ'রে এলিঅট অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যের রীতি আঙ্গিক এবং বৈশিষ্ট্যাদি অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন বাঙালী কবিরা; অন্যদিকে তাঁর কাব্যরীতি প্রকরণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতীক প্রভৃতি বাংলা কাব্যে অঙ্গীকরণের আন্তরিক প্রয়াসও চলেছে অব্যাহত ধারায়। এলিঅটীয় প্রতীকের অনুরণন বাংলা কাব্যে ষাট কিংবা সত্তরের দশকেও অননুভূত নয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর ব্যাপক প্রভাব অবশ্যই তিরিশের দশকে এবং সে-প্রভাব কেবল কাব্যসৃষ্টিতেই নয়, কাব্যচিন্তায়ও।

যাঁর কাব্যানুশীলনে এলিঅট-প্রভাব উৎকট ভাবে প্রকট তিনি অবশ্যই বিষ্ণু দে। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার আওতায় গ'ড়ে ওঠা তিরিশের দশকের

বঙ্গীয় জীবনচর্যা, নাগরিক সভ্যতার গ্লানি ও নৈঃসঙ্গ্য মানসিকতায় সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য-সমস্যায় একটা স্পষ্ট নৈকট্য অনুভূত হয়েছিল এলিঅটের সঙ্গে সে-সময়কার বাঙালী কবিদের মানসজগতের। তাই এলিঅট-প্রভাব কেবল বিষ্ণু দে-র কাব্যজগৎ স্পর্শ ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসু কেউই নিজেকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। সে-সময় এলিঅটীয় কাব্যরীতি কাব্যপ্রকরণ ও আঙ্গিকের ব্যাপক অনুশীলন দেখা যায় বাংলা কাব্যে এবং মুখ্য কবিরাই নয়, হেমচন্দ্র বাগচী মণীন্দ্র রায় হুমায়ুন কবির কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বাণী রায় অমিতাভ ঘোষ অমিতাভ সেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তিরিশের দশকের অপ্রধান কবিদের মধ্যেও এলিঅটীয় প্রকরণ অঙ্গীকরণের একটা প্রতিযোগিতা অনুভূত হয়। অপেক্ষাকৃত অনুজ কবিদের মধ্যে ব্যাপক এলিঅট-চারণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। সমর সেনের এলিঅটসুলভ নগরজীবনের গ্লানি অবসাদ প্রভৃতির অভিব্যক্তিতে এবং অনাপূর্ব চিত্রকল্প, কথ্যধর্মিতা প্রভৃতি এলিঅটীয় কাব্যপ্রকরণ ব্যবহারে উৎকর্ষ ও সাফল্য অবিসংবাদিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব কথ্যধর্মিতার নিপুণ কাব্য রূপায়ণে। কিরণশঙ্করের প্রবণতা ধরা পড়েছে এলিঅটীয় সংলাপ ধর্মিতায় এবং নাটকীয় বেদ্যতায়। মুখ্যতঃ এঁদেরই জন্য বাংলা কাব্যে চল্লিশের দশকে কিম্বা তারও পরে এলিঅটীয় কাব্যরীতির প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়েছে।

কাব্যরীতিতেই এলিঅটীয় ছায়া সর্বাগ্রে অনুভূত হয়েছিল এবং ব্যাপক ভাবে অনুশীলিত হয়েছিল সে-কথা সত্য। তবে বিশিষ্ট এলিঅটীয় চেতনা-সমূহেরও গভীর প্রভাব পড়েছিল বাংলা কবিতায়। যে-সমস্ত কবি এলিঅটীয় কাব্যরীতিতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন নি তাঁরাও কিন্তু এলিঅটীয় চেতনায় ধরা দিয়েছিলেন। নগর-চেতনা, অবসাদ-চেতনা, পোড়ো জমি-চেতনা, অনুর্বরতা বা বন্ধ্যাত্ব-চেতনা, নৈঃসঙ্গ্য-চেতনা প্রভৃতিতে তাঁরা গভীরভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিষ্ণু দে সমর সেন প্রভৃতি যদি মুখ্যতঃ এলিঅটীয় কাব্যরীতি-প্রভাবিত কবি হন, তাহলে সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ প্রভৃতি অবশ্যই মুখ্যতঃ এলিঅটীয় চেতনা-প্রভাবিত কবি।

কাব্যরীতি এবং চেতনার পাশাপাশি বাংলা কাব্যচিন্তা কত গভীরভাবে এলিঅট প্রভাবিত তার সাক্ষ্য বহন করছে তিরিশ ও চল্লিশের দশকের

'প রি চ য়', 'ক বি তা', 'চ তু র ঙ্গ' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের কাব্যবিষয়ক আলোচনাগুলি। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ইবনে বতুতা অমলেন্দু বসু আবু সয়ীদ আইয়ুব হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির আলোচনায় নানাভাবে এলিঅট ছায়া ফেলেছেন সে-সময়। কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসু এবং পরবর্তী কালে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ এলিঅটের কাব্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তথা তারই পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য-মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন।

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা থেকে এরকম সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া চলে যে, কবি সমালোচক তথা নাট্যকার এলিঅটের প্রভাব কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রে বা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি, বাংলা সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পড়েছিল। কাব্য, কাব্যনাট্য এবং কাব্যতত্ত্ব এই তিনটি ক্ষেত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এলিঅটের কাব্যরীতি থেকে নানা কাব্যপ্রকরণ গৃহীত হয়েছিল এবং সেগুলি বাংলা কবিতার মেজাজের সম্পূর্ণ উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। কিছু-কিছু প্রাচীন প্রকরণ নূতন রূপে দেখা দিয়েছিল বাংলা কাব্যে নূতন ব্যঞ্জনা-সম্ভাবনা নিয়ে। অন্যপূর্বা চিত্রকল্প বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অভিনব প্রকরণ হলেও নিঃসন্দেহে তা সার্থক কাব্যচাতুর্য সৃষ্টির সর্বাংশে সহায়ক হয়েছিল। অন্যদিকে স্বগত ভাষণ (parenthesis) এবং ধ্রুবপদকল্প চরণ (refrain) প্রকরণ দুটি বাংলা কবিতায় প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত থাকলেও এলিঅটীয় কাব্যের সংস্পর্শে আসার পর এই দুই প্রকরণ নূতন ব্যঞ্জনা-সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিল বাংলা কাব্যে। এলিঅট প্রভাবে বাংলা কবিতায় আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। কৃষ্টি এবং দর্শনের বিচারেও বাংলা কাব্যের আধুনিকীকরণ ঘটেছিল। ইয়োরোপ বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দর্শনে সমাজ-চিন্তায় মনোবিদ্যায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। রোমান্টিক কবিতার পক্ষে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে চলা সম্ভব হয় নি। এলিঅট প্রভাবোত্তর বাঙালী কবি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপযোগী ক'রে তুলেছিল নিজেকে।

বাঙালীজীবনে মার্কসবাদও এসেছিল তিরিশের দশকেই। সে-সময় মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পযুদস্ত এবং পরিবর্তনের প্রতীক্ষায়। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে নতুন কিছুর জন্য মরীয়া হয়েই মার্কসবাদ আঁকড়ে ধরেছিল। ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে তো বটেই, চিন্তাধারায়ও গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল মার্কসীয়

দর্শনের। সম্ভবতঃ এই পরিপ্রেক্ষিতেই কবি বিষ্ণু দে-র মনে হয়েছে এলিঅটের প্রভাব মার্কসীয় প্রভাবের অনুরূপ ঃ

He widened and at the same time deepened our vision of literature, which is creative work. In an odd way he did in literature that Marx had done in the broader sphere of social and political life.[৩]

এ সত্যও অনস্বীকার্য যে বাংলা কাব্যে এলিঅট-প্রভাব অনুকরণ নয়, অঙ্গীকরণ। এলিঅটীয় দৃষ্টান্ত তিরিশের দশকের কবিদের গভীর ভাবে অনুপ্রেরিত করেছিল, এলিঅটীয় উপাদান বাঙালী কবিদের নতুনতর সৃষ্টির পথে এগিয়ে দিয়েছিল। এ প্রভাব অবশ্যই কর্মিষ্ঠ প্রণোদনায় সার্থক হয়েছিল। তিরিশের দশকের বাংলা কাব্যের আধুনিক কাব্যরীতি, প্রকরণ, আঙ্গিক প্রভৃতি ইয়োরোপীয় সাহিত্য থেকে আহরিত হলেও তারা ফলপ্রসূ হয়েছিল এখানকার সাহিত্যে। তাই বঙ্গীয় পরিবেশে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি আমদানি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন তা এ প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য ব'লে এখানে আবার উদ্ধৃত করা অযৌক্তিক হবে না :

> বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য-সম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে-ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না।[৪]

বাংলা সাহিত্য গ্রহণ করতে পেরেছিল ব'লে এবং নব-নব সৃষ্টির অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল ব'লে কবি জীবনানন্দের অনুরূপ স্পর্ধিত উক্তিতেও সায় দিতে বাধে না ঃ

> কিন্তু জিনিস যারই হোক, তাকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে যদি রচনায় পৃথক সিদ্ধি পাওয়া যায় তাহলে শিল্পীর উপায় নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো মূল্য নেই।[৫]

আজকের দিনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এলিঅটের ভূমিকার পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাংলা কাব্যের এক সন্ধিক্ষণে এদেশে তাঁর আবির্ভাব। মহাযুদ্ধোত্তর কালে কবিরা যখন এক অবশ্যম্ভাবী যুগান্তরের মুখোমুখি

হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন এলিঅটীয় অভিঘাতই তাঁদের মধ্যে গতিসঞ্চার করেছিল। এলিঅটীয় কাব্যাদর্শে বিষ্ণু দে প্রমুখেরা নিজেদেরও মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন, আর পেয়েছিলেন ব্যাপক এবং গভীরতর কাব্যদৃষ্টি যা ইতিহাস-চেতনা-নির্ভর ঐতিহ্য-দৃষ্টির প্রাখর্যে দেদীপ্যমান। এলিঅটীয় অভিঘাতে তিরিশের দশকের কবিদের উজ্জীবিত হওয়ার ব্যাপারটা বোধকরি সত্য-সত্যই তুলনীয় মহাভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবদীয় অভিঘাতে অর্জুনের উজ্জীবিত হওয়ার পৌরাণিক প্রসঙ্গের সঙ্গে ঃ

> Such is Mr. Eliot's influence in this Waste Land where Krishna admonished Arjuna and where 'a poet's poet consistently and persistently has to try to be a people's poet'.৬

বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে যুগন্ধর কবি টি. এস. এলিঅটের এই উত্তমর্ণ ভূমিকার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করলে 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত বাংলা কাব্যের তিরিশের দশককে 'এলিঅট যুগ' অভিধায় পুনরভিহিত করাই সর্বাংশে শ্রেয়।

তিরিশের দশকে এলিঅটীয় প্রভাবের অব্যবহিত পরেই মার্কসীয় প্রভাবও পড়তে সুরু করে বাংলা সাহিত্যে। অর্থনৈতিক ভাঙনের অনুকূল পরিবেশে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি কাল থেকে মার্কসীয় দর্শন বাংলা কাব্যে এলিঅটীয় প্রভাবের প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে এবং ক্রমেই তা গভীর ও ব্যাপকতর হয়ে এলিঅটীয় প্রভাবকে অনতিবিলম্বেই ছাপিয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বাংলা কাব্যে ফ্রয়েডীয় দর্শনেরও প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল সত্য, কিন্তু পরিবেশানুগ প্রশ্রয়ে মার্কসবাদ চর্চা বঙ্গের বুদ্ধিজীবী মহলে যতখানি জনপ্রিয় হয়েছিল, ফ্রয়েডবাদ অতখানি জনপ্রিয় হয় নি। অপ্রতিহত মার্কসবাদের উচ্চনাদী পরাক্রমের মুখে প'ড়ে চল্লিশের দশক থেকেই এলিঅটীয় সুর ক্রমেই স্তিমিত হতে-হতে পঞ্চাশের দশকে দুনিরীক্ষ্য হয়ে পড়ে। অবশ্য এও সত্য যে রূঢ় বাস্তব চেতনা এবং নগর চেতনার মতো এলিঅটীয় চেতনা সমূহই বাংলা কাব্যে মার্কসবাদের উপোদ্‌ঘাত সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-অতিক্রমণ তথা বাংলা কাব্যের মুক্তির জন্য তিরিশের দশকে এলিঅটীয় প্রভাব অনিবার্য ছিল, আবার পরবর্তীকালে তার প্রবহমান ধারা অক্ষুণ্ন রাখতেই এলিঅটীয় ঐতিহ্য উত্তরণও ছিল একান্ত আকাঙ্ক্ষিত।

প্রবহমান বাংলা কাব্যের এলিঅটীয় ধারাই মার্কসবাদের 'সন্দীপের চর' অতিক্রম করে উপনীত হয়েছে প্রতীকী ধারার যুগে। তাই বিষ্ণু দে-র মতো প্রতিভূ কবিকে প্রথমে এলিঅটীয় ধারায় এবং তৎপরে মার্কসবাদে এবং আরো পরে প্রতীকী ধারায় অবগাহন করতে দেখেও বিস্ময়াভিভূত হওয়ার অবকাশ থাকে না।

বাংলা কাব্য-ধারা 'এলিঅট যুগ' থেকে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে উপনীত। এই নিরাপদ দূরত্ব থেকেই সে-ধারার আবেগহীন নিরাশক্ত এবং যথাযথ বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন সম্ভব ব'লেই বাংলা কাব্য থেকে এলিঅটের ছায়া অপনীত হওয়ার পরও অনুরূপ সৎ প্রয়াস মূল্যবান। ঐতিহাসিক দূরত্বে দাঁড়ালে তবেই ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং শাশ্বত মূল্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। এই আলোচনায় বাংলা কাব্যের 'এলিঅট যুগের' ঐতিহাসিক মূল্যায়নেরই সনিষ্ঠ প্রয়াস।